প্রাচীন ভারতের
ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

সুসাহিত্যিক শ্রী নলিনী বেরা-কে

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বা ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংস্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট বিবরণ একত্রে পাওয়া যায় না। তার উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে। বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণগুলি, উপনিষদগুলি, ধর্মসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রগুলি এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে। ঋগ্বেদের নদী, পর্বতগুলির নামও আমাদের এলাকাগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। মহাকাব্য দুটি এবং পুরাণগুলিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মহাভারতের তীর্থযাত্রা, দ্বিগবিজয়, জম্মুকাণ্ড, বিনির্মাণ পর্ব, রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ইত্যাদি পরিচ্ছদগুলি ভৌগোলিক তথ্যে ভরপুর। পুরাণের ভুবন কোষ, জম্মুদ্বীপ বর্ণনা, কুর্মবিভাগ পরিচ্ছেদগুলি, পরাশর তন্ত্রে বৃহৎ সংহিতা এবং অথর্ব পরিশিষ্টও একাজে পিছিয়ে নেই। পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং যোগিনীতন্ত্র থেকেও প্রাচীন ভৌগোলিক বিবরণের অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়।

পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণগুলি মোটামুটি এক। বায়ু, মৎস্য এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের তালিকাটি দীর্ঘ। আবার বিষ্ণু পুরাণে খুবই সংক্ষিপ্ত। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির বিবরণ মহাভারতেও পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতি এবং দেশের দীর্ঘতম তালিকা রয়েছে মার্কণ্ডেয়, স্কন্দ. ব্রহ্মাণ্ড এবং বায়ুপুরাণে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কুর্মবিভাগ পরিচ্ছদে ভারতবর্ষকে একটি কুর্ম রূপে কল্পনা করে তার বিভিন্ন অংশের সঠিকভাবে কিছু ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরাশর এবং বরাহমিহিরের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তা এতে নেওয়া হয়েছে। ভাগবত পুরাণেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্য ভৌগোলিক তথ্যে ভরপুর। যেমন রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা থেকে ভারতের প্রচলিত পাঁচটি বিভাগের কথা পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। এতে, উৎকল, সুহ্ম, নিষাদ, কাশ্মীর, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র। বাহ্লিক, পাঞ্চাল, শূরসেন ইত্যাদি দেশ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়ে গেছে। রঘুবংশ, শ্রীহর্ষের নৈষাধীয়চরিত, কালিদাসের মেঘদূত, দণ্ডিণের দশকুমারচরিত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত, ধোয়ীর পবনদূত— ইত্যাদি সাহিত্য আমাদের প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত ভৌগোলিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

বুদ্ধ এবং তাঁর পরবর্তী যুগে ভৌগোলিক তথ্যের ব্যাপারে পালি সাহিত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের সময় থেকে অশোক পর্যন্ত যুগের ইতিহাস এবং ভৌগোলিক তথ্যের জন্যে আমাদের বৌদ্ধ সাহিত্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন ধর্মের সাহিত্যেও কিছু তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

পালি পিটকে—বিশেষ করে 'বিনয়' ও 'সুত্তে' বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নগর ও স্থানের নাম এসেছে। এদের থেকে মধ্য দেশ এবং তাকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন অঞ্চলের কথাও জানা যায়। মিলিন্দপঞ্হ এবং কথাবস্তু, বুদ্ধঘোষের ভাষ্য, সিংহলী

ইতিবৃত্ত—দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ থেকে অনেক ভৌগোলিক তথ্য আহরণ করা যায়।

উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির এবং অশোকের শিলালিপিও তথ্য বহুল। মুদ্রাও অনেক সময় অনেক সাহায্য করে। যেমন চিতোর থেকে ১১ মাইল উত্তরে নাগরীতে পাওয়া তাম্রমুদ্রার জন্য আমরা শিবি জাতকের রাজা শিবির রাজ্য চিহ্নিত করতে পারি।

ভারত সম্পর্কে গ্রিক বিবরণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মিলেটাসের হেকাটিয়াস (খ্রিঃ পূঃ ৫৪৯-৪৮৬) হচ্ছেন প্রথম গ্রিক ভৌগোলিক যাঁর জ্ঞান পারস্য সাম্রাজ্যের সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি সিন্ধুর উজানে গান্ধারী বলে কথিত মানুষজনদের জানতেন। হেরোডোটাস (খ্রিঃ পূঃ ৪৮৪-৪৩১) ভারত সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, সিন্ধু উপত্যকার অববাহিকা পর্যন্ত অঞ্চল (পাঞ্জাব ও সিন্ধু সমেত) পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক ডিয়োডোরাস, প্লিনি, স্ট্রাবো, কার্টিয়াস, এরিয়ান ও জাস্টিনিয়ানের লেখা থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। এঁদের লেখা থেকে আমরা অস্মক, গান্ধারাই, কেকয় প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম ভারতের উপজাতিদের সম্পর্কে জানতে পারি। মেগাস্থিনিস তো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভাতেই ছিলেন। তাঁর ইণ্ডিকার যে অংশটুকু বেঁচে আছে তার থেকে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের অধিবাসী, নদী, শহর, বন্যপ্রাণী, ঘোড়া, হাতি, গাছ, জাত, জাতি, উপজাতি, কর্মব্যবস্থা, দর্শন, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কিছু জানা যায়। এরিয়ানের আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ সংক্রান্ত বইটি হারিয়ে গেছে। সংক্ষিপ্তাসারে স্ট্রাবোর বইতে (খ্রিঃ পূঃ ৬০-১৯) কিছু বেঁচে আছে। প্রকৃতিবিদ প্লিনির (খ্রিঃ পূঃ২৩-৭৯) বই থেকেও বহু তথ্য জানা যায়।

এক অজ্ঞাত লেখকের 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামক বইতে লোহিত সাগর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত দেশগুলোর ব্যবসা বাণিজ্যের কথা লেখা আছে। এটি সত্যিই লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের সীমান্ত বরাবর দেশগুলি সম্পর্কে একটি নির্দেশ পুস্তক। এই বইটিতে সৌরাষ্ট্র, ব্রোচ, মহী নদী, নর্মদা, বর্তমান কান্দাহার অঞ্চলের আরাকোসি, গান্ধার, উজ্জয়িনী, বর্তমান তের, সোপারা, বর্তমান কল্যাণ এবং পান রাজ্য সম্পর্কে বহু কথা রয়েছে। টলেমির 'ভূগোল' প্রাচীন ভারতের ভূগোল নিয়ে গবেষণা কারীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৫ম শতাব্দী) ও হিউয়েন সাঙ (৭ম শতাব্দী) এর ভারত বিবরণী এক অমূল্য সম্পদ। অষ্টম শতাব্দীতে এসেছিলেন ইউ-ফং। এছাড়াও রয়েছেন সংয়ুন, হি-সেং, আই কিং, ওয়াং হিউ সে। এদের বৃত্তান্তও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমান লেখকদের বৃত্তান্ত খুব সাহায্যকারী। আলবেরুনী ৯৭০ খ্রিঃ খিবাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আমলে ভারত ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মী—বৌদ্ধধর্মী নয়।

১২ শতাব্দীর কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তও সাহায্যকারী।

প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ভূগোল সম্বন্ধে জানার অন্য পথও রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন রাজকীয় গেজেট। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদন, এফিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, করপাস ইন্সক্রিপসানাম ইণ্ডিকারাম, সাউথ ইণ্ডিয়ান ইন্সক্রিপশানস এবং এফ্রিগ্রাফিয়া কর্ণাটিকা ইত্যাদি পুস্তকে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে ভৌগোলিক তথ্য পাওয়া যায়।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়াতে ড. জে. এফ. ফ্লিটের লেখা 'নোট'টি গবেষকদের কাছে অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

অ্যানুয়াল রিপোর্টস অফ দি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ায় রয়েছে ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের বিশদ বিবরণ। যেমন বেস নগর, ভিটা, কাসিয়া, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, সারনাথ, বৈশালী, তক্ষশিলা প্রভৃতি। ১৯০৭-৮-এর রিপোর্টে রয়েছে আইহোলের প্রাচীন মন্দিরগুলি সংক্রান্ত এবং সংলগ্নভূমি সংক্রান্ত ভৌগোলিক তথ্য। ১৯১৫-১৬ সালের প্রতিবেদনে এম. বি. গার্দে বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত পদ্মাবতী নগর কোথায় অবস্থিত ছিল তা বলেছেন। পদ্মাবতী বর্তমান সিন্ধু এবং পার্বতী নদীর সংযোগস্থলে ছিল। ১৯২৭-২৮ এর রিপোর্টে কে. এন. দীক্ষিত চন্দ্রবর্মণের শুশুনিয়া লিপিতে বর্ণিত পুষ্করণকে পোখরান বলে চিহ্নিত করেন। স্থানটি শুশুনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৭-২৮ এর বিবরণে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের খনন কার্যের বিবরণ রয়েছে। ১৯২৮-২৯এর প্রতিবেদন রয়েছে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার 'মহাস্থানের' খনন কার্যের বিবরণ। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে এখানেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিবেদনে নাগার্জুন কোণ্ডা, সিন্ধু প্রদেশের ভূমি এবং জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এন. জি. মজুমদারের সিন্ধু সংক্রান্ত ভৌগোলিক ও খনন কার্যের বিবরণ একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিবেদন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন নাম

উত্তরে বিশাল পর্বতমালা এবং বাকি তিনদিকে সাগর-মহাসাগর দিয়ে বেষ্টিত এই ভূমি একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল বলে চিহ্নিত। এই বিশাল দেশের অজস্র গাছপালা—লতা গুল্ম, জাতি—ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির জন্য সত্যই এই দেশটি একটি উপমহাদেশের দাবী রাখতে পারে। ইণ্ডিয়া শব্দটি সিন্ধুনদী বা ইণ্ডাস থেকে গৃহীত। চিনারা ভারতের প্রাচীন নাম সিন-থু বা সিন্ধু বলে জানত। ঋগ্বেদে এদেশকে বলা হয়েছে সপ্ত-সিন্ধব অর্থাৎ সপ্তনদীর দেশ। পার্সিপোলিস এবং নকশ-ই-রুস্তমে দরায়ুসের খোদিত লিপিতে বলা হয়েছে—সমস্ত ভূভাগ সিন্ধুর জলে সিঞ্চিত হয় এবং উপনদীগুলি সমেত সমগ্র ভূভাগটিকে সরলভাবে বলা হোত 'হিন্দু'। হেরোডোটাস একে ইণ্ডিয়া বলে অভিহিত করেন এবং এটি পারস্য সাম্রাজ্যের দ্বাদশতম প্রদেশ ছিল। তবু এটা জেনে রাখা উচিত যে বৈদিক 'সপ্ত-সিন্ধব' এবং পারসিক 'হিন্দু' কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিমের একটি নির্দিষ্ট অংশকে বলা হোত। কিন্তু হেরোডোটাসের ইণ্ডিয়া শব্দটি আরও ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। কারণ গ্রিক ঐতিহাসিকরা এমন সব ভারতবাসীর নাম করেছেন যারা পারস্য সাম্রাজ্য থেকে দূরে বাস করত এবং তারা কখনই দরায়ুসের প্রজা ছিল না।

বস্তুত সমগ্র দেশই আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। কারণ, ঐ সময়কার গ্রিক এবং ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়, সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য এবং তারও দক্ষিণে তাম্রপর্ণীর নাম তাদের জানা ছিল। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল দেশের একটিই মাত্র নাম। সেই সময়কার ব্যবহৃত নামটি ছিল জম্বুদ্বীপ। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে চারটি মহাদ্বীপ বা মহাদেশের একটি হল জম্বুদ্বীপ। এদের মাঝখানে

সিনেরু (সুমেরু) পর্বত। জম্মুদ্বীপের একটি অংশের নাম অঙ্গদ্বীপ যেখানে ম্লেচ্ছরা বসবাস করত।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্যে জম্মুদ্বীপের উল্লেখ রয়েছে। অশোকের সংক্ষিপ্ত শিলালিপিতেও (নং-১) জম্মুদ্বীপের উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্য এবং পুরাণে বলা হয়েছে, সপ্তদ্বীপের অন্যতম দ্বীপ জম্মুদ্বীপ। পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্যে বলা হয়েছে জম্মু গাছ থেকে নাম হয়েছে জম্মুদ্বীপ। নিকায়তে বলা হয়েছে বন বা অরণ্য। একে সুদর্শন দ্বীপও বলা হয়েছে।

নয়টি বর্ষ বা দেশের অন্যতম দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ। রাজা ভরতের নামে এই নাম। পুরাণ এবং মহাকাব্যে বলা হয়েছে, প্রথমে সাতটি বর্ষ ছিল। পরে আরও দুটি সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্ষগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সবচেয়ে দক্ষিণে। নাম হয়েছে রাজা ভরতের নাম অনুযায়ী। ভরত ছিলেন মনু স্বয়ম্ভু বংশের প্রিয়ব্রতের উত্তরসূরী। পুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষ নব খণ্ড অর্থাৎ নটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—সমুদ্রের দ্বারা তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অপ্রবেশ্য ছিল। কিন্তু যে ভারতবর্ষকে আমরা জানি তা নটি খণ্ডে বিভক্ত নয়। সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্নও নয় এবং অগম্য তো নয়ই। তাই সেটি আমাদের ভারতবর্ষ নয়। নয়টি খণ্ডের আটটিকে ঠিক ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে দেখান হয়নি। সেগুলি আসলে বৃহত্তর ভারতবর্ষের অংশ—দ্বীপ এবং দেশ যা ভারতকে ঘিরে রয়েছে। এই বিষয়টিও অনেক আগে আলবিরুনী এবং আবুল ফজলের মতো পণ্ডিতদের জানা ছিল। নবম দ্বীপ বা খণ্ডটি অর্থাৎ—পুরাণ-বর্ণিত সাগর ঘেরা কুমারী বা কুমার দ্বীপ—যার পূর্বাংশে কিরাতদের বাস, পশ্চিমে যবনদের, মাঝখানে রয়ে গেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও শূদ্রেরা। এটিই আসল ভারতবর্ষ ছিল।

প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকরা জানতেন যে সিন্ধু নদীই ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত। কিন্তু তাঁরা কাবুল নদী ও তার শাখা নদীগুলির উপত্যকায় ভারতীয়দের বসবাস সম্পর্কে জানত। আবার কিন্তু গ্রিক পণ্ডিতরা মনে করতেন, কোফেন বা কাবুল নদীই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত। যোন বা যবনদেরও ভারতীয়দের সঙ্গে ধরা হয়েছে। এরা সম্ভবত কাবুলের আশপাশে এবং গান্ধারে বসবাস করত। অধুনা পাকিস্তানের পেশওয়ার এবং রাওলপিণ্ডি প্রদেশই ছিল ঐ সমস্ত অঞ্চল। মহাকাব্য এবং পুরাণে দেখা যায় সে সিন্ধুর পশ্চিম তীরই ভারতবর্ষের সীমানা ছিল না। বরং তা আর পশ্চিমে উত্তর পূর্ব ইরাণের মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমের মতো দেখতে সিংহল দ্বীপ (শ্রীলঙ্কা) ভারতবর্ষের অংশ না হলেও ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিগত ভাবে তা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আকার এবং ভৌগোলিক বিভাগ

প্রাচীন ভারতীয়দের দেশের প্রকৃত আকার এবং আয়তন জানা ছিল। মহাভারতে ভারতবর্ষের আকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি একটি সমবাহু ত্রিভূজ যা কিনা আবার চারটি সমান ত্রিভূজে বিভক্ত। কানিংহাম বলেন, যদি আমরা ভারতের সীমানা উত্তর পশ্চিমে গজনী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই এবং অপর দুটি বিন্দু যদি যথাক্রমে কন্যাকুমারী এবং অসমের সাদিয়ায় স্থাপন করা হয়—তাহলে আকারটি বেশ মিলে যায়। ভারত

যে নটি ভাগে বিভক্ত তা পরাশর আর বরাহমিহিরই প্রথমে বলেছিলেন। পরে কোনও কোনও পুরাণকার এটি গ্রহণ করেন। ভারতের ভূমির আকার কূর্মের পিঠের সঙ্গে তুলনীয়। হাত-পা ছড়িয়ে কূর্মটি যেন পূর্বমুখি হয়ে শুয়ে আছে।

প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে ভারতবর্ষ উত্তরভাগে প্রশস্ত। কিন্তু দক্ষিণভাগ একটি গোশকটের সামনের অংশের মতো সরু হয়ে গেছে এবং সাতটি সমান খণ্ডে বিভক্ত। মেগাস্থিনিস এবং ডেইম্যাকোস লিখেছেন যে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ককেশাস পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ২০,০০০ স্টাডিয়া এবং মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের আয়তন ১৬০০০ × ২২৩০০ স্টাডিয়া। কিন্তু সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য আমাদের আকার ও আয়তন সম্পর্কে কোনও কথা বলে না।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আমরা ভারতবর্ষের পাঁচটি বিভাগ দেখি। কাব্যমীমাংসায় বলা হয়েছে, বারাণসীর পূর্বে পূর্বদেশ। মাহিষ্যতির (নর্মদার তীরে মান্ধাতা বলে চিহ্নিত) দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ, দেবসভার পশ্চিমে পশ্চিমদেশ, পৃথুদকের (থানেশ্বরের ১৪ মাইল পশ্চিমে পেহয়া বলে চিহ্নিত) উত্তরে উত্তরাপথ এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল অন্তর্বেদী। কাব্যমীমাংসা লেখার কালে আর্যেরা তখন মধ্যদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে গেছে। এবং আর্যত্ব পৌঁছে গেছে বারাণসী পর্যন্ত।

ব্রাহ্মণিক আর্য এবং বৌদ্ধরা আর্যাবর্ত নিয়ে ধর্মসূত্রে এবং ধর্মশাস্ত্রে আলোচনা করেছেন। পতঞ্জলীও তাঁর মহাভাষ্যে আর্যাবর্ত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই অঞ্চলের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে যেখানে সরস্বতী নদী ভূমিগর্ভে হারিয়ে যায়—সেখান থেকে পূর্বের অরণ্যাঞ্চল এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে পারিপাত্র পর্বতমালা পর্যন্ত। প্রায় সব ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেই মধ্যদেশ বা আর্যাবর্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। এটিই ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আর্যাবর্ত হচ্ছে সেই 'দোলনা' যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তথা বৌদ্ধধর্ম লালিত হয়ে উঠেছে। পুরাণের ভুবনকোষে যে পাঁচটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে তা কাব্য মীমাংসার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ক) মধ্যদেশ
খ) উদীচ্য বা উত্তরাপথ (উত্তর ভারত)
গ) প্রাচ্য (পূর্ব ভারত)
ঘ) দক্ষিণাপথ (দক্ষিণ ভারত)
ঙ) অপরান্ত (পশ্চিম ভারত)

পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য ভারত দেশের উল্লেখ রয়েছে, মধ্যদেশ বা মাঝিঝম দেশের সীমান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে।

সূত্রের যুগে আর্যদের যে দেশ ছিল পরবর্তীকালে তাই-ই মধ্যদেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এর উল্লেখ দেখা যায় বৌধায়নের ধর্মসূত্রে। দেশটি ছিল—যেখানে সরস্বতী নদী হারিয়ে যায় তার পূর্বে এবং কালকাবন (যা প্রয়াগের কাছাকাছি কোনও অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছে)। হিমালয়ের দক্ষিণ এবং পারিপাত্র পর্বতের উত্তরে—এসম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। পূর্ব সীমান্তে শুধুমাত্র বঙ্গদেশ নয় বিহারও বাদ গেছে। মনু ধর্মশাস্ত্রে সূত্রবর্ণিত আর্যাবর্তকে মধ্যদেশ বলেছেন। এর সীমারেখা তিনি টেনেছেন—উত্তরে হিমালয়,

দক্ষিণে বিন্ধ্য, পশ্চিমে বিনশন ও পূর্বে প্রয়াগ। সূত্রের আর্যাবর্ত এবং মনুর মধ্যদেশ কাব্যমীমাংসার মতে 'অন্তর্বেদী' বলে পরিচিত এবং তা বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্বের সীমানা কালে কালে প্রসারিত হয়েছে। বৌদ্ধ মঝিঝমদেশের সীমানা মহাভাগে বলা হয়েছে পূর্বে কাজঙ্গল নগর পর্যন্ত এবং তা ছাড়িয়ে ছিল মহাসাল নগর অবধি। দক্ষিণপূর্বে সালালাবতী (শারাবতী) নদী, দক্ষিণে শতকর্ণিকা নগর, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ অধ্যুসিত থুনা (স্থানিশ্বর বলে চিহ্নিত), উত্তর উষিরধজ পর্বত (হরিদ্বারের কনখলের উত্তরে উষিরগিরি পর্বত চিহ্নিত)। অবশ্য দিব্যাবদান পূর্ব সীমায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। প্রাচীনকালে বরেন্দ্রভূমি অধুনা প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ এর অন্তর্গত ছিল। অন্যান্য সীমানা মহাভগ্নেরই মতো ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রলিপি এবং ব্যারাকপুরের বিজয়সেনের তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে, অশ্বঘোষের মতে মধ্যদেশ হিমালয় ও পারিপাত্র পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

উত্তরাপথের চার সীমানার কথা ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ সাহিত্যের কোথাও বলা নেই। কাব্যমীমাংসায় বলা হয়েছে, উত্তরাপথ বা উত্তর-ভারত পৃথুদকের পশ্চিমে ছিল। আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ্য সংজ্ঞায় ঋগ্বেদিক আর্যদের অধিকৃত অধিকাংশ ভূমিই বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও তা উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতির লালনভূমি ছিল সমগ্র সিন্ধু উপত্যকা— তা কাব্যমীমাংসার মতে উত্তরাপথের সঙ্গে যুক্ত। বশিষ্ঠের এবং বৌধায়নের ধর্মসূত্র এবং মনুর ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে—সরস্বতী নদী যেখানে অবলুপ্ত হয়েছে তার পশ্চিমে উত্তরাপথ। খারবেলের হস্তিগুম্ফার লিপিতে উত্তরাপথ বলতে যা বলা হয়েছে—তা সম্ভবত মথুরা সমেত দক্ষিণ পূর্বের মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। উত্তরাপথ সম্ভবত আদিতে একটি বিশাল বাণিজ্যপথ ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে পালি সাহিত্যে উত্তরাপথ বলতে পূর্বে অঙ্গ থেকে উত্তর পশ্চিমে গান্ধার এবং উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয়েছে। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট উত্তরাপথের মধ্যে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগ, পাঞ্জাব এবং ভারত-পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকেও ধরেছিলেন।

কাব্য মীমাংসা অনুসারে দেবসভার পশ্চিমে অবস্থিত দেশের নাম পশ্চাদদেশ অথবা পশ্চিম অঞ্চল। পালির মহাবংশ অনুসারে অপরান্তক বা পশ্চিম ভারত ইরাবতী উচ্চভাগের পশ্চিমে অবস্থিত। ভাণ্ডারকার বলেছেন, অপরান্ত হচ্ছে উত্তর কোংকণ যার রাজধানী ছিল সোপারা। ভগবান লাল ইন্দ্রজিতের মতে পশ্চিম সমুদ্রাঞ্চলই হচ্ছে অপরান্তিকা। অপরান্ত শব্দটি মহাভারতের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে অপরান্ত বলতে সিন্ধু-সৌবীরের উত্তরের দেশ সমূহকে বোঝায়। অশোকের শিলা লিপি নং ৫-এ অপরান্তের উল্লেখ রয়েছে। এটি লুডারের তালিকা নং ৯৬৫তে রয়েছে। নাসিকের গৌতমী বালাশ্রীর তথ্য থেকে জানা যায় যে তাঁর ছেলে অপরান্ত বিজয় করেছিলেন। পরে, পশ্চিম ভারতের শক সত্রাপ রুদ্রদমন তা পুনরায় জয় করে নেন। ১৫০ খৃষ্টাব্দের জুনাগড় শিলালিপি তাই বলে।

মাহিষ্যতির—(কাব্যমীমাংসা অনুসারে মান্ধাতা) দক্ষিণের অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণাপথ। অনেকের মতে এটি রামের সেতু থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত। নর্মদা অঞ্চলকেও ধরা হয়। এখানে ইক্ষাকুর কুড়িজন পুত্র রাজত্ব করেছিলেন। এটি গার্গমুনির তপস্যা ক্ষেত্র। ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, বিন্ধ্যের অংশ বিশেষ পারিপাত্র পর্বতের দক্ষিণের অংশই দাক্ষিণাপথ।

(মহাভগ্ন এবং দিব্যাবদানে বলা হয়েছে, গঙ্গার দক্ষিণ অংশই দাক্ষিণাত্য। সুত্তনিপাতের মতে গঙ্গার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তর অংশের ভূমিই দক্ষিণাপথ। সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যে বলা হয়েছে সারাবতী নদী এবং পারিপাত্র পর্বতের দক্ষিণে দক্ষিণাপথ।

পূর্বদেশ ছিল মধ্যদেশের পূর্বে। কিন্তু মধ্যদেশের পূর্ব সীমান্ত সময় সময় পরিবর্তিত হওয়ার জন্য, পূর্বদেশের পশ্চিম সীমান্তেরও বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মসূত্র অনুসারে পূর্বদেশ ছিল প্রয়াগের পূর্বদিকের অঞ্চল। কাব্যমীমাংসার মতো বারাণসীর পূর্বে। আবার বাৎসায়নের সূত্রে অঙ্গের পূর্বদিকে ছিল পূর্বদেশ। পূর্বদেশের পশ্চিম সীমান্ত বিনয়-মহাভগ্ন অনুসারে কাজন্‌গল পর্যন্ত প্রসারিত বা দিব্যাবদানের মতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত।

সংস্কৃত- বৌদ্ধসাহিত্য মধ্যদেশ, উত্তরাপথ এবং দক্ষিণাপথ এই তিনটি বিভাগের কথাই বলে। পাণিনী অষ্টাধ্যয়ীতে এবং পতঞ্জলী মহাভাষ্যে উত্তরাপথের উল্লেখ করেছেন। দণ্ডিণ তাঁর 'কাব্যাদর্শতে দাক্ষিণাত্য এবং অদাক্ষিণাত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা বলেছেন। এই দুটি বিভাগ শুধু নামেই। তাদের সীমানা বা অঞ্চলের কোনও বর্ণনা নেই। অপরান্ত বা পশ্চিম বিভাগ এবং প্রাচ্য বা পূর্ববিভাগও শুধুমাত্র নামেই। তবে মধ্যদেশের সীমানা বর্ণনা করার সময়ে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে দিব্যাবদানে।

ভারত যে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত একথা চিনারাও জানত। সপ্তম শতাব্দীর চাং বংশের রাজত্বকালে সরকারি নথিপত্রে ভারতের পাঁচটি বিভাগের কথা উল্লেখ করা রয়েছে—যেমন, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং মধ্য। বর্তমানেও এই পাঁচটি বিভাগ রয়েছে।

দক্ষিণ ভারত যেন একটি ওলটানো ত্রিভূজ—যার শীর্ষবিন্দু কন্যাকুমারীতে—বিষুব রেখার ৮° উত্তরে। ভারত অন্তরীপের পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর। ত্রিভূজের ভূমি অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের উত্তর সীমারেখা বিন্ধ্যপর্বত।

প্রাকৃতিক বিভাগ

ভৌগোলিকভাবে ভারতবর্ষ খুব সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। এই দেশ পূর্ব গোলার্দ্ধের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং এটিই দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রীয় অন্তরীপ। তাই ভারত মহাসাগরের চারপাশের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের পক্ষে খুব সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এর সীমান্ত রেখাও প্রাকৃতিক, পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ সাগর বিধৌত। উত্তর, উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্বে এক বিশাল পর্বতমালার জন্য ভারত চিনা, তুর্কিস্থান এবং তিব্বত, ইরাণের মালভূমি, বালুচিস্থান, মায়ন্মারের চিন্দউইন এবং ইরাবতী উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্ন। ভৌগোলিক এবং উদ্ভিদের বিন্যাসের দিক দিয়ে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। ভারতের বিশেষ বিশেষ কিছু ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পর্বতমালা

উত্তরের পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে হিমালয়, বৃহত্তর হিমালয় এবং তার পূর্বপশ্চিমের শাখাপ্রশাখা।

হেমবত (পালি—হিমভা, হিমাচল, এবং হিমবন্ত প্রদেশ) এবং (সংস্কৃতে—হিমবত)। এই পর্বতমালাকে কালিদাস বলেছেন নাগধিরাজ। অথর্ব বেদ, ঋগ্বেদে এবং ঐতেরীয়

ব্রাহ্মণে এর উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে হিমবত অঞ্চল নেপালের পশ্চিমে। মহাভারত অনুসারে এই অঞ্চলে রয়েছে উঁচু উঁচু পর্বত এবং সেগুলি গঙ্গা-যমুনা এবং শতদ্রুর জন্মভূমি। তাই হিমাচল প্রদেশ এবং দেরাদুনের কিছু অংশ এই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। ভাগবত পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং কালিকা পুরাণেও এর উল্লেখ রয়েছে। কালিকা পুরাণে একে পর্বতমালার রাজা বলা হয়েছে। রঘুবংশ অনুসারে রাজা রঘু হিমালয়ে আরোহণ করেছিলেন। মহাকাব্যগুলিকে এবং পুরাণগুলিতেও হিমবন্তকে মর্যাদা পর্বত এবং বর্ষপর্বত বলে বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের লেখক জানতেন যে হিমবন্ত পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আকারে এটি ধনুকের মতো। মার্কণ্ডেয় পুরাণের কথা মহাভারত এবং কুমারসম্ভব সমর্থন করেছে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চল যা অসম এবং মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত তাই জম্বুদ্বীপের হিমবত প্রদেশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অশোক তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপিতে নভকদের এবং নভপংক্তিদের উল্লেখ করেছেন। হিমালয় অঞ্চল—পালির হিমবন্ত প্রদেশ উত্তরে প্রসারিত, দক্ষিণ সীমার নির্দেশ কালসির শিলালিপিগুলিতে, নিগলিব, লুম্বিনীর এবং চম্পারণ জেলার অশোক স্তম্ভগুলিতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, হিমবত প্রদেশ হচ্ছে তিব্বত। ফার্গুসন বলেন—নেপাল, রিজ ডেভিসের মতে মধ্য হিমালয়। প্রাচীন ভূগোলবিদদের হিমবন্ত নামটি পশ্চিম পাঞ্জাবে সুলেইমান পর্বতশ্রেণি থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর ভারত এবং পূর্বে অসম হয়ে আরাকান পর্বতশ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হত। বুদ্ধ শাক্য ও কোলীয়দের হিমালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং হিমালয় অঞ্চলের অনেক পর্বতের কথা বলেছিলেন। কৈলাস পর্বত হিমালয়ের অংশ, কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ একে একটি পৃথক পর্বত বলে মনে করে। হিমালয়েই দশটি নদীর উৎপত্তি স্থল। হিমালয় পর্বতই কেবলমাত্র বর্ষপর্বত যা ভারতবর্ষে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত। কালিকা পুরাণে বলা আছে যে শিব ও পার্বতী হিমালয়ের মহাকৌশকী নদীর জলপ্রপাতে গিয়েছিলেন। হিমালয়ের তিনটি সমান্তরাল পর্বতশিরা রয়েছে। বৃহৎ হিমালয়, ছোট হিমালয় এবং বহির্হিমালয়। বৃহৎ হিমালয় সর্বোত্তরের পর্বতমালা নিয়ে গঠিত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমুদ্রতট থেকে ২০,০০০ ফুট উঁচু অর্থাৎ হিমরেখার ওপরে। প্রায় ১০০টি শৃঙ্গ ঐ সীমা অতিক্রম করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নগ্ন পর্বত ২৬,৬২০, নামকুম ২৩,৪১০ ফুট, নন্দাদেবী ২৫,৬৪৫ ফুট, বদ্রীনাথ ২৩,১৯০ ফুট, কেদারনাথ ২২,৭৭০ ফুট, বন্দরপুচ্ছ ২০,৭২০ ফুট, নীলকণ্ঠ ২১,৬৪০ ফুট, গঙ্গোত্রী ২১,৭০০ ফুট, শ্রীকণ্ঠ ২০,১২০ ফুট গৌরীশৃঙ্গ বা মাউন্ট এভারেস্ট ২৯,০০২ ফুট। কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮,১৪৬ ফুট, ধাওলাগিরি ২৬,৭৯৫ ফুট, মাকালু ২২,৭৯০ ফুট, গোঁসাইথান ২৬,২৯১ ফুট এবং নামচা বারওয়া ২৫,৪৪৫ ফুট। গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ধাওলাগিরি নেপাল-হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ। কুমায়ুন হিমালয়ের পূর্ব সীমান্ত থেকে তিস্তা নদী পর্যন্ত এই অংশ বিস্তৃত। নামচা বারওয়া অসম-হিমালয়ের অন্তর্গত, যা তিস্তা থেকে ভারতের পূর্ব-সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। গৌরীশঙ্কর নেপাল তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। তেনজিং নোরগে এবং নিউজিল্যান্ডের এডমণ্ড হিলারী সর্বপ্রথম এভারেস্ট শীর্ষে ওঠেন ১৯৫৩ সালে।

ছোট হিমালয় বৃহৎ হিমালয়ের দক্ষিণভাগে। অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশ্রেণি যা কিনা,

বৃহৎ হিমালয়ের সমান্তরালভাবে শিবালিক পর্বতের বহির্ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্বতশ্রেণী গড়ে ৫০ মাইল চওড়া। পীরপাঞ্জাল কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ থেকে পূর্বে প্রসারিত হয়ে বিতস্তার উৎস অতিক্রম করে আরও একটু পূর্বে বৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশেছে। ধাওলাপুর পর্বতশ্রেণি পীরপাঞ্জালের দক্ষিণে অবস্থিত—পূর্বে জম্মুর উধমপুরের কাছ থেকে পশ্চিমে সিমলা পাহাড়ের কাছে গিয়ে বৃহৎ হিমালয়ের সঙ্গে বদ্রীনাথে যুক্ত হয়েছে। বর্হিহিমালয় নিচু পর্বতশ্রেণি নিয়ে গঠিত। বৃহৎ হিমালয়ের সমান্তরাল হয়ে সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত। পশ্চিমে এটি শিবালিক বলে পরিচিত—বিতস্তা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত—প্রাচীন ভূগোলিবিদরা একে মৈনাক পর্বত বলে অভিহিত করতেন। শিবালিকের পেছনে উত্তরাঞ্চলের দেরাদুন জেলা। বর্হিহিমালয় অঞ্চল হিন্দুকুশ, কারাকোরাম এবং কৈলাস পর্বত নিয়ে গঠিত। প্রাচীনকালে হিন্দুকুশকে বলা হত মাল্যবত পর্বত। গ্রিকদের কাছে পরিচিত ছিল ভারতীয় ককেশাস পর্বত বলে যা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমতম অংশ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রসাবিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্থানকে ভারত থেকে পৃথক করেছে তারপর উত্তর পূর্ব আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। অনেকগুলি পর্বতশিরা মূল শ্রেণি থেকে বেড়িয়েছে। যেমন, বাদাকশান শৈলশিরা যা অক্ষু নদী ও কোকছাকে পৃথক করেছে এবং কোকছা শৈলশিরা কোকছা পর্বতমালাকে কুন্দুজ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। পূর্বদিকের অংশের হিন্দুকুশের উচ্চতা ১৪০০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুট। কারাকোরাম—প্রাচীন ভূগোলবিদদের কাছে কৃষ্ণগিরি বলে পরিচিত। এটি পশ্চিমে হিন্দুকুশের সঙ্গেই এগিয়ে গেছে। এটি উত্তর কাশ্মীরের সীমাও নির্দ্ধারণ করেছে। ২৮২৫০ ফুটের গডউইন অস্টিন শৃঙ্গ এর মধ্যেই অবস্থিত। কারাকোরামের একটি শৈলশিরা অনুসরণ করে আমরা দক্ষিণ পূর্বে কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হই। এরই কোলে মানস সরোবর। আধুনিক ভূগোলবিদ্দের মতে এই পর্বতটি হিমালয়ের চেয়ে প্রাচীন। এটি হারসিনিয়ান যুগের। যথেষ্টভাবে ভাঁজ খেয়েছে এবং উন্নত হবার সময়ে কিছু চ্যুতিও সৃষ্টি হয়েছে। মানস সরোবরের পূর্বে একটি উঁচু পর্বতশ্রেণি নাম লাদাখ পর্বতমালা—বৃহত্তর হিমালয়ে সমান্তরাল। এটি গ্রানাইট পাথরের তৈরি—হিমালয় থেকে একটি ৫০ মাইল চওড়া উপত্যকার দ্বারা পৃথক হয়ে আছে। কৈলাস পর্বতশ্রেণি রয়েছে লাদাঘ পর্বতশ্রেণির ৫০ মাইল পেছনে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত। এতে একগুচ্ছ শৃঙ্গ যুগ্মভাবে রয়েছে। এই গুচ্ছে উচ্চতম হচ্ছে কৈলাস পর্বত ২২০২৮ ফুট। প্রাচীন ভূগোলবিদদের মতে এটি বৈদ্যুতপর্বত।

উত্তর পশ্চিম ভারতে একটি উঁচু পর্বতমালা সিন্ধু উপত্যকাকে ভাগ করে বেলুচিস্তানের পাহাড় থেকে শুরু করে পশ্চিমে ডেরা ইসমাইল খাঁ হয়ে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। এই পর্বতমালার উত্তর অংশকে বলা হয় সুলেইমান পর্বত—প্রাচীন ভূগোলবিদেরা বলতেন অঞ্জনা এবং দক্ষিণ ভাগ—কিরথার পর্বতমালা মূলা গিরিখাদ থেকে ১৯০ মাইল বিস্তৃত কয়েকটি সমান্তরাল পর্বতশিরায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রসারিত।

উত্তর পূর্ব ভারতে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে একটি ভাঁজ খাওয়া শৈলমালা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে মায়নামারকে ভারত থেকে পৃথক করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এটি মিশমি পাহাড়, পাটকই পাহাড়, নাগা পাহাড়, বরেল পর্বতমালা, লুসাই পাহাড়

এবং আরাকান যোম এই পর্বতমালার অংশ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আমরা এসব পাহাড়ের উল্লেখ দেখি না।—কারণ প্রাচীন ভূগোলবিদরা এসব অঞ্চল অনুসন্ধান করেননি। এই পর্বতশ্রেণির একটি শাখা অসমে ঢুকেছে। এই শাখা জয়ন্তীয়া, খাসি এবং গারো পাহাড় নিয়ে গঠিত।

হিমালয়ের নদীগুলিকে দেখা যায় গভীর তেরছা গিরিখাদ বেয়ে পর্বতশৃঙ্খলের সমান্তরালভাবে কিছুদূর যাওয়াব পর পর্বতশৃঙ্খলমালাকে স্থানে স্থানে কেটে বেরিয়ে এসেছে। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এর উদাহরণ।

ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে হিমালয়কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। তিব্বত অঞ্চল, হিমালয় অঞ্চল এবং উপহিমালয় অঞ্চল। প্যালিওজোইক এবং মেসোজয়িক যুগেব ফসিল পাওয়া গেছে তিব্বত অঞ্চলে। হিমালয় অঞ্চল প্রধানত কেলাসিত এবং মেটামরফিক শিলায় গঠিত। উপহিমালয় অঞ্চল প্রধানত টারশিয়ারী যুগের শিলাস্তর দিয়ে তৈরি।

এভারেস্টের উত্তর দিকে রঙবুক হিমবাহ ১৬৫০০ ফুট উচ্চতায় শেষ হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা জোটে হিমবাহগুলি ১৩০০০ ফুট পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। কুমায়ুন শ্রেণিতে ১২০০০ ফুট এবং কাশ্মীরে সেগুলি ৮০০০ ফুটে নেমে আসে। ভূমধ্যসাগরের ইউরোপীয় উদ্ভিদ হিমালয়ে পৌছেছে। পক্ষীজীবনেও হিমালয় সমৃদ্ধ। প্রজাপতিরা তো তাদের সৌন্দর্য এবং জাঁকজমকের জন্য বিখ্যাত। নানা রকমের পাইথন, কোবরা, টিকটিকি ওখানে পাওয়া যায়। হিমালয়ের জঙ্গলে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতির ঘোড়া, কচ্ছপ, কুমির, মেছো কুমির, কাঁকড়া ইত্যাদি হিমালয়ের জঙ্গলে পাওয়া যায় বা যেত।

ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণে হিমালয়ের ভূমিকা বিশাল। এশিয়া সহ অন্যান্য দেশের দরজা বন্ধ করে এক প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয়।

উত্তরে অনেকগুলি গিরিপথ রয়েছে। যাকে কয়েকটি জোটে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ সিপকি জোট, আলমোড়া জোট এবং দার্জিলিং-সিকিম জোট। এগুলির সাহায্যে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে।

উত্তরপূর্বেও এমন অনেকগুলি পথ অসমে, মণিপুর ও আরাকানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মায়ানামারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। উত্তর পশ্চিমের বিখ্যাত সব গিরিপথগুলি হচ্ছে, খাইবার, কুররাম, তোছি, গুমাল এবং বোলান।

এক ঝাঁক অরণ্যাচ্ছিদ পর্বতশ্রেণি পশ্চিমের ক্যাম্বে উপসাগর থেকে পুবে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ভারতবর্ষকে দুভাগে ভাগ করেছে। যেমন উত্তরে সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকা এবং দক্ষিণে দক্ষিণের মালভূমি। এর উত্তরের অংশ বিন্ধ্য পর্বত পশ্চিম পূর্বে বিস্তৃত হয়ে কাইমুরকে যুক্ত করে গয়া হয়ে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণে একই দিকে প্রায় সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে সাতপুরা। মহাদেব, মইকাল শ্রেণি এবং ছোট নাগপুরের পাহাড় শ্রেণি, পশ্চিমে বিন্ধ্যের পেছনে কাথিয়াবাড় (গুজরাট) অন্তরীপের কেন্দ্রে রয়েছে গিরনার বা রৈবতক—গুজরাটের জুনাগড়ের কাছাকাছি। রাজস্থানকে দু টুকরো করে দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে গেছে আরাবল্লী। রাজস্থানও মধ্যভারতের একটি পাথুরে শৈলশিরার সাহায্যে প্রায় বিন্ধ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও আরাবল্লীর অংশ বলে ধরা

হয়, কিন্তু একটি সংকীর্ণ উপত্যকার দ্বারা বিভক্ত হয়ে রাজস্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে সিরোহী জেলায় একটি দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আবু বা অর্বুদ পাহাড়। মেগাস্থিনিস এবং এরিয়ানের বক্তব্য অনুসারে আবু পাহাড় ক্যাপিটালিয়ারই মতো। এর উচ্চতা ৬৫০০ ফুট এবং আরাবল্লীর সব শৃঙ্গ থেকে উচ্চতম।

পারিপাত্র বা পারিয়াত্র, ঋক্ষবত এবং বিন্ধ্য মধ্য ভারতের পর্বতমালা। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে সর্ব প্রথম পারিপাত্রের কথা শোনা যায়—যা কিনা আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমানা। স্কন্দপুরাণে বলা হয়, এটি ভারতবর্ষের কেন্দ্রবিন্দু কুমারীখণ্ডের দূরতম সীমানা। পার্জিটার বলেছেন পারিপাত্র হচ্ছে আধুনিক বিন্ধ্য পর্বতের সেই অংশ যা মধ্যভারতের ভূপালের পশ্চিমে অবস্থিত। একই সঙ্গে রয়েছে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি—টলেমি যাকে আপোকোপা বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

ঋক্ষবতকে টলেমি চিহ্নিত করেছিলেন আউক্সএনটন বলে। এটি টাউন্ডিস, দোশারন এবং অ্যাডামাস নদীর উৎস। দোশারনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বর্তমান দশার্ন (আধুনিক ধসান), যা টলেমির হিসাব মতো ঋক্ষ থেকে উৎপন্ন। ঋক্ষ বা ঋক্ষবত বলতে তিনি আধুনিক বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণির মধ্যাঞ্চল যা কিনা নর্মদার উত্তরে অবস্থিত বলে মনে করতেন।

টলেমির হিসাবে আউইনডন হচ্ছে বিন্ধ্য। নামোদোস এবং নন-গোউনা নদীর উৎস—বর্তমানে তা যথাক্রমে নর্মদা এবং তাপ্তি। বশিষ্ঠের ধর্মশাস্ত্র বলে বিন্ধ্য আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমান্ত।

সাতপুরা হচ্ছে বৈদুর্যপর্বত যা কিনা মহাভারতের পায়োসনী (তাপ্তির উপনদী) এবং নর্মদার সঙ্গে সম্পর্কিত। নর্মদার দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতের বর্তমান নাম সাতপুরা। মইকাল পর্বত (প্রাচীন মেকলা পর্বত) মধ্যভারতের গণ্ডেয়ানায় অবস্থিত। এইজন্যে নর্মদাকে মেকলসুতা বলা হয়। এরই পূর্বশৃঙ্গ বলা হয় সোম পর্বত, সুরথাদ্রি বা সুরথগিরি। অমরকণ্টককে তিনটি নদীর উৎস, নর্মদা, শোণ এবং মহানদী। বুন্দেলখণ্ডের চিত্রকূট পাহাড়কে বলা হত কামতানাথগিরি, এটি নিসঙ্গভাবে পাইসুনি বা মন্দাকিনী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিত্রকূট স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে কলিঞ্জর বা কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডের বান্দা জেলার একটি পার্বত্য দুর্গ। গঙ্গা এবং বিন্ধ্যপর্বতের মাঝে এর স্থিতি, জৈন সাহিত্যে এর উল্লেখ রয়েছে।

মধ্য ভারতের অরণ্যময় পর্বতগুলি ভারতের একীকরণের পথে বিরাট বাধা স্বরূপ ছিল। কারণ ঐ পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা জনক। বিনয় পিটক অনুসারে গয়াশিরা হচ্ছে গয়ার মুখ্য পাহাড়। বর্তমান ব্রহ্মযোনী এবং মহাভারতের গয়াশিরা একই।

পাঁচটি পাহাড়ের একটি জোট প্রাচীন মগধ রাজধানীকে ঘিরে রেখেছিল। পালি সাহিত্য অনুযায়ী ইশিগিলি (ঋষি গিরি), বেভার (বৈভার), পাণ্ডব, বেপুল্ল (বিপুল), গিজ্ঝকূট (গৃদ্ধকূট)। মহাভারতে এদের দুটি তালিকা রয়েছে, বৈহার, বিপুল, বারাহ, ঋষভ, ঋষিগিরি এবং শুভচৈত্যক এবং অন্য তালিকায় পাণ্ডর, বিপুল, বরাহক, চৈত্যক এবং মাতঙ্গ। গয়ার উত্তরে এবং রাজগৃহের পশ্চিমে রয়েছে গোরাথগিরি। (আধুনিক বারাবার পাহাড়) এটি খালটিকা পর্বত বলে অশোকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুহালিপিতে বর্ণিত

হয়েছে এবং পতঞ্জলীর মহাভাষ্যও তাই বলেছে। গোরাথগিরি থেকে গিরিব্রজকে (রাজগৃহকে) দেখা যায়। হাজারীবাগ জেলার উত্তরে শুক্তিমত পর্বতশ্রেণি। এর সম্বন্ধে মতদ্বৈততা রয়েছে। সেহোয়া কংকরের দক্ষিণের যে পাহাড় ছত্তিশগড়কে বস্তার থেকে পৃথক করেছে কানিংহামের মতে তাই-ই শুক্তিমত শ্রেণি। আবার পার্জিটার বলেন— এটি গারো-খাসি এবং ত্রিপুরা পাহাড়। কেউ কেউ আবার এটিকে দক্ষিণে কাথিয়াওয়াড় শ্রেণি হিসাবে মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন এটি সুলেইমান পর্বতশ্রেণি। রায় চৌধুরী নামটিকে মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের শক্তি থেকে মানভূমের দলমা পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন—এর মধ্যে রয়ে গেছে কুমারী নদী— সম্ভবত সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত প্রসারিত বাবলানদী। কুক্কুট পাদগিরি বা গুরুপদগিরিকে স্টেইন শোভনাথ শৃঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ আবার গয়া থেকে ১০০ মাইল ওপরে গুরপা পাহাড় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্তরাগিরি হচ্ছে রাজমহল পাহাড়। মুকুলপর্বত হচ্ছে কুন্দুহা পাহাড়—বুদ্ধ গয়া থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে এবং হাজারীবাগ জেলার ছাত্রা থেকে ১৬ মাইল উত্তরে। প্রাচীন শিলাসঙ্গম বা বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম হচ্ছে পাথরঘাটা পাহাড়। ছোট নাগপুরের পারশনাথ পাহাড় হচ্ছে প্রাচীন মল্লপর্বত। গ্রিকদের কাছে এর নাম মালেয়ুস। ভাগলপুরের বাংকা সাব-ডিভিশনের মন্দার পাহাড় এরিয়ান ও মেগাস্থিনিসের কাছে প্রাচীন মন্দার পাহাড়।

দক্ষিণ ভারতের পর্বতশ্রেণি হচ্ছে পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট এবং নীলগিরি। পশ্চিমঘাট প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে খান্দেশের কুন্দাইবাড়ি হয়ে ১০০০ মাইল দূরে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত প্রসারিত। গড় উচ্চতা ৪০০০ ফুট। এর অনেক শৈলশিরা রয়েছে— যেমন অজন্তা এবং বালাঘাটই বিখ্যাত। সমুদ্রের কূল খুব খাড়াই আরোহণ করা শক্ত। ভেতরদিকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয় নাসিকের কাছে থাল ঘাট, পুণার কাছে বোরঘাট এবং কোয়েম্বাটুরের পালঘাট গিরিপথের মাধ্যমে। কোয়েম্বাটুরের ওপরদিকে পশ্চিমঘাট প্রাচীন ভূগোলবিদদের কাছে সহ্যাদ্রি নামে পরিচিত ছিল। সহ্যাদ্রি প্রায় পশ্চিম উপকূলের সমান্তরালভাবে কন্যাকুমারী থেকে তাপ্তি উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত। টলেমি একে দুটি ভাগ করেছেন, উত্তর অংশ ওরাউদিয়ান (প্রাচীন বৈদুর্য পর্বত) এবং দক্ষিণ ভাগ এডেইসাথ্রোন। পশ্চিমঘাটের সঙ্গে জড়িত পাহাড়গুলি হচ্ছে ত্রিকূট (ট্রেইকুটকস), গোবর্দ্ধন (নাসিক পাহাড়), কৃষ্ণগিরি (আধুনিক কাণহেরী), ঋষ্যমূক (হাম্পির ওপর ঝুঁকে আছে)। মলয়বত—কিষ্কিন্ধ্যা দেশে (পার্জিটার কুপাল, মুদগল এবং রায়চৌধুরীর কাছের পাহাড়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন)। প্রস্রাবন (গোদাবরী ও মন্দাকিনীর সঙ্গে জড়িত) এবং গোমন্ত। ঋষ্যমূক ও গোমন্ত আবার সহ্যপর্বতের সঙ্গে জড়িত। পার্জিটার আগেরটিকে আহমেদ নগর থেকে কল্যাণী ও নলদুর্গ ছাড়িয়ে প্রসারিত পর্বতশ্রেণি বলে চিহ্নিত করেছেন। এবং পরেরটিকে নাসিকের দক্ষিণে বা দক্ষিণ পূর্বে প্রসারিত পর্বতশ্রেণিকে গোমন্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। রায়চৌধুরীর মতে গোমন্তের উত্তরে ছিল বনবাসী। সুতরাং পাহাড়টি মহীশূর অঞ্চলে পড়ে।

গড়ে ২০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতমালা হিসাবে পূর্বঘাট মোটামুটি পূর্ব-উপকূলের সমান্তরাল। বিচ্ছিন্ন পর্বতগুলি বিভিন্ন নামে দেশের বিভিন্ন অংশে পরিচিত।

উত্তরতম অংশের নাম মালিহাস এবং তা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। মালিহাস বিশাখাপত্তনম, গোদাবরী এবং গঞ্জামে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং কুর্নুল জেলায় তা বেশ চওড়া হয়ে গেছে। কুর্নুল জেলায় পূর্বঘাটের নাম নল্লামালাই পাহাড়। আরও দক্ষিণ এত নাম পালকোণ্ডা পাহাড়। দক্ষিণতম অংশে পূর্বঘাট চেন্নাই প্রদেশের নীলগিরি মালভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণপ্রান্তকে বলা হয় বিলিগিরি রঙ্গন পাহাড়। সালেম জেলায় সেভারয় পাহাড় একটি ভিন্ন পর্বতশ্রেণি।

রামায়ণে পূর্বঘাটকে মলয়পর্বত বলা হত। মহেন্দ্রগিরি-শ্রেণি সম্ভবত সম্পূর্ণ পূর্বঘাটেরই নাম ছিল। গঞ্জামের কাছে এখনও পূর্বঘাটের একটি অংশের নাম মহেন্দ্র পর্বত। তিনেভেল্লি জেলাতেও মহেন্দ্রগিরি বলে একটি পাহাড় আছে। পার্জিটার মনে করেন, রামায়ণ ও মহাপুরাণে বর্ণিত মহেন্দ্রগিরি দুটি আলাদা শৈলশ্রেণি। কিন্তু রায়চৌধুরীর মতে তা একই।

পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণি দক্ষিণে গিয়ে মিশে নাম নিয়েছে নীলগিরি। পার্জিটার নীলগিরি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পশ্চিমঘাটের অংশটুকুকে প্রাচীন মলয়পর্বতকে বলে চিহ্নিত করেছেন। পশ্চিমঘাটের দক্ষিণে প্রসারিত অংশটুকু অর্থাৎ কাবেরীর নীচের অংশটুকু যা আজ ত্রিবাঙ্কুর শৈলশ্রেণি বলে পরিচিত তা মলয়গিরির পশ্চিম অংশ। চৈতন্য চরিতামৃত এবং হর্ষচরিত বলে যে মহেন্দ্রগিরি—মহেন্দ্রপর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষিণে মাদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। মলয় পর্বত শ্রীখণ্ডাদ্রি এবং চন্দ্রনাদ্রি নামেও পরিচিত। মলয়কূট বা মলয় শৈলশ্রেণির চূড়ায় ঋষি অগস্তের আশ্রম ছিল।

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমত, ঋক, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র এই শৈলশ্রেণিগুচ্ছ প্রাচীন ভূগোলবিদদের কাছে কুলাচল নামে পরিচিত ছিল, এরকম বলা হোত। কারণ, প্রত্যেকটি শৈলশ্রেণি কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহেন্দ্র ছিল কলিঙ্গের সঙ্গে যুক্ত, মলয় পাণ্ড্যদের, সহ্য অপরান্তদের, শুক্তিমত ভল্লাটদের, ঋক্ষ মাহিষ্যতিদের, বিন্ধ্য মধ্যভারতের আরণ্যকদের এবং পারিপাত্র নিষাদদের।

ভাগবত পুরাণে কিছু পর্বতের নাম পাওয়া যায়—যা চিহ্নিত করা শক্ত। যেমন, সুরস, শত, শৃঙ্গ, বামদেব, কুণ্ড, কুমুদ, পুষ্প, বর্ষ, সহস্র, দেবানিকা, কপিল, ঈশান, শতকেশর, দেবপাল, সহস্রস্রোত ইত্যাদি।

গুহা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা সারা পৃথিবী জুড়েই আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই প্রাকৃতিক এবং মানুষ কিছুটা বসবাস যোগ্য করে নিয়েছিল। এদের অনেকগুলিরই আবার গর্ভগৃহ ছিল—এবং দেওয়ালগুলি জীবজন্তু ও নানান প্রাকৃতিক ছবিতে শোভিত। গুহাগুলি মানুষের জীবন মরণের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই গুহাগুলিতেই আমাদের সুদূর পূর্বপুরুষেরা বিভিন্ন পথে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মীয় আবাসস্থল হিসাবে গুহাগুলির ব্যবহার প্রথম পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্যে। উপনিষদের গুহাগুলি ধর্মীয় আবাসস্থল হিসাবে উল্লিখিত হয়নি। অরণ্য, খোলা জায়গা, রাস্তা, গাছের ছাওয়া, পরিত্যক্ত বাড়ি, সমাধিস্থল, গিরিগুহাগুলি ভারতীয় পলাতক অপরাধীদের, ভবঘুরেদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গুহাগুলি সংসারত্যাগীদের কাছে তপস্যা ও ধ্যান করারও আশ্রয়স্থল হয়ে

উঠেছিল। সত্যিই ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার স্থান ছিল এগুলি। প্রাচীন গুহাগুলির বেশির ভাগ রাজগৃহ—অধুনা রাজগীরের সংলগ্ন এলাকায় ছিল। শুধু একটিই মাত্র ছিল কোশাম্বীর কাছাকাছি। রাজগৃহের বিখ্যাত গুহাগুলির মধ্যে ছিল ইন্দ্রশাল গুহা এবং সপ্তপর্ণী গুহা। বিনয়পিটকে বলা হয়েছে একটি প্রাকৃতিক গুহাকে যখন মানুষ হাত লাগিয়ে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলে তখন তাকে বলা হয় 'লেন'। অশোকের সময় থেকে ভারতীয় গুহাগুলিতে স্থাপত্য সংযোজিত করা হয়। রাজা খারবেলের সময় পর্যন্ত এরকমটা চলে। গয়ার ২০ মাইল উত্তরে খালটিক বা অধুনা বারাবার পাহাড়ে চারটি গুহা অশোক আজীবকদের দান করেন। নাগার্জুনী পাহাড়ের তিনটি গুহা দান করেন দশরথ। উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির গুহাগুলি জৈন সাধুদের দান করা হয়। অন্ধ্ররাজ শতকর্ণীর যুগ থেকে ভারতীয় গুহাগুলি বিহার-চৈত্য-মন্দিরে রূপান্তরিত হচ্ছিল। যেমন হয়েছিল কারলে, ভাজ, অজন্তা, ইলোরা, ঔরঙ্গাবাদ, এলিফ্যান্টা এবং বাগ। ইলোরার কৈলাশ মন্দির পাহাড়ে কেটে-কুঁদে তৈরি করা।

ইন্দ্রশাল গুহা ঃ বুদ্ধঘোষের কথা অনুযায়ী একটি ইন্দ্রশাল গাছ, গুহার প্রবেশ পথের মুখে ছিল। ভারহুত স্থাপত্যে এই গাছটি সমেত ইন্দ্রশাল গুহাটিকে দেখান হয়েছে। দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে আমরা পাই যে গুহাটি বেদিয়ক পর্বতে ছিল। রাজগীরের ছ-মাইল দূরে ছিল এই বেদিয়ক পর্বত। এরই বর্তমান নাম গিরিয়ক পর্বত। বুদ্ধঘোষের বিবরণ অনুযায়ী এটি দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি গুহা। বেদিয়ক পর্বতের সঙ্গে এটি যুক্ত। বেদির আকৃতির নীল পাথরের পর্বত তাই বেদিয়ক। বুদ্ধঘোষ লিখেছেন, দরজা জানলাওলা একটি প্রাচীরে ঘেরা ছিল গুহাটি। দেওয়ালে চুণের প্রলেপ। বিভিন্ন ফুল পাতা আঁকা এবং 'স্ক্রল' ঝুলত। ছবির মতো সুন্দর ছিল গুহাটি। কিন্তু ভারহুত স্থাপত্যে দেখা যাচ্ছে, এটি মুখখোলা একটি গুহা। পাথরের মেঝে এবং ধনুকের মতো বাঁকা ছাদ। ইন্দ্রশাল গাছটিকে গুহার ওপরে দেখান হয়েছে। ভেতরটি পালিশ করা। বুদ্ধগয়ার পাথরের 'রেলিং'-এ এটিকে মুখ খোলা, ভেতরে ধনুকাকৃতির ছাদ এবং একটি বৌদ্ধ-রেলিং দিয়ে ঘেরা গুহা হিসাবে দেখানো হয়েছে। তাই পালি সাহিত্যের বর্ণনা কতটা সঠিক তা ঠিক বলা যায় না।

পিপ্পলি গুহা ঃ নিঃসঙ্গ এই গুহাটির নামকরণ একটি পিপুল গাছ থেকে। গুহার সামনে ছিল এই গাছটি। থের মহাকশ্যপ এখানে বাস করতেন। নির্জনে তপস্যার জন্যে এটিকে ব্যবহার করা হত। ফা-হিয়েন বলেছেন, দুপুরে আহারের পর বুদ্ধ এখানে ধ্যান করতেন মাঝে মধ্যে। গুহাটির অবস্থান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সপ্তপর্ণী গুহা ঃ সপ্তপর্ণ গুহা নামেও এটি প্রসিদ্ধ ছিল। সপ্তপর্ণী লতা থেকে এই গুহার নামকরণ করা হয়েছিল। বৈভার পাহাড়ের উত্তরে যে এই গুহাটির অবস্থান ছিল সে বিষয়ে মহাবস্তু এবং চিনা পরিব্রাজকরা নিশ্চিত ছিলেন। এই প্রশস্ত গুহাটিতে প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন হয়েছিল। কিন্তু বিনয় পিটক কোনও নির্দিষ্ট একটি গুহার কথা বলে নি। বলেছে যে পাঁচশতজন প্রতিনিধি রাজগৃহের বিভিন্ন গুহা, বিহার, চৈত্যে, এবং কন্দরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা এও শুনেছি যে এইসব আশ্রয়স্থলগুলির সংস্কার করা হয়েছিল যাতে বর্ষার দিনে আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলির কোনও অসুবিধা না হয়।

সিংহলের উপাখ্যানে বলা হয়েছে, এ কাজে সপ্তপর্ণী গুহাই একমাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। এই গুহার প্রকৃত অবস্থান নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব রয়েছে। ফা-হিয়েনের মতে এটি পিপ্পল গুহার প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ছিল। কানিংহামের হিসেব মতো এটি বৈভার পাহাড়ের দক্ষিণে শোনভাণ্ডার গুহা। আবার পালি 'দীঘ নিকায়' গ্রন্থে এটিকে ঋষিগিরি পাহাড়ের লাগোয়া বলে বলা হয়েছে। বর্তমানে শোনভাণ্ডার গুহাটিকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে একটি সভার আয়োজনের পক্ষে এটি আদর্শ। এখানে মানুষের সংস্কারের ছাপও দেখা যায়।

বরাহগুহা ঃ এটি গৃহ্যকুট পাহাড়ের একটি প্রাকৃতিক গুহা। সন্ন্যাসী-শ্রমণেরা এখানে আশ্রয় নিতেন। পরিব্রাজক দীঘনখ বুদ্ধের সঙ্গে এই গুহাতেই সাক্ষাৎ করেন। বরাহগুহা নামকরণের কারণ হল—এখানে বরাহরা বাস করত।

গিরি কন্দরগুলি সবই প্রাকৃতিক, তিন্দুক কন্দরের সামনে একটি তিন্দুক গাছ (প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না) ছিল। তাপোদ কন্দর নিকটবর্তী একটি উষ্ণপ্রস্রবণের নাম অনুসারে। কপোতকন্দর পায়রাদের আবাসভূমি। উদান কন্দর ছিল রাজগৃহের কিছু দূরে। কিন্তু হিউয়েন সাঙের মতে এটি ইন্দ্রশৈল গুহার ৯/১০ মাইল উত্তর পূর্বে।

পিলাখ গুহা পালি উপাখ্যান মতে একটি ডুমুর গাছের নাম অনুযায়ী। বলা হয়ে থাকে, এটি মাটির বুকে একটি গর্ত—বর্ষায় জল জমা হলে ওটিকে একটি জলাশয়ের মতো মনে হোত। শ্রুতি রয়েছে, সন্দক নামে জনৈক পরিব্রাজক গ্রীষ্মকালে এখানে তাঁর ৫০০ জন শিষ্য নিয়ে বসবাস করতেন। খুঁটি পুঁতে মাথার ওপর এক স্বল্পকালীন চাল লাগিয়ে নিতেন।

পাহাড় খোদাই করা নানান কৃত্রিম গুহার সন্ধানও আমরা পেয়েছি পূর্বভারতের উড়িষ্যায়। জৈনরাজা খারবেল ও তাঁর রানীর নাম সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের গুহাগুলির সঙ্গে শাতকর্ণী রাজাদের নাম জড়িত। প্রায় একই সময়ের পভোনা গুহার কথা বলা যায়। প্রাচীন কৌশাম্বীর দুমাইল পশ্চিমে কাশ্যপিয় নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে এটি অহিছত্রের রাজা আষাঢ়সেনা উৎসর্গ করেন।

ওড়িশার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি : এই দুটি জৈন গুহায় দাতাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বলিত পাথরে উৎকীর্ণ দানপত্রও পাওয়া যায়। খণ্ডগিরির অনন্ত গুম্ফা এবং উদয়গিরির রানীগুম্ফা, গণেশ গুম্ফা এবং জয়বিজয় গুম্ফা স্থাপত্য এবং শৈল্পিক দৃষ্টিতে খুবই উন্নত। হাতি গুম্ফা একটি প্রাকৃতিক গুহা হলেও খারবেল এটিকে খোদাই করে উপযুক্ত করে তুলে ছিলেন। হাতি গুম্ফার কাছাকাছি ছোট ছোট কয়েকটি গুহা রয়েছে। যেমন মুখ ব্যদন করা বাঘ—ব্যাঘ্র-গুম্ফা। সাপের ফণার মতো সর্প-গুম্ফা। উদয় গিরির ঢালে একতলা একটি বাড়ি রয়েছে—নাম, ছোট হাতি-গুম্ফা এবং উঠোনে দুটো হাতির প্রতিমূর্তিও রয়েছে। উদয়গিরির রানীগুম্ফা খুবই অলংকৃত।

নাসিকের গুহাগুলি : রাস্তা থেকে ৩০০ ফুট ওপরে। এগুলি বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতাবলম্বীদের ভদ্রযানি সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত হয়েছিল। মোট ২৩টি জায়গায় খনন করা হয়েছে। সবচেয়ে পুরোনটি হচ্ছে চৈত্য গুহা। গুহা নং ১ একটি অসম্পূর্ণ বিহার। গুহা নং ২—এটির সঙ্গে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল দুটি কাঠের স্তম্ভের ওপর

দাঁড়ানো একটি বারান্দা। গুহা নং ৩—একটি বড় বিহার, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ এবং একটি বড় সভাগৃহ। প্রবেশদ্বারটি সাঁচির ঢংয়ে প্রস্তুত। এটি করিয়েছিলেন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী। গুহা নং ১০-ও একটি বিহার। এর থামগুলা একটি বারান্দা আছে। গুহা নং ১৭—২৩ ফুট চওড়া এবং ৩২ ফুট লম্বা একটি সভাগৃহ। এর পেছনের দেওয়ালে একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি রয়েছে।

মুম্বাই-পুণার মধ্যবর্তী ভোরঘাট পাহাড়ে রয়েছে বিখ্যাত কারলী এবং ভাজ গুহা নামে দুটি বৌদ্ধ গুহা মন্দির। উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় এ দুটি নহপান এবং উশবদাতের আমলে উৎসর্গীকৃত। কারলী গুহার প্রবেশপথের সামনে সারনাথের অশোক স্তম্ভের মতো একটি স্তম্ভ রয়েছে। এ দুটির ডান দিকে রয়েছে একটি শিব মন্দির। এরই কাছাকাছি ধর্মচক্র সম্বলিত দ্বিতীয় স্তম্ভটি রয়েছে।

ভাজ গুহা নং ১—একটি প্রাকৃতিক গিরি কন্দর। গুহা নং ২—৬ সবই সাধারণ বিহার। এখানে একটি চৈত্য রয়েছে যেটি গুহা স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন।

ইলোরার গুহাগুলি আওরঙ্গাদাবাদ থেকে ১৬ মাইল দুরে এবং দৌলতাবাদের ১০ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। তিনটি ধর্মের অবস্থান এখানে দেখা যায়। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন।

বাঘ গুহাটি ধারের ৪০ মাইল পশ্চিমে। এটি গুপ্তযুগের।

অজন্তার গুহাগুলি বৌদ্ধযুগের খোদাই করা গিরিগুহা। এটি ঔরঙ্গাদাবাদের ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে। এর ২৬টি গুহাই এক সময়কার নয়। কেন্দ্রীয় সাতটি গুহা হচ্ছে প্রাচীন। বাকি গুলোর অলংকরণের সঙ্গে এর উল্লেখযোগ্য প্রভেদ রয়েছে। ভি. এ. স্মিথের মতে অজন্তার ছবিগুলো নিশ্চয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্য বংশের আমলে আঁকা হয়েছিল। পুরোন গুহা নং ৯ এবং ১০ সম্ভবত প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে তৈরি করা হয়েছিল। অজন্তার গুহাগুলি চৈত্য এবং বিহারের গঠনের মতো।

ড. ভোগেলের মতে, একদা যে গুহামন্দির স্থাপত্যের সূচনা হয়েছিল—ঔরঙ্গাবাদের গুহাগুলি তার চূড়ান্ত রূপ।

এলিফ্যান্টা গুহা অ্যাপেলো বন্দরের ৬ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের—উভয়েই প্রভাব দেখা যায়। ত্রিমূর্তি প্রধান 'হল' ঘরের দেওয়ালে খোদিত। গুহাগুলির মধ্যে একটি বৌদ্ধ চৈত্য রয়েছে।

যে উদ্দেশ্যে সেদিন গুহাগুলি নির্মিত বা দান করা হয়েছিল—আজ তা মূল্যহীন। কিন্তু এর মধ্যে বেঁচে রয়েছে ভারতের প্রাচীন গৌরব। ইতিহাস।

নদী

ভারতে নদীর সংখ্যা অসংখ্য। ধমনীর মতো ভারতের জীবন প্রবাহ এর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। পাহাড় থেকে তারা ভূমির ঢাল অনুসরণ করে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। শাখা-প্রশাখাগুলি যেন এক জাল রচনা করেছে। কোথাও এরা স্রোতস্বিনী, কোথাও তরঙ্গিনী আবার কোথাও কলনাদিনী—জলপ্রপাত, হ্রদ, দ্বীপ সৃষ্টি করে সমুদ্র সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। এর কূলে বা কূলের কাছাকাছি গড়ে উঠেছে বসতি, রাজ্য, উর্বর জমি।

ভারত তার উদ্‌পাদনের জন্যে এই নদী গুলির কাছে অশেষ ঋণী, এই নদীগুলি বেয়েই প্রবাহিত হোত ব্যবসা বাণিজ্য। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে—সমস্ত নদীগুলিই পবিত্র। সব নদী সাগরে পড়ে। এরা পাপ ধুয়ে দেয়।

ঋগ্বেদে সেই সময়কার আর্য অধ্যুসিত অঞ্চলগুলিকে বলা হয়েছে 'সপ্তসিন্ধব'— সিন্ধু সমেত ছ'টি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরস্বতী কিংবা কুভা (কাবুল) কিংবা অক্ষু নদী। যখন আর্যেরা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাদের বসতি অঞ্চলে ছিল সাতটি প্রধান নদী—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী। বৌদ্ধ অধ্যুসিত মধ্যদেশের সাতটি নদীর নাম 'মাঝ্‌ঝিম নিকায়' গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে বহুকা (বহুধা), অধিকক্কা, গয়া (ফল্গু), সুন্দরীকা, সরস্বতী, পয়াগা (গঙ্গা, যমুনা ও বাহুমতির মিলন স্থল)। আরও একটি সূত্রে পাওয়া যায় অন্য সাতটির নাম, গঙ্গা, যমুনা, সরভূ (সরযূ), সরস্বতী, অচিরাবতী, মহী এবং মহানদী।

কালিদাস রঘুবংশে লিখেছেন, সুদূর পূর্বদিকে রয়েছে পূর্ব সাগর বা আধুনিক বঙ্গোপসাগর। উপকূল ভাগে বাস করে সুম এবং বঙ্গের লোকেরা। এই পূর্বসাগর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে মিশেছে মহাদদধিতে (ভারত মহাসাগর)। পূর্ব উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিকে বাস করে মহা শক্তিশালী কলিঙ্গবাসী এবং পাণ্ড্যরা। দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে বাস করে কেরালারা, সমগ্র পশ্চিম উপকূলকে বলা হয় অপরান্ত অঞ্চল।

সিন্ধু জোট

ঋগ্বেদেব সময় থেকেই 'ইন্ডাস' ভারতীয়দের কাছে সিন্ধু নামে পরিচিত। এটি সংবেদ বা সংগম নামেও পরিচিত। শুরুতে সিন্ধু দুটি মিলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। একটি কৈলাস পর্বতের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর পশ্চিমে। অন্যটি কৈলাস পর্বতের উত্তর পূর্বে একটি হ্রদ থেকে বার হয়ে উত্তর পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণ পশ্চিমে এগিয়ে দুটি ধারা এক জায়গায় মিলিত হয়। এই সংগমের পর থেকে এটি উত্তর পশ্চিমে অনেক দূর এগোবার পর কারাকোরাম পর্বতমালার নীচে দক্ষিণে বাঁক নেয়। এরপর কিছুটা সর্পিল গতিতে—দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মোহনার মুখে দুটি 'ব' দ্বীপ সৃষ্টি করে আরব সাগরে গিয়ে পড়ে। প্লিনির মতে সিন্ধু জোট সিন্ধু সমেত আরও উনিশটি নদী নিয়ে গঠিত যার মধ্যে 'হাইডাসপেস' বা ঝিলম বিখ্যাত। সিন্ধুনদকে পশ্চিম ভারতের সীমারেখা বলে মনে করা হোত। এরিয়ান বলেছেন, সিন্ধু অনেক জায়গায় প্রশস্ত হয়ে হ্রদের আকার নিয়েছে। উত্তরাপথে সিন্ধুই হচ্ছে একমাত্র বিশাল নদী। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সিন্ধুর সমকক্ষ নদী আর নেই। কিন্তু মেগাস্থিনিস বলেছেন একমাত্র গঙ্গাই এর সমকক্ষ।

আলবিরুনীর মতে সিন্ধু-চেনাব (চন্দ্রভাগা) এর সঙ্গমের ওপরের অংশ সিন্ধু নামে পরিচিত। নীচে অরোর পর্যন্ত অংশের নাম পঞ্চনদ, এবং অরোর থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশের নাম মিহরান। দারায়ুসের বেহিস্তুন লিপিতে একে বলা হয়েছে 'হিন্দু'। ভেন্দিদাদের লেখতে 'হেন্দু'। যে দেশের ওপর দিয়ে সিন্ধুনদ প্রবাহিত— সেই দেশের নাম এই নদীটি থেকেই নেওয়া হয়েছে। সিন্ধুতে মিলিত হওয়া অনেক নদীর নাম ঋগ্বেদের স্তোত্রে পাওয়া যায়। এরকম কিছু নদীর নামও চেনা যায়। যেমন পশ্চিমে কুভা—নিঃসন্দেহে বর্তমান

কাবুল। এটিই এরিয়ানের কোফেস, প্লিনির কোফেন, টলেমির কোয়া, এবং পুরাণের কুহু। আটকের (হাঠক) কিছু ওপরে 'কুহু' সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুবাস্তু বা স্বাত (এরিয়ানের সোয়াসটোস) এবং গৌরী (এরিয়ানের গারোইয়া) নামে নদী এর সঙ্গে প্রাং-এ মিলিত হয়েছে। কুহুর আর একটি উপনদী রয়েছে। নাম এরিয়ান অনুযায়ী মালোমানটোস—সম্ভবত তা কাম্বে বা খোনার। বৈদিক ক্রমু—আধুনিক কুরাম যার উপনদী তাছি। সিন্ধুর আর একটি উপনদী গোমতীর বর্তমান নাম গোমাল।

পূর্বদিকে সিন্ধুর চারটি উপনদী চন্দ্রভাগা বা চেনাব নাম নিয়ে প্রবাহিত এবং সুদূর পশ্চিমে রয়েছে বিতস্তা, বিতংসা বা ঝিলাম। চন্দ্রভাগা বা চেনাব কিসতওয়ারের কাছে দুটি পাহাড়ী নদীর মিলিত ধারা। কিসতওয়ার থেকে রিসতওয়ার পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে এর প্রবাহ। জম্মু অতিক্রম করে চন্দ্রভাগা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হবার সময় ঝিলাম এবং তার মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি দোয়াব সৃষ্টি করে। এটি ঋগ্বেদের অসিক্নী, এরিয়ানের আকেসিনেস এবং টলেমির সনদোবাগা বা সানদোবল 'বার লাছ' গিরিপথের বিপরীত দিক দিয়ে (কাংড়া জেলায়) চন্দ্র এবং ভাগা বার হয়েছে। রাভি বা ইরাবতীকে (গ্রিকরা বলত হাইড্রাউটিস বা অদ্রিশ, বা রোনাডিস) আমরা প্রথম দেখি কাশ্মীরের ছাম্ব উপত্যকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দুটি নদীর মিলিত ধারা হিসাবে। ছাম্ব থেকে এটি দক্ষিণ পশ্চিমের পথ ধরে লাহোরকে অতিক্রম করে চেনাব বা বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মিলিত ধারার সঙ্গে মিলিত হয়। বিয়াস বা বিপাশার উৎপত্তি পীর পাঞ্জাল গিরিশ্রেণির রোহটাং গিরিপথের কাছে—রাভির উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি। ছাম্ব উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটিব নদীর মিলিত ধারা রূপে এটি প্রথমে আমাদের নজরে আসে। একটি প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর-পূর্বে অন্যটি দক্ষিণ-পূর্বে—দুটিরই উৎপত্তি হিমালয় পর্বতশ্রেণি। ছাম্ব থেকে এটি দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে কাপুরতলার দক্ষিণ পশ্চিমে শতদ্রু (সাটলেজ)র সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এর গ্রিক নাম হাইপাসেস বা হাইপাসিস।

শতদ্রুর উৎপত্তিস্থল মানস সরোবরের পশ্চিমে। বিষ্ণু স্মৃতিতে শতদ্রুর নাম পাওয়া যায়। শতদ্রু—অর্থাৎ টলেমির জারাদ্রোস বা প্লিনির হেসিড্রাস পূর্বে সিন্ধুর অন্যতম জল সরবরাহকারী। দক্ষিণ-পশ্চিমে কামেত এবং সিমলা পাহাড়ের ওপর সামান্য বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে আঁকাবাঁকা পথ ধরে বিলাসপুরের মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিম কোনায় এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে বিতস্তার সঙ্গে মিলিত হয়। যুগ্মধারা দক্ষিণ পশ্চিমে বয়ে গিয়ে আলিপুর ও উছের মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলিত হয়। এই চার-পাঁচ নদীর মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নাম নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে আরও এগিয়ে গিয়ে পঞ্চনদে সিন্ধুর বুকে গিয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে এটি সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে প্রবাহিত হোত।

সরস্বতী-দৃষদ্বতী জোট (মরু নদী সমূহ) : সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই ঐতিহাসিক নদী দুটি উত্তরাপথের দুটি স্বাধীন নদী। সিন্ধু জোটের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং স্বতন্ত্র। এই দুটি পবিত্র নদীর মধ্যবর্তী স্থলে ছিল মনু কথিত ব্রহ্মাবর্ত। বৈদিক যুগে পবিত্র সরস্বতীর নাম মিলিন্দপঞ্হোতে পাওয়া যায় এবং একে হিমালয়জাত নদী বলা হয়েছে। সিমলা পাহাড়ের ওপরের দিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণির মধ্যে এর উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। এটি সিমলা ও সিরমার রাজ্যের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত। পাতিয়ালা পার

হয়ে রাজস্থানের মরুভূমির উত্তর অংশে সিরসা থেকে কিছুটা দূরে হারিয়ে যায়। যে জায়গায় সরস্বতী দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়—মনু সেই জায়গাটির নাম বলেছেন বিনাশন। সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে, সরস্বতী এমন এক নদী যাকে এক জায়গায় দেখা যায়—আর জায়গায় সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। চালায়ুর গ্রামের কাছে বালির মধ্যে এটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার ভবানীপুরে দেখা দেয়। বালহাপারে এটি পুনরায় অদৃশ্য হয়ে বরাখেরায় দৃশ্যমান হয়। পেহয়ার কাছে উরনাইতে মার্কন্ড নদী এর সঙ্গে যুক্ত হয়। মিলিত ধারা সরস্বতী নাম নিয়েই এগিয়ে চলে ঘর্ঘরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেটিই সরস্বতীর নিম্নভাগ, এই নদীটি এখনও বিদ্যমান এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়। বৈদিক আর্যদের কালে এটি একটি শক্তিশালী নদী ছিল এবং সাগরে গিয়ে মিশত। প্রাচীনকালে সরস্বতীর পবিত্রতীরে বহু যাগযজ্ঞ হোত।

দৃষদ্বতী : নদীটি যমুনার কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। এর উৎস সিরমার পাহাড়ে, নাহোম পর্যন্ত পশ্চিমে বয়ে চলে দক্ষিণে মোড় নিয়ে আম্বালা এবং শাহবাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে। সিরসাতে এটি সরস্বতীর সঙ্গে মেশে। কিছু দূরে মিলিত ধারা অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাচীন নগর পৃথুদক (বর্তমান পেহোয়া) এই নদীর তীরে অবস্থিত। মনুসংহিতা অনুসারে এই নদীটি ব্রহ্মাবর্তের পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমা নির্দেশ করে। পশ্চিম সীমা অবশ্য নির্দেশ করে সরস্বতী। মহাভারতের বনপর্বে দৃষদ্বতী এবং কৌশিকী নদীর মিলিত ধারাকে পবিত্র বলা হয়েছে। বামনপুরাণে কৌশিকীকে দৃষদ্বতীর শাখা নদী বলা হয়েছে, কানিংহাম বর্তমানে থানেশ্বরের দক্ষিণ পশ্চিমে বয়ে চলা রাক্ষি নদীকে দৃষদ্বতী বলে চিহ্নিত করেছেন, অন্যদিকে এলফিনস্টোন এবং টড বলেছেন আম্বালা ও সিন্ধের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা ঘর্ঘরই হচ্ছে দৃষদ্বতী, র‍্যাপসনের মতে সরস্বতীর সমান্তরাল পথে বয়ে চলা চিৎরং, চানটং বা চিতংই হচ্ছে দৃষদ্বতী। ঋগ্বেদে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'আপয়া' নামে একটি নদীর কথা জানা যায়। লুইডিগ গঙ্গার অপর নাম আপয়া নামে চিহ্নিত করেন। কিন্তু জিমার সঠিক ভাবেই এটিকে সরস্বতীর কাছাকাছি বলেই চিহ্নিত করেন। আবার পিসচেল এটিকে কুরুক্ষেত্রের প্রখ্যাত নদী আপয়া বলে চিহ্নিত করেছেন।

গঙ্গা-যমুনা জোট

গঙ্গা ভারতের অন্যতম প্রধান পবিত্র নদী। প্রাচীন লেখকরা বলেছেন গঙ্গার উনিশটি উপনদী রয়েছে। গঙ্গা অনেক নামে পরিচিত। যেমন বিষ্ণুপদী, জাহ্নবী, মন্দাকিনী, ভাগিরথী ইত্যাদি। গঙ্গার উৎপত্তিস্থলের সম্বন্ধে পালি, জৈন এবং মহাভারতে মতদ্বৈততা রয়েছে। আধুনিক ভূগোলবিদেরা বলেন, গঙ্গোত্রীতে ভাগিরথী প্রথম প্রকাশ্যে আসে। দেবপ্রয়াগে বাঁদিক দিয়ে এসে অলকনন্দা এর সঙ্গে মেশে। দেবপ্রয়াগ থেকে এই মিলিত ধারাকে বলা হয় গঙ্গা। হরিদ্বারে এটি সমতল ভূমিতে নামে। হরিদ্বার থেকে বুলন্দ শহর পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ গতি, তারপর প্রয়াগ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্বে। প্রয়াগে (এলাহাবাদ) যমুনা এসে এর সঙ্গে মিলিত হয়, এলাহাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত এর গতি পূর্বদিকে। এর পরে আবার এটির গতি দক্ষিণ পূর্বে। অলকনন্দা গঙ্গার পার্বত্য অংশকে নির্দেশ করে। মন্দাকিনী অলকানন্দার উপনদী এবং কালিগঙ্গা বলে এটিকে চিহ্নিত করা যায়। ধরা যেতে পারে,

মন্দাকিনীর সংগমস্থল থেকেই গঙ্গা গঙ্গা-ভাগিরথী নাম নিয়েছে। ফারুকাবাদের ঠিক ওপরে নুতা নামে এক উপনদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফারুকাবাদ এবং হরদাই-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রামগঙ্গা নামে আর একটি উপনদী গঙ্গায় এসে পড়েছে। গোমতী—বারাণসী আর গাজিপুরের মধ্যে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আজমগড়ের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে বালিয়ার পশ্চিমে তমসা গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ছাপরা জেলায় সরযূ যুক্ত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে। এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক নদীটি এখন ঘর্ঘরা নামে পরিচিত। সারা জেলার পশ্চিমে ছোট গন্ডক ঘর্ঘরার (সরযূ) সঙ্গে মিশেছে। প্রাচীন অযোধ্যা নগরী এই সরযূর কূলে অবস্থিত ছিল। ছোট গন্ডক হিরণ্যবতী বা অজিতবতী নামে পরিচিত হয়ে গোরখপুর জেলার ভেতর দিয়ে গিয়ে ঘর্ঘরার সঙ্গে মিশেছে। অচিরাবতী গোরখপুর জেলার বুরহাজে গিয়ে ঘর্ঘরার সঙ্গে মিশেছে। গন্ডকী (আধুনিক গন্ডক) সারা জেলার শোণপুর এর মজফ্ফরপুর জেলার হাজিপুরের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। শতপথ ব্রাহ্মণের সদানীর নদীকে কেউ কেউ গন্ডক বলে চিহ্নিত করেন, কেউ বা তাপ্তীর সঙ্গে। আবার কেউ কেউ করতোয়ার সঙ্গে। মহাভারতে এটিকে গন্ডকী আর সরযূর মধ্যবর্তী স্থানে বলা হয়েছে। পারজিটার এটিকে রাপ্তী বলে চিহ্নিত করেন। বুড়ী গন্ডক উপনদী গঙ্গার সঙ্গে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে মিশেছে। বাগমতী বা বাগমতী নেপালের বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র নদী কমলা গঙ্গার ওপর দিকের এক উপনদী। কৌশিকী (কুসী) ভাগলপুর, পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে বয়ে গিয়ে পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণপূর্বে মানহারিতে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তমসা বর্তমান দক্ষিণ (টোন) রামায়ণ খ্যাত নদী ঋক্ষপর্বতের উত্তর পূর্বে বয়ে গিয়ে এলাহাবাদের নীচে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। নীচের দিকে গঙ্গার বিখ্যাত উপনদী শোণের (এরিয়ানের সোনাস) উৎপত্তি স্থল মেকলা পর্বতশ্রেণি (মইকাল) জব্বলপুর জেলা, বাঘেলখন্ডের ভেতর দিয়ে উত্তরপূর্বে বয়ে গিয়ে পাটনায় গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শোণের পাঁচটি উপনদী রয়েছে। দক্ষিণী উপনদী পুনঃপুন (বর্তমান পুনপুন) পাটনার ঠিক নীচে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আরও একটি দক্ষিনী উপনদী ফল্গু লক্ষী সরাইয়ের উত্তর পূর্বে মুঙ্গেরে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। সকুটি, যা বর্তমান সকরি নদী পাটনা আর মুঙ্গেরের মধ্যে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। গঙ্গার নিম্নভাগ পশ্চিমবঙ্গে ভাগিরথী-হুগলী আর পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনা নামে পরিচিত। ভাগিরথীর প্রথম উপনদী মুর্শিদাবাদ জেলার বানসলোই। মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু ওপরে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। অজয় কাটোয়ার কাছে ভাগিরথীর সঙ্গে মিলেছে, ভাগিরথীর নীচের দিকে বিখ্যাত উপনদী দামোদর। এটি হাজারীবাগ জেলার বাগোদার পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা, বর্ধমান, এবং হুগলীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলীতে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। রূপনারায়ণ বাঁকুড়া, হুগলীর ভেতর দিয়ে মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছে হুগলীর সঙ্গে মেশে। হলদী এবং কাঁসাইয়ের যুগ্ম ধারাও হুগলীর সঙ্গে মেশে। পানার উপনদী নবাবগঞ্জের নীচে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কংসাবতী আর পুর্নভবা মালদহ জেলায় পানারের দুটি উপনদী। আত্রেয়ী আর ছোট যমুনা রাজশাহী জেলায় মিলিত হয়েছে— এরা পানারেরও উপনদী। গোয়ালন্দে বড় যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। এই মিলিত ধারার নাম পদ্মা। ফরিদপুর জেলার পূর্বে এটি মেঘনার সঙ্গে মেশে। গরাই

ফরিদপুর জেলার পানসায় গঙ্গা থেকে বেরিয়ে মধুমতী নাম নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুরের কাছে আবার হরিণঘাটা নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। আড়িয়াখাল ফরিদপুর শহরের নীচে পদ্মা থেকে বেরিয়ে মাদারিপুর সাব ডিভিশন, বাখরগঞ্জ হয়ে সাগরে পড়েছে। পদ্মার নীচের অংশের নাম কীর্তিনাশা।

ভাগিরথী এবং পদ্মা ছাড়াও গঙ্গার জল মোহনার কাছে অসংখ্য খালের সাহায্যে সাগরে মিশছে। মোহনায় সুন্দরবন নামে বিশাল এক জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে।

গঙ্গার প্রথম এবং বিশাল পশ্চিমী উপনদী হচ্ছে যমুনা। হিমালয়ের কামেত পর্বতের নীচে এর উৎস। শিবালিক এবং গাড়ওয়াল পর্বতশ্রেণির মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এটি উত্তর ভারতে নামে। তারপর গঙ্গার সমান্তরাল হয়ে দক্ষিণে বয়ে চলে। মথুরা থেকে এটি দক্ষিণ পূর্বে বাঁক নিয়ে প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। দেরাদুন জেলায় দুটি উপনদী পশ্চিমে এর সঙ্গে মিলিত হয়। একটি উত্তর টৌন নামে খ্যাত। আগ্রা ও এলাহাবাদের মধ্যবর্তী বাঁ দিক দিয়ে আসা চারটি উপনদী এর সঙ্গে মিলিত হয়। চিনা ভাষায় যমুনা হচ্ছে হয়েন-মাউ-না। প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে এটি পাঁচটি বৃহৎ নদীর অন্যতম। এটি প্রাচীন শূরসেন ও কোশল এবং আরও নীচের দিকে কোশল ও বৎস দেশের সীমানা সূচিত করত। কারসোলীর আট মাইল দূরে যমুনোত্রী হিমবাহ এর উৎস। এটি গ্রিক ভাষায় এরান্নাবোয়াস (হিরণ্যবাহ বা হিরণ্যবাহু)। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে বালুবাহিনী এর একটি উপনদী।

ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা জোট

ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য—বোহিত) মানস সরোবরের পূর্বদিক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মানস সরোবর থেকে নামচা বারওয়া পর্যন্ত এটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হওয়ার পর দক্ষিণে মোড় নিয়ে হিমালয় পর্বতশ্রেণির পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত চলে অসমের সাদিয়ায় প্রবেশ করে। সাদিয়া থেকে গারো পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত যায়! তারপর আবার দক্ষিণে বাঁক নিয়ে বয়ে চলে গোয়ালন্দের কিছু ওপরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। তিব্বতের মালভূমির ওপর দিয়ে বয়ে চলা ব্রহ্মপুত্রের নাম সাংপো। মানস সরোবরের প্রায় ২০০ মাইল দূরে এর একটি উপনদী রয়েছে। আরও পূর্বে—আর একটি উপনদী রয়েছে। এরও কিছুটা দূরে হিমালয় থেকে উৎপন্ন আরও তিনটি উপনদী রয়েছে। সাদিয়া জেলায় লোহিত হচ্ছে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উপনদী হচ্ছে বুড়িসিদ্ধিং—লখিমপুরের দক্ষিণে। আরও নীচে পাটকই পাহাড়ে উৎপন্ন দিশরা এর একটি উপনদী। লখিমপুর এবং শিবসাগর জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র মাজুলী নামে এক বড় দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। মণিপুরের উত্তরে নাগাপাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর একটি উপনদী ধানশ্রী। আরও নীচে নওগং জেলায় কলং নদীর দুটি ধারা গিয়ে মিশেছে ব্রহ্মপুত্রে। ডানদিকে তেজপুরের নীচে আরও দুটি উপনদী রয়েছে। গোয়ালপাড়া জেলার গারো পাহাড় থেকে উৎপন্ন কৃষ্ণাই নামে একটি উপনদী রয়েছে। ডানদিকে ব্রহ্মপুত্রের আর একটি বড় উপনদী মানস।

গোয়ালন্দ ঘাটের কিছু ওপর দিকে বড় যমুনার সঙ্গে মিলিত হবার পর গঙ্গা নাম নিয়েছে পদ্মা। বড় যমুনা আসলে পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের

নবীন জলধারা। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা ময়মনসিং শহরের পাশ দিয়ে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। নাম নেয় সুরমা, বরাক এবং পুইনী। কিশোরগঞ্জ সাব ডিভিশনের ভৈরব বাজারের কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ধারা মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার মিলিত ধারা মেঘনা নাম নিয়ে বয়ে চলে। পূর্ববঙ্গে প্রবেশের পর ব্রহ্মপুত্র দ্বিধা বিভক্ত হয়। ঘোরা-ঘাটের কাছে ব্রহ্মপুত্রের বড় যমুনা অংশের সঙ্গে তিস্তা মিলিত হয়। ডান দিকে এরও কিছুটা নীচে ব্রহ্মপুত্রের একটি বড় উপনদী এসে মিলিত হয়েছে। নাম করতোয়া। একদা বাংলা এবং কামরূপের সীমা নির্দেশ করত এই নদী। রংপুর জেলার ডোমারে করতোয়ার উৎস। ঢাকা জেলায় ধলেশ্বরী ব্রহ্মপুত্রের একটি বিখ্যাত উপনদী। হাবিবগঞ্জের নীচে লক্ষার সব জলধারা ধলেশ্বরী গ্রহণ করার পর মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। ঢাকা জেলার প্রাচীন নদী ইছামতী, ধলেশ্বরী আর পদ্মার মাঝ অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলে। আগে এটি রামপালের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলত। এখন অনেক আঁকাবাঁকা পথে এটি ধলেশ্বরীর সঙ্গে মেশে। ঢাকার সুন্দর নদী লক্ষা প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র থেকে নির্গত তিনটি শাখা নদী দ্বারা গঠিত। পুর্ণা যা অসমের বিখ্যাত নদী তা আসলে মেঘনার ওপর দিককার ধারা। হাবিবগঞ্জের পশ্চিমে বরাকের সঙ্গে মিলিত হবার আগে সুর্মা পাঁচটি উপনদীর জলে পুষ্ট হয়। ত্রিপুরার পাহাড় থেকে বেরিয়ে মনু উত্তরদিকে বয়ে সিলেটে বরাকের সঙ্গে মিলিত হয়। সুর্মার নীচের দিকের ধারা যা ঢাকা জেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা মেঘনা নামে সাধারণত পরিচিত। রাজাবাড়ির কাছে এটি দুরন্ত পদ্মার সঙ্গে মেশে। ব্রহ্মপুত্রের ছোট ধারা—পূর্বে ছিল ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা। মৈমনসিং অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্র নাম নিয়েই কিশোরগঞ্জ সাব ডিভিসনে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। মুন্সীগঞ্জের সামান্য নীচে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হবার আগে ঢাকা এবং ত্রিপুরার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পদ্মা আর মেঘনার মিলিত ধারা মেঘনা নাম নিয়ে নোয়াখালি আর বাখরগঞ্জের ভেতর দিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মেশে এবং মোহনায় একটি ব-দ্বীপ গঠন করেছে।

পূর্ব ভারতে আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী সুবর্ণরেখা। মানভূমে উৎপন্ন হয়ে জামসেদপুর পার হয়ে ধলভূম ও মেদিনীপুরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

লুনী-চম্বল জোট

আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিমে লুনীই একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী। এটি আজমীর পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে সাগরে পড়ে। মোহনায় একটি ব-দ্বীপও সৃষ্টি করেছে। এর ছটি উপনদী রয়েছে। আরাবল্লী পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে বান্দি লুনীর বাঁদিকে এসে মিশেছে। বরহাইতে লুনীর সঙ্গে বাঁ দিকে মেশে বানাস। কচ্ছ উপসাগরে পড়বার আগে আরাবল্লী পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে সরস্বতী বাঁদিক দিয়ে লুনীর সঙ্গে মেশে।

চম্বল বা চর্মন্বতি : আরাবল্লী পাহাড় থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে রাজস্থানে যমুনার সঙ্গে মেশে। বিন্ধ্যপর্বত থেকে বেরিয়ে কালিসিন্ধু উত্তর দিকে বয়ে গিয়ে পিপারদার সামান্য উত্তরে ডানদিক দিয়ে চম্বলের সঙ্গে মিশছে।

পার্বতী ইন্দোরের একটি স্থানীয় নদী। এটি উত্তর পশ্চিমে বয়ে গিয়ে ডানদিক থেকে চম্বলের সঙ্গে মিশছে। কানিংহামের মতে এটি পুরাণের পারা নদী। কুনু চম্বলের একটি ডানদিকের উপনদী আর মেজ বাঁদিকের প্রথম এক উপনদী। আরাবল্লী থেকে নির্গত চম্বলের আর একটি উপনদী বেরাচ। যে জায়গায় বেরাচ ধুন্দেব সঙ্গে মেশে সেখান থেকে তার নাম বানস (বর্ণনাশা)। চম্বলের ওপর দিকে যমুনার একটি উপনদী গম্ভীরা। বেত্রবতী (আধুনিক বেতয়া) পারিপাত্র পাহাড় থেকে উৎপন্ন। যমুনার সঙ্গে মিলিত হবার পথে এর কয়েকটি উপনদী রয়েছে। বেত্রবতীর নীচে 'কেন' (এরিয়ানের কেইনাস)' যমুনার একটি উল্লেখযোগ্য উপনদী। মহী পারিপাত্র থেকে বেরিয়ে আহমেদাবাদের মধ্যে দিয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে। বিহালা এবং বেগবতী সৌরাষ্ট্রের উরজয়ন্ত পাহাড় থেকে উৎপন্ন। কাথিয়াবাড়ের ভদর কাথিয়াওয়াড়ের মণ্ডব পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে আরব সাগরে পড়ছে। বেত্রবতীর একটি উপনদী দশার্ন। নিরবিন্ধা উজ্জয়িনী এবং বিদিশার মধ্যবর্তী একটি নদী। সিপ্রা গোয়ালিয়রের একটি স্থানীয় নদী—সিতামানের কাছে চম্বলে গিয়ে পড়েছে। এটি একটি ঐতিহাসিক নদী। এরই তীরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর অবস্থিত ছিল।

নর্মদা-তাপ্তি জোট

নর্মদা মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। মইকাল পর্বতশ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। ইন্দোরের মধ্যে দিয়ে মুম্বাইয়ের রেবাকণ্ঠের পাশ হয়ে ব্রোচে গিয়ে সাগরে পড়েছে। যেহেতু নদীটি বিন্ধ্য এবং সাতপুরা পর্বতশ্রেণির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, তাই এর অনেকগুলি উপনদী রয়েছে। ইন্দোরে প্রবেশের আগে তেরটি উপনদী এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নর্মদা (টলেমির নর্মাদোস) রেবা, সমোদভবা, বা মেকলসুতা নামেও পরিচিত। শেষ নামটির সঙ্গে এর উৎসের নামটি জড়িত— মৈকাল পর্বত। প্রাচীন মেকল রাজ্যের নামও এর সঙ্গে জড়িত। ঋক্ষ পর্বতের অংশ মৈকাল শোণ নদেরও উৎপত্তি স্থান। রেবার উৎপত্তি স্থল বিন্ধ্য পর্বতের পাশাপাশি অমর কণ্টক পাহাড়। নর্মদা এবং রেবা মান্ডালার কিছু ওপরে যুক্ত হয়ে নর্মদা এবং রেবা উভয় নামেই পরিচিত হয়ে বয়ে চলে। মহাভারত অনুযায়ী নর্মদা প্রাচীন অবন্তী প্রদেশের সীমারেখা নির্দিষ্ট করত। মৎস্য পুরাণ অনুযায়ী নর্মদার মোহনা একটি তীর্থস্থল।

মহাদেব পর্বতের পশ্চিমে মুলতাই মালভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে তাপ্তী বা তাপী। এই নদীটি পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে বুরহানপুরের ভেতর দিয়ে সুরাটের কাছে সমুদ্রে পড়েছে। মহাদেব পর্বত থেকে নির্গত চারটি উপনদী মধ্যপ্রদেশে তাপ্তীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সমুদ্রে পড়ার আগে পূর্ণ ছাড়া আরও ছটি উপনদী তাপ্তীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বিন্ধ্যের অংশ সাতপুরা পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে পূর্ণ বুরহানপুরের নীচে তাপ্তীর সঙ্গে মিশেছে। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এটি একটি প্রাচীন নদী। গিরনা সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তরপূর্বে প্রবাহিত হয়ে চোপদার নীচে তাপ্তীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর দুটি উপনদী রয়েছে। বোরি পশ্চিম ঘাট থেকে বেরিয়ে অমলনের-এর কিছু ওপরে তাপ্তীর সঙ্গে মিশেছে। পাঞ্জরা তাপ্তীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী যা পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হয়ে শিরপুরের কাছে তাপ্তীর বুকে পড়েছে।

মহানদী জোট

বেরারের দক্ষিণপূর্বের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে উড়িষ্যায় বৃহত্তম নদী হিসাবে বয়ে গেছে মহানদী। এটি শিহোয়া হয়ে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার মধ্য দিয়ে গেছে। উড়িষ্যার সম্বলপুরে ঢোকার আগে এটি বিলাসপুর, রায়গড় অতিক্রম করে। তারপর এটি দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে কটকের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। মোহনায় একটি 'ব' দ্বীপও সৃষ্টি করেছে। মহানদীর পাঁচটি উপনদী রয়েছে। ডানদিকে দেবী আর প্রোচী। ছোট মহানদী গঞ্জাম জেলার উত্তরের পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে চন্দ্রপুরের কাছে সাগরে গিয়ে পড়ে। বংশধারা গঞ্জামের একটি আভ্যন্তরীন নদী কলিঙ্গপটনকে গিয়ে সাগরে পড়ে। ঋষিকুল্যা গঞ্জাম জেলার সর্বোত্তর নদী। গঞ্জাম শহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে। লাঙ্গুলিনী (আধুনিক লাঙ্গুলিয়া) কালাহাণ্ডির পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে গঞ্জাম জেলার ভেতর দিয়ে গিয়ে শ্রীকাকুলের কাছে সাগরে গিয়ে পড়ে। ত্রিযামা বা ত্রিভাগা বা পিতৃসোমা এবং ঋষিকুল্যা পুরাণে বর্ণিত দুটি পৃথক নদী। কিন্তু মনে হয় এটি একটিই নদীর বিভিন্ন অংশের নাম। বালেশ্বর জেলাব মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বুরবালাং আসলে কারকাই-এর নিম্নভাগের নাম। কেওঞ্ঝরের পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে বালেশ্বর জেলার মধ্যে দিয়ে বৈতরণীর ওপর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। কুমারী মানভূমের দলমা পাহাড়ের কাছ দিয়ে বয়ে যায়। পলাশিনী (আধুনিক পরান) ছোট নাগপুরে কোয়েলের একটি উপনদী।

সিংভূমের দক্ষিণ ভাগের পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে ভারতের অন্যতম পবিত্র নদী বৈতরণী। উত্তর পশ্চিম, পরে দক্ষিণ-পূর্বে বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধামরার কাছে সাগরে গিয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণী বৈতরণীর মতোই পবিত্র নদী। এটিও বৈতরণীর মতো উত্তর পশ্চিম হয়ে দক্ষিণ পূর্বে বালেশ্বর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। আঙ্গুলের পূর্বে টিক্কিরা উপনদীর সঙ্গে মিলিত হয় (প্রাচীন অন্তঃশিরা বা অন্তগিরা নদী)।

গোদাবরী জোট

দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নাসিক পর্বত এর উৎপত্তি স্থল। অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গে াপসাগরে পড়েছে। দৈর্ঘ্যে এটি ৯০০ মাইল। বিন্ধ্যপর্বতের নীচ দিয়ে দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে পূর্বঘাট পর্বতমালার ভেতর দিয়ে একটি উপত্যকার সৃষ্টি করে সাগরের দিকে গেছে। মোহনার মুখে একটি বড় 'ব' দ্বীপ সৃষ্টি করে এটি তিনটি ধারায় সাগরে মিশেছে। অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বাঁ দিকে দশটি এবং ডানদিকে নটি উপনদী এর সঙ্গে মিলিত, হয়েছে। যেমন বামে পূর্ণ, কদং, প্রাণহিতা, ইন্দ্রবতী এবং ডানদিকে মঞ্জীরা, সিন্দফনা, মানের এবং কিনারসনি ইত্যাদি।

পূর্ণ নদী সহ্যাদ্রি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্বে এগিয়ে নান্দের-এর পশ্চিমে গোদাবরীর সঙ্গে মিশেছে। কদং বিন্ধ্যপর্বতের নির্মল পাহাড় শ্রেণি থেকে বেরিয়ে কোরাটলার উত্তরে গোদাবরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাণহিতা হচ্ছে গোদাবরীর ওপর দিককার দুটি উপনদীর অন্যতম। এটি ওয়েনগঙ্গার বরোদা এবং পেন গঙ্গা (পেনার)-র যুগ্মধারা। ইন্দ্রবতী

উড়িষ্যার কালাহাণ্ডির পাহাড়ে উৎপন্ন হয়েছে। এটি দক্ষিণ পশ্চিমে বয়ে গিয়ে ভোপালপটনমে গোদাবরীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সিন্দফনা গোদাবরীর নীচের দিকে পশ্চিমে একটি উপনদী। মঞ্জরীও গোদাবরীর নীচের দিকের একটি উপনদী। বালাঘাট পর্বতশ্রেণি থেকে বেরিয়ে প্রথমে দক্ষিণপূর্বে তারপর উত্তরে প্রবাহিত হয়ে গোদাবরীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মানের উত্তরপূর্বে প্রবাহিত হয়ে গোদাবরীর সঙ্গে মানথানীর পূর্বে মিশেছে। বস্তারের ভদ্রাচলমের বিপরীতে কিনারসনি গোদাবরীর সঙ্গে মিশেছে।

কৃষ্ণা জোট

পশ্চিমঘাট থেকে কৃষ্ণা নির্গত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে মালভূমির মধ্যে দিয়ে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পূর্বঘাটে একটি গিরিখাত রচনা করে এটি বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। অর্থাৎ এটি মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে গেছে। অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে বামদিকে পনেরটি এবং ডানদিকে চারটি উপনদী এর সঙ্গে মিশেছে। মহাবালেশ্বরের কাছে এর উৎপত্তি স্থল। পশ্চিমঘাট থেকে উৎপন্ন ধন কৃষ্ণার একটি উপনদী। ভীমা (পুরাণের সহ্য নদী) দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে রায়চুরের কাছে কৃষ্ণার সঙ্গে মিলেছে। পালার নালগোণ্ডার পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মিশেছে। মুনার কৃষ্ণার ওপরদিককার সবচেয়ে পূর্বের একটি উপনদী। অমরাবতীতে এটি কৃষ্ণার সঙ্গে মিশেছে। কৃষ্ণার নীচের দিককার উপনদীগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে তুঙ্গভদ্রা। মহীশূরের পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় তুঙ্গ ও ভদ্রা উৎপন্ন হয়ে একসঙ্গে তুঙ্গভদ্রা নাম নিয়েছে। অনন্ত পুরের উত্তরে পশ্চিমঘাট থেকে উৎপন্ন বরোদা তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে মিশেছে। কোলেরুন তিরুচিরাপল্লী থেকে বেরিয়ে সাগরে পড়েছে। উত্তর পেনার উত্তরে তারপর অনন্তপুর জেলার পামিডি পর্যন্ত উত্তর পূর্বে বয়ে গিয়ে দক্ষিণ পূর্বে বাঁক নেয়। তারপর করোমণ্ডল উপকূলের অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলায় বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সেন্ট ডেভিড দুর্গ এলাকায় দক্ষিণ পেনার সাগরে পড়েছে। এর নিম্নভাগের নাম পোন্নাইয়ার।

কাবেরী জোট

দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত নদী কুর্গের কাছে পশ্চিমঘাট থেকে উৎপন্ন হয়ে মহীশূরের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে তামিলনাড়ুর তাঞ্জোরে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এর মোহনায় একটি বিশাল 'ব' দ্বীপ রয়েছে। বামদিকে দশটি এবং ডানদিকে আটটি উপনদী এর সঙ্গে মিশেছে। প্রাচীনকালে কাবেরী মুক্তা চাষের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রাচীন চোল রাজ্যের রাজধানীর দক্ষিণ অংশ দিয়ে প্রবাহিত হোত। প্রাচীন রাজধানী উরগপুরা কাবেরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। কাবেরী মহীশূরের শ্রীরঙ্গপত্তনম, শিব সমুদ্রম এবং তিরুচিরাপল্লী অদূরে শ্রীরঙ্গমের কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই স্থানগুলি সবই পবিত্র বলে কথিত।

দাক্ষিণাত্যের আরও চারটি নদী উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হচ্ছে কীর্তিমালা (কূর্মপুরাণের ঋতুমালা এবং বরাহপুরাণের শতমালা), তাম্রপর্ণী (ব্রহ্মপুরাণের তাম্রবর্ণ) পুষ্পজা এবং সুতপলাবতী (উৎপলাবতী)। পাণ্ডকপাট এবং তাম্রপর্ণী মুক্তা চাষের জন্য বিখ্যাত।

তাম্রপর্ণী একদা নিশ্চয় পাণ্ড্যরাজ্যের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হোত। বর্তমানে এটি তাম্রভরী বা তাম্রভরী ও চিত্তরের যুগল ধারা। টলেমির বক্তব্য অনুযায়ী কোরকাই বন্দর এই নদীর মুখে অবস্থিত ছিল। কীর্তিমালা (বর্তমান ভোইগাই) যা পাণ্ড্য রাজধানী মধুরা (অধুনা মাদুরা) নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। মাদুরা জেলার প্রধান নদী ভাইগাই মাদুরা শহরের ভেতর দিয়ে যায়। বর্তমান মানচিত্রে দেখা যায়, মলয় পর্বতমালার আটটি নদী পূর্বে, এগারটি পশ্চিমে প্রবাহিত হয়।

হ্রদ

এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ বা আমেরিকার মতো বিশাল বিশাল হ্রদ এখানে না থাকলেও—ছোটখাট অবশ্যই রয়েছে। এদের কোনটা কোনটা প্রাকৃতিক অবতল জায়গা যেখানে আশপাশের জল এসে জমা হয়। কোনটা বা কৃত্রিম—বাঁধ তৈরির সময় সৃষ্টি হয়েছে এবং এরিয়ানের ভাষায়, কোনটা কোনটা নদীর বিস্তৃতির কারণে ঘটেছে। তাঁর মতে সিন্ধু ও গঙ্গা কোথাও বিস্তৃত হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করেছে। কুনালের নামে মধ্যদেশে একটি হ্রদ ছিল। কিন্তু সেটিকে এখনও চিহ্নিত করা যায় নি। বৈশালীতে মর্কট নামে একটি হ্রদ ছিল—যা বুদ্ধ দেখেছিলেন। উত্তরাপথে অনতত্তা নামে একটি হ্রদে বুদ্ধ অনেকবার গেছেন, মনেহয় এটি রাবণ হ্রদ বা লঙ্গ হ্রদ। এটি হিমালয়ের বিখ্যাত সাতটি হ্রদের একটি। মহাবংশের বিবরণ অনুযায়ী অনতত্তা হ্রদের জল রাজ্যাভিষেকের সময় ব্যবহৃত হোত।

আধুনিক ভারতের সুন্দর হ্রদগুলি কাশ্মীরে অবস্থিত। যেমন উলার, ডাল, মানসবল। উলার হ্রদের আয়তন ১২$\frac{১}{২}$ বর্গমাইল। প্রাচীন নাম মহাপদ্মসর। উলার নামটি সম্ভবত সংস্কৃত উল্লোলা—(ভীষণার) অপভ্রংশ। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কাছাকাছি ডাল হ্রদ অবস্থিত। ডালের সৌন্দর্য অনুপম। মোগল সম্রাটেরা ডালের তীর বাগান দিয়ে সাজিয়েছিলেন। এই হ্রদে দুটি ছোট দ্বীপ রয়েছে। অন্যান্য হ্রদের মধ্যে শ্রীনগরের কাছে অনচর, কোসা নাগ, নন্দন সর, নীল নাগ, সরবল নাগ এবং ক্যুং বিখ্যাত।

গাড়েয়ালে কয়েকটি হ্রদ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঘোনা। পাঞ্জাবের সিন্দের লবণ পর্বত শ্রেণির মধ্যে কোলার-কাহার হ্রদ। সিন্দের লারকোনা জেলার মনচর হ্রদ, পশ্চিম নরনদীর বিস্তৃতির জন্য এবং অন্যান্য অনেক পাহাড়ী নদীর জলধারায় পুষ্ট হয়ে সৃষ্ট হয়েছে।

রাজস্থানে অনেক লবণাক্ত হ্রদ ছড়িয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য—সম্ভর, দিদওয়ানা ও পুষ্কর। জয়পুরের সীমানায় যোধপুর ও পুষ্কর অতি পবিত্র হ্রদ। রাজস্থানে কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদও রয়েছে। দেবার বা রাজসমন্দ, উদয়পুরের পিচোলা, কিষেনগঙ্গের গুনদোলাও এবং ঢোল পুরের মচকুন্দ। উত্তর প্রদেশে কিছু প্রাকৃতিক এবং প্রাকৃতিক অবতল জায়গায় উৎপন্ন হ্রদ রয়েছে। নৈনিতালে সাগরতাল একটি সুন্দর হ্রদ। ঝাঁসি জেলায় তালবাহাত একটি কৃত্রিম হ্রদ। বালিয়া শহরের চারমাইল উত্তরে একটি কাস্তের আকারের হ্রদ পাওয়া যায়। উত্তর প্রদেশের বস্তিজেলায় কয়েকটি হ্রদ রয়েছে। বাখিরাতাল একটি মিষ্টি জলের

হ্রদ। গোরখপুরে রয়েছে নন্দুর, রানগড়, নরহর, চিলেরা এবং বেওরিতাল। বিহারে চম্পারণ জেলায় রয়েছে, লালসর্ব, সেরহা এবং তাতারিয়া। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে রামক্রি, রাজসাহী ও পাবনার সীমানায় চলন বিল—ফরিদপুরের ঢোল সমুদ্র। পাকারিয়া, পোটা, নওগং জেলার কলং, গোয়ালপাড়ার সারস এবং মণিপুরের লগটাক উল্লেখযোগ্য।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে রয়েছে নল, করমবাই, কোরেগাঁও, পানগাঁও, ভাতোদি।

ভূপালে রয়েছে পুখতা-পুল তালাও, ও বড়া তালাও। মাহোবায় রয়েছে কৃত্রিম হ্রদ কিরাত সাগর এবং রহিল্যা সাগর, মাইহারেও একটি হ্রদ রয়েছে।

পূর্ব-উপকূলে রয়েছে চিল্কা। তামিলনাড়ুতে মিষ্টি জলের হ্রদ কোলেয়ার (কোলেরু বা কোলার)। অন্ধ্রে রয়েছে হুসেন সাগর, পাখাল। কোচিনের কাছে রয়েছে এনামাকাল ও মানাকোদিদ হ্রদ। এ দুটিই মিষ্টিজলের হ্রদ।

অরণ্য

প্রাচীনকালে সারা ভারতেই ছিল বনভূমি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যদেশে একটি প্রাকৃতিক বনভূমি ছিল (স্বয়ংজাত)। কুরুরাজ্যে কুরুজাঙ্গাল ছিল এমনি এক বনভূমি। এটি উত্তরে প্রসারিত হয়ে কাম্যক বনের সঙ্গে মিশেছিল। উত্তর পাঞ্চাল রাজ্য এই বনভূমি নিয়েই গঠিত ছিল। সাকেতের অজ্ঞানবন, বৈশালীর মহাবন হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে কৌশাম্বীর কাছে ছিল পারিল্লেখ্যকবন। এটি হস্তি অধ্যুসিত ছিল। রোহিণী নদীর তীরে প্রাকৃতিক লুম্বিনী বন। বজ্জিসংঘে নাগবন, কুশীনারায় শালঝা, ভাগ রাজ্যে ভেসকড়াবন, কৌশাম্বীর শিংশপাবন, মৌর্যদের পিপ্পলীবন—সবই প্রাকৃতিক বন। বিন্ধ্যপর্বত ঘিরে ছিল ঝিনঝাটবী, এরই ভেতর দিয়ে ছিল পাটলিপুত্র আর তাম্রলিপ্তি যাবার পথ। দ্বীপবংশে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৎস রাজ্যে পারিলেয়ক নামে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে একটি বনভূমি ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছিলেন, প্রয়াগ থেকে শ্রাবস্তী যাবার পথ একটি বনভূমির মধ্য দিয়ে গেছে।

দেবীপুরাণ অনুযায়ী কয়েকটি পবিত্র বনভূমি ছিল। যেমন সিন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষা, কুরুজাঙ্গাল. উৎপলারণ্য (বা উপলাবৃত অরণ্য) জম্বু মার্গ, পুষ্কর এবং হিমালয়। পারজিটারে মতে, দণ্ডকারণ্য বুন্দেলখণ্ড থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত সমস্ত বনভূমি নিয়ে গঠিত। রামায়ণ অনুযায়ী (উত্তর কাণ্ডে) এটি বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এর একটি অংশকে বলা হোত জনস্থান। কেউ কেউ মনে করেন, এই বনভূমি ছিল নাগপুর সমেত মহারাষ্ট্রে। ললিতবিস্তারে দণ্ডকবনের উল্লেখ রয়েছে।

নৈমিষীরাণ্য ছিল এক পবিত্র বনভূমি। সেখানে ষাট হাজার ঋষি বসবাস করতেন। অনেক পুরাণই এখানে লেখা হয়েছে। এটি বর্তমানে নিমসার বলে কথিত। সীতাপুর থেকে ২০ মাইল এবং লক্ষ্ণৌ-এর ৪৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে হিন্দুদের এক পবিত্রস্থান। বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসে। রামায়ণ অনুযায়ী এটি গোমতীর বামতীরে অবস্থিত। কুরুজাঙ্গাল একটি বনরাজ্য—হস্তিনাপুরের উত্তরে পশ্চিমে সিরহিন্দে অবস্থিত ছিল। সমস্ত

কুরুরাজ্যকেই এই নামে ডাকা হোত। মহাভারতের মতে উপলারণ্য পাঞ্চালে অবস্থিত ছিল। এটিকে উৎপলবনও বলা হোত। এখানেই লবকুশের জন্ম হয়। কেউ কেউ স্থানটিকে বর্তমান বিঠুর বলে চিহ্নিত করেন।—কানপুর থেকে ১৪ মাইল দূরে যেখানে বাল্মিকীর আশ্রম ছিল। অগ্নিপুরাণেব মতে জম্বুমার্গ পুষ্কর ও আবুপাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। আজমীর থেকে স্থানটি ছ'মাইল দূরে। মহাভারতের সময় কিছু ম্লেচ্ছ উপজাতি এখানে এবং হিমালয় অঞ্চলে বাস করত।

হিমালয়ের বনভূমি জীবজন্তু অধ্যুসিত ছিল। বলা হয়, সেখানে দলে দলে হাতি, সাপ, অজগর, পাখি ইত্যাদি বাস করে। পাহাড়ের গর্ত তাদের আবাস স্থল ছিল। কলিঙ্গারণ্য দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী নদী এবং উত্তরপশ্চিমে ইন্দ্রবতী নদীর শাখা গাওলিওর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু র‍্যাপসনের মতে এটি মহানদী এবং গোদাবরীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

ষোড়শ মহাজনপদ

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ষোলটি মহারাজ্য নিয়ে। পালির সুত্তপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় জম্বুদ্বীপের এই ষোলটি মহারাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি হচ্ছে, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেটিত, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মাছ, শূরসেন, অস্সক, অবন্তী, গান্ধার এবং কাম্বোজ। প্রতিটি জাতির নাম অনুসারে রাজ্যগুলির নাম। এই রাজ্যগুলির মধ্যে চোদ্দটি ছিল মধ্যদেশে এবং গান্ধার ও কাম্বোজ ছিল উত্তরাপথে। দীর্ঘনিকায় কেবলমাত্র ১২টির নাম উল্লেখ করেছে এবং শেষ চারটি নাম বাদ দিয়েছে। আবার চুল্লনিদ্দেশ কলিঙ্গকে যোগ করে—গান্ধারের পরিবর্তে রেখেছে যোন। ইন্দ্রিয় (জাতকে) যে কয়েকটি নাম পাওয়া তা হচ্ছে, সুরঠ্ঠ (সুরাট), লম্বকুড়ক, অবন্তী, দক্ষিণাপথ, দণ্ডকারণ্য, কুম্ভবতী নগর এবং অরঞ্জর পার্বত্যভূমি। এগুলি সবই মধ্যদেশে।

অন্যদিকে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলে, মধ্যদেশে ছিল—মৎস্য, কুশল, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কোশল, অর্বুদ, পুলিন্দ, সমক, বৃক, গোবর্দ্ধনপুর ইত্যাদি রাজ্যগুলি ছিল। অবন্তীকে অপরান্তের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

জৈন ভাগবতী সূত্র সামান্য হেরফের করে একটি তালিকা দেয়। সেগুলি হচ্ছে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মলয়, মালব, অচ্ছ, বচ্ছ (বংশ), কোচ্ছ, পাড়, লাঢ়—(রাঢ়) বজ্জি, মোলি (মল্ল), কাশী, কোশল, অবহ (অবাহ) ও শম্ভুত্তর। মনে হয় জৈন তালিকাটি বৌদ্ধ তালিকার পরবর্তী সময়ের।

মহাবস্তুতে ষোড়শ জনপদের কথা বলা হলেও কোনও তালিকা নেই—যেমন নেই ললিত বিস্তারে। তবে মহাবস্তুকে সাবধানে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে ১৬টি জনপদের উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের জ্ঞান দানকালে বলছেন, ষোড়শ মহাজনপদ হচ্ছে : অঙ্গ, মগধ, বজ্জি, মল্ল, কাশী, কোশল, চেদী, বৎস, মৎস্য, শূরসেন, কুরু, পাঞ্চাল, শিবি, দশার্ন, অস্মক এবং অবন্তী। পালি তালিকার সঙ্গে এর ঠিক মিল নেই। এই তালিকায় গান্ধার ও কাম্বোজকে বাদ দিয়ে শিবি ও দশার্নকে ঢোকান হয়েছে।

বিভিন্ন জনপদের উপজাতিদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে কিছু কথা মহাভারতের কর্ণপর্বে বলা হয়েছে। উপজাতিদের নামানুসারে জনপদগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন কৌরব, পাঞ্চাল, শল্ব, মৎস্য, নৈমিশাস, চেদি, শূরসেন, মগধ, কোশল, অঙ্গ, গন্ধর্ব এবং মদ্রক।

অঙ্গ : অঙ্গের রাজধানী চম্পা—চম্পা নদীর (অধুনা চান্দন) তীরে অবস্থিত ছিল। বিদেহর রাজধানী মিথিলা থেকে গঙ্গা ছিল ৬০ যোজন দূরে। চম্পার প্রাচীন নাম—মালিনী বা মালিন, মহা গোবিন্দ এটি নির্মাণ করেছিলেন। ভাগলপুরের কাছে অধুনা চম্পা নগরী এবং চম্পাপুরী নামে দুটি গ্রামের স্থানে ছিল এই নগরী। চম্পা ক্রমে ঐশ্বর্য শালী হয়ে ওঠে। বণিকেরা এখান থেকে নৌকোয় বা জাহাজে পাল তুলে সুবর্ণভূমি (নিম্ন মায়নামার) পাড়ি দিত। এটি ভারতের দুটি বৃহৎ নগরের অন্যতম ছিল। আনন্দ বুদ্ধকে দুটি বৃহৎ নগরের মধ্যে যে কোনও একটিতে পরিনির্বাণ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। চম্পার নগর প্রাকার, রক্ষীস্তম্ভ এবং তোরণ ছিল। অঙ্গ রাজ্যে ৮০,০০০ গ্রাম ছিল, তার মধ্যে চম্পা একটি। ভারতের সাতটি রাজনৈতিক বিভাগের মধ্যে অঙ্গ ছিল অন্যতম এবং চম্পা ছিল তার রাজধানী। চম্পা একদা অশোকের পুত্র মহেন্দ্র শাসন করত। এখানেই বুদ্ধ শ্রমণদের পাদুকা ব্যবহার করার অনুমতি দেন। মহাভারত অনুযায়ী অঙ্গ সম্ভবত ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা নিয়ে গঠিত ছিল এবং উত্তরে কোশী নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। একসময় অঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং তা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা অঙ্গের নামানুসারে অঙ্গের নামকরণ করা হয়েছিল—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত অঙ্গ বৈরচনী হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। রামায়ণের হিসাবে কামদেবের অঙ্গ অর্থাৎ দেহ এখানে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য এদেশের নাম অঙ্গ।

মাহী নদীর উত্তরে অঙ্গুত্তরাপ রাজ্যের একটি নগর 'আপন'। অঙ্গুত্তরাপ প্রকৃতপক্ষে নদীর উপর তীরে অঙ্গেরই একটি অংশ। ভদদীয় থেকে আপন যাবার পথ এই অঙ্গুত্তরাপের ভেতর দিয়েই ছিল।

বুদ্ধপূর্বে অঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। একদা মগধও অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। অঙ্গ আর মগধের মধ্যে একটি নদী ছিল। এই স্থানটি জনৈক নাগরাজার অধিকারে ছিল। ঐ নাগরাজা যুদ্ধে অঙ্গের রাজাকে হত্যা করে অঙ্গকে মগধের অন্তর্ভূক্ত করতে সহায়তা করেছিলেন। ব্রহ্মবধ্বনের (বারাণসী) রাজা মনোজ মগধ ও অঙ্গ অধিকার করেছিলেন। বুদ্ধের সময় অঙ্গ চিরকালের জন্য তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায়। এই যুগে অঙ্গ আর মগধের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলত। মগধের রাজা শ্রেণীয় বিম্বিসার অঙ্গ অধিকার করেন। চম্পার রানী গগ্গরা গগ্গরাপোখরণী নামে একটি জলাশয় খনন করান। চম্পায় অবস্থান করার সময় বুদ্ধ তাঁর অজস্র শিষ্য নিয়ে ঐ পুষ্করিণীর তীরে বসবাস করেন। অঙ্গ এবং চম্পার বুদ্ধের কর্মকান্ডের বিবরণ বিনয় পিঠকে পাওয়া যায়। অঙ্গের এক নগর অস্সপুরায় অবস্থান কালে বুদ্ধ শ্রমণদের মহা এবং চুলখ অশ্বপুর সুত্তন্ত শিক্ষা দেন। রাজগৃহ থেকে কপিলাবস্তুতে গমন কালে বহু গৃহীদের সন্তান তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন, হিমালয়ের সাধুরা রান্না করা খাবারের জন্যে একবার অঙ্গের কালচম্পায় এসেছিলেন। অগ্গিদত্ত (অগ্নিদত্ত)—প্রসেনদির (প্রসেনজিৎ) পিতা রাজা

মহাকোশলের পুরোহিত গৃহীজীবন ত্যাগ করে অঙ্গ আর মগধে বসবাস করতেন। এই দুই রাজ্যের অধিবাসীদের দানেই তাঁর চলত।

অঙ্গ এক ঐশ্বর্যশালী দেশ ছিল। বহু বণিক সেখানে বসবাস করত। তারা দলবেঁধে প্রচুর পণ্য নিয়ে সিন্ধু-সৌবীর দেশে বাণিজ্য করতে যেত। পাটলীপুত্রের রাজা বিম্বিসার শুভদ্রাঙ্গী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। ললিতবিস্তারে বলা হয়েছে, অঙ্গের একটি লিপি ছিল যা বোধিসত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন।

মগধ : মগধ অধুনা পাটনা এবং গয়া জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। বেদে, ব্রাহ্মণে এবং সূত্র লেখার যুগে বলা হয়েছে যে মগধ ব্রাহ্মণিক সংস্কৃতির বাইরে ছিল। তাই ব্রাহ্মণ লেখক মগধ সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মগধ চিরকাল মধ্যদেশে বৌদ্ধদের এক পবিত্রভূমি হিসাবে পরিচিত ছিল।

বারদ্রথপুরা, গিরিব্রজ বা রাজগৃহ ছিল মগধের প্রাচীন রাজধানী। বসুমতী মাগধপুরা, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি, চৈত্যক, বিম্বিসারপুরী এবং কুসুমপুরী নামেও পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদ বর্ণিত কিকট রাজ্য ছিল মগধই।

মগধেরও একটি নিজস্ব বর্ণমালা ছিল—যা বুদ্ধ জানতেন। গিরিবজ্জ (গিরিব্রজ) পাঁচটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল, যেমন, ইসিগিলি, বেপুল্লা (বণক্ক এবং সুপন), বেভার, পাণ্ডব এবং গৃহ্যকূট। রাজা বিম্বিসারের কালে মগধে ৮০,০০০ গ্রাম ছিল এবং নদী তাপোদা প্রাচীন নগরীর পাশ দিয়ে বইত। মগধের একটি সুন্দর গ্রামের নাম ছিল সেনানিগ্রাম। একনালাতে ব্রাহ্মণেরা বসবাস করত—বুদ্ধ এদের ধর্মান্তরীত করেন। পালকগ্রামে সারিপুত্রের সঙ্গে জম্মুখাদক নামে এক পরিব্রাজকের বিতর্ক হয়। ব্রাহ্মণ গ্রাম খানুমাতা, সিদ্ধান্ত গ্রাম নামে আরও কয়েকটি গ্রামের নাম জানা যায়।

বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল মগধ। সারিপুত্ত এবং মোদগ্গল্যায়নকে বুদ্ধ এখানে ধর্মান্তরীত করেন। অশোকের প্রায় সবই ধর্মপ্রচারক ছিল মগধের অধিবাসী। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধ বৈশালী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, রাজা গঙ্গার তীর পর্যন্ত এক মসৃণ রাস্তা প্রস্তুত করেছিলেন।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে রাজগৃহ একবার অগ্নিদগ্ধ হয়। বিম্বিসার নতুন রাজগৃহ নির্মাণ করেন। হিউয়েন সাঙ এবং ফা হিয়েনের বৃত্তান্ততে এই কথা জানা যায়। কিন্তু ফা-হিয়েন বলেন—বিম্বিসার নয়, অজাতশত্রু এই নতুন রাজগৃহ নির্মাণ করেন।

প্রথম বৌদ্ধ ধর্মসভা রাজগৃহতেই অনুষ্ঠিত হয়। রাজগৃহের ৬৪টি তোরণ দ্বার ছিল। সন্ধ্যায় তা বন্ধ হোত এবং প্রভাতে খুলত। একটি দুর্গও ছিল। বেলুবন (বেণুবন) ও কালান্দক নিবাপ রাজগৃহের এই দুটি বুদ্ধের বাসস্থান ছিল, নারদগ্রাম, কুক্কুটরামা বিহার, গৃহ্যকূট পাহাড়, হস্তিবন, উরুবিল্ব গ্রাম, প্রভাশবন, কোলিত গ্রাম রাজগৃহের ভেতর-বাইরের এই সব স্থান বুদ্ধস্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

অশোকের সময় পাটলিপুত্র ছিল মগধ রাজধানী। নগরের চারটি তোরণ দ্বার থেকে তাঁর প্রতিদিন আয় হোত চার লক্ষ 'কাহাপন'।

বুদ্ধযুগের প্রথম দিকে মগধ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র। উত্তর ভারতের সব জায়গা থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে লোক এসে এখানে

জমা হোত।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসে জীবক বিম্বিসারের রাজচিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি বিম্বিসার কর্তৃক প্রেরিত হয়ে অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতের 'জন্ডিস' নিরাময় করেন।

গঙ্গা ছিল মগধ আর গণরাজ্য লিচ্ছবীর সীমারেখা। গঙ্গার ওপর দুটিরাজ্যেরই সম অধিকার ছিল। চম্পা নদী মগধ আর অঙ্গের সীমারেখা সূচিত করত। মগধ আর লিচ্ছবীরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। একবার কাশীর রাজা মগধ অধিকার করেন। অঙ্গও একবার মগধ অধিকার করে। একবার কোশলের রাজা পসেন্দি (প্রসেনজিৎ) ও অজাতশত্রু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। লিচ্ছবীদের সাহায্য নিয়ে অজাতশত্রু বিজয়ী হন। শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুও একসময়ে বজ্জিগণরাজ্য অধিকার করেন। অজাতশত্রু থেকে শুরু করে অশোকের কলিঙ্গ বিজয় পর্যন্ত সময়ে মগধ রাজনৈতিক শক্তির শিখরে উঠেছিল। সেই সময়কার উত্তর ভারতের ইতিহাসের অর্থ ছিল মগধের ইতিহাস।

কাশী : ষোড়শ মহাজনপদের একটি ছিল কাশী। রাজধানী বারাণসী। সুরুধন, সুদর্শন, ব্রহ্মবর্ধন, পুষ্পবতী, রম্যা এবং মলিনী নামেও পরিচিত ছিল কাশী। যোজন ব্যাপি ছিল এই রাজ্য। বরণার তীরে ছিল এই রাজ্য। নগরী ছিল ঐশ্বর্যময়ী, উন্নতিশীল এবং জনবহুল। অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ টিকায় বলা হয়েছে, এরা এক উপজাতি। পতঞ্জলী তাঁর মহাভাষ্যে কাশীর বস্ত্রের কথা বলেছেন। রামায়ণ অনুযায়ী কাশী একটি নগর নয়, রাজ্য। বায়ু পুরাণ অনুযায়ী কাশী রাজ্য গোমতী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বুদ্ধপূর্বে কাশী প্রচণ্ড রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কখনও কাশী—কোশল অধিকার করে—কখনও কোশল—কাশী। কিন্তু বুদ্ধের সময় কাশী তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিছু সময়ের জন্য এটি কোশল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল আবার কিছু সময়ের জন্য মগধের। কাশীর অধিকার নিয়ে প্রসেনজিৎ আর অজাতশত্রুর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাশী মগধেরই অন্তর্ভূক্ত হয়। বারাণসী বুদ্ধের পদধূলিতে অমর হয়ে আছে। এখানে সারনাথে তিনি প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। বুদ্ধ জীবনের অনেক সময় কাশীরাজ্যে অতিবাহিত করেন এবং প্রচুর মানুষকে ধর্মান্তরীত করেন।

বারাণসী শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। বণিকেরা জাহাজ ভর্তি পণ্য নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিত। বারাণসীর সঙ্গে শ্রাবস্তী এবং তক্ষশিলারও বাণিজ্য সংযোগ ছিল। বারাণসী থেকে ছাত্ররা তক্ষশিলা শ্বিবিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যেত।

কোশল : বুদ্ধ যুগের প্রথম দিকে কোশল একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। প্রাচীন কোশল দুভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল—মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হোত সরযূ নদী, কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ অনেক কাল অতিবাহিত করেছিলেন। থালা গ্রামের বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে তিনি তাঁর ধর্মে নিয়ে আসেন। নগরবিন্দ এবং বেনাগপুরা গ্রামের ব্রাহ্মণেরাও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হন।

পার্শ্ববর্তী রাজগুলির সঙ্গে কোশলের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। যেমন এক কোশল রাজপুত্র কাশীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। মহাকোশল বিম্বিসারের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেন। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যা বাজিরাকে বিবাহ করেন, কপিলাবস্তু

কোশলের সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়।

কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী আর সাকেত। সম্ভবত শ্রাবস্তী প্রথমদিকের রাজধানী। সাকেত পরবর্তী সময়ে। বুদ্ধের সময় অযোধ্যা একটি উন্নতিশীল শহর হলেও—ভারতের দুটি প্রধান শহরের মধ্যে ছিল শ্রাবস্তী ও সাকেত। অনেকের ধারণা অযোধ্যা ও সাকেত একই নগর। কিন্তু রিজ ডেভিস বলেন যে এরা দু'টি পৃথক নগরই ছিল। সাকেত শ্রাবস্তী ছাড়াও সেতব্য, উক্কঠ্ঠ ইত্যাদি ছোট ছোট নগরও ছিল। শ্রাবস্তীতেই বুদ্ধ মহিলাদের সঙ্ঘে যোগদান করার অনুমতি দেন। প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডক এবং বিশাখা-মিগারমাতা নামে প্রশস্ত হৃদয়ের মহিলা শ্রাবস্তীরই অধিবাসী ছিলেন। অনাথ পিণ্ডক জেতবন বুদ্ধসঙ্ঘকে দান করেন। বুদ্ধ কিছুদিন ওখানে বসবাস করেছিলেন।

বজ্জি : আটটি গোষ্ঠি নিয়ে বজ্জি সংঘ গঠিত হয়েছিল, এদের মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি এবং বজ্জিরা বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত অন্যেরা ছিল জ্ঞাত্রিক, উগ্র, ভোজ, ঐকশ্ব। অষ্টম গোষ্ঠীর নাম জানা যায় না। পাণিণির অষ্টাধ্যয়ীতে বজ্জিদের উল্লেখ রয়েছে। বৈশালী শুধুমাত্র লিচ্ছবিদের রাজধানী ছিল না নয়, সমস্ত মিত্র গোষ্ঠীরই নগর ছিল। এর তিনটি জেলা ছিল। মজফরপুরের বেসারাকে বৈশালী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বুদ্ধের সময় এই নগরে কিছু দূরত্ব অন্তর তিনটি প্রাকার ছিল। তোরণ এবং বড় অট্টালিকাও ছিল। বুদ্ধ একবার নিমন্ত্রিত হয়ে বৈশালীতে গিয়েছিলেন। নগরটি আনন্দময়, ধনবান, উন্নতিশীল এবং জনবহুল ছিল।

একটি পথ ছিল বৈশালী থেকে রাজগৃহে যাবার এবং আর একটি বৈশালীর থেকে কপিলাবস্তু যাবার জন্যে। বুদ্ধের বসবাস কালে অনেক শাক্য মহিলা দীক্ষা নেবার জন্য বৈশালীতে এসেছিল। বৈশালীর বৌদ্ধ মহাধর্মসভা বৌদ্ধ ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশালীর লিচ্ছবীরা বৌদ্ধ সংঘকে অনেক চৈত্য-বিহার দান করেছিল। বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপ শুধুমাত্র মগধ আর কোশলে সীমাবদ্ধ ছিল না—বৈশালীতেও ছিল। বুদ্ধ তাঁর উপদেশ হয় আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে আর নয়ত মহাবন বিহারের কূটাগারশালায় বসে দিতেন।

বজ্জিরা অষ্টকুল মিলে একটি গণের প্রতিষ্ঠা করেছিল। বুদ্ধ বলেছিলেন যতদিন লিচ্ছবীরা, কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, জেদি এবং কর্মঠ থাকবে—ততদিন তারা উন্নতি করবে। কিন্তু আয়াসী এবং অশিষ্ট হয়ে উঠলেই তারা মগধের অজাতশত্রুর পদানত হবে।

মগধের সঙ্গে বৈশালীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অজাতশত্রুকে বৈদেহী পুত্র বলা হোত। এর অর্থ বিম্বিসার কোনও লিচ্ছবি রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গেও তাঁদের সুসম্পর্ক ছিল। মগধের রাজা অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের শক্তি খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হন। গঙ্গার তীরে একটি বন্দরের কর্তৃত্ব উভয়ের হাতেই ছিল। সেই বন্দরের কাছাকাছি একটি খনির অধিকার দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। লিচ্ছবিদের সরাসরি খর্ব করা অসম্ভব জেনে অজাতশত্রু মন্ত্রী সুনীত আর বর্ষকারকে বিভেদের বীজ বপন করার জন্যে বৈশালীতে গোপনে প্রেরণ করেন। বর্ষকার লিচ্ছবিদের একতায় ভাঙন ধরাতে সফল হন। অজাতশত্রু বৈশালী অধিকার করেন।

মল্ল : মল্লরাজ্য দুভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের রাজধানী কুশিনারা, অন্যভাগের

রাজধানীর নাম পাবা। গোরখপুর জেলার পূর্বদিকে ছোট গণ্ডকের তীরে কাশিয়া গ্রামটি কুশীনারা বলে চিহ্নিত হয়েছে। পাবা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে কুশী নগরের ১২ মাইল উত্তরপূর্বে পদরাওনা গ্রামটি। শালকুঞ্জ—বুদ্ধ যেখানে নির্বাণ লাভ করেন, সেই স্থানটি হিরণ্যবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান গণ্ডক ঐ নদীটি হিসাবে চিহ্নিত। মল্লে যখন রাজতন্ত্র ছিল তখন রাজধানীর নাম ছিল কুশাবতী। কিন্তু গণরাজ্য হওয়াতে পরিবর্তিত নাম হয় কুশীনারা। মহাপরিনির্বাণ সূত্তাতে কুশীনারা একটি ছোট নগর বলে কথিত আছে। কুশীনারার অতীত গৌরব উল্লেখ করে বুদ্ধ তাঁর মহানির্বাণের জন্য ঐ স্থানটিই বেছে নেন। তিনিই বলেছেন, কুশীনারা অতীতের কুশাবতী।

লিচ্ছবীদের সঙ্গে মল্লদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও মাঝে মধ্যেই লড়াই ঝগড়া হোত। বহু মল্ল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

চেদি : প্রাচীন চেদি রাজ্য যমুনার কাছে ছিল। বুন্দেলখণ্ড এবং তার আশপাশের জায়গা চেদি হিসাবে চিহ্নিত। রাজধানী ছিল সোত্থিভাতি নগর। সম্ভবত তা মহাভারতের শুক্তিমতী নগরী। চেদির অন্য দুটি নগর হচ্ছে সহজাতি এবং ত্রিপুরী। কাশী থেকে চেদি যাবার পথ বিপদসংকুল ছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল। অনুরুদ্ধ চেদিদের মধ্যে বসবাস কালে অর্হৎ হয়ে যান। বুদ্ধ চেদিতে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে গিয়েছিলেন।

বংশ : বংশ বা বৎসের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। স্থানটি এলাহাবাদের কাছে কোশম বলে চিহ্নিত। বৎসদের উৎস কাশীর এক রাজা। জটিল সম্প্রদায়ের বাবরী সশিষ্য বৎসে এসেছিলেন। কৌশাম্বীর ঘোষিতারামা বিহারে পিন্ডোরা ভরদ্বাজ বাস করতেন। তিনি কৌশাম্বীর রাজপুরোহিতের পুত্র। বুদ্ধ ঘোষিতারামায় তাঁর ধর্মব্যাখ্যা করেন।

কুরু : গঙ্গার তীরে পূর্বদিকের একটি রাজ্য ছিল কুরু। প্রাচীন সাহিত্যে উত্তর কুরু এবং দক্ষিণ কুরুর নাম পাওয়া যায়। কাম্মাসধম্ম নগরে বুদ্ধ একবার কুরুদের কাছে তাঁর ধর্মব্যাখ্যা করেন। মঝিঝম নিকায়তে বর্ণিত রথ্থপাল একজন সংভ্রান্ত বংশীয় কুরু ছিলেন। কুরু রাজ্যের উৎস হিসাবে বলা যায় মান্ধাতা নামে এক রাজা পূর্ব বিদেহ, অপরগোযান এবং উত্তর কুরু জয় করে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিল ঐ দেশের অজস্র অধিবাসী। মান্ধাতা জম্মুদ্বীপের যেখানে বসবাস করা শুরু করলেন—সেটি কুরুরাষ্ট বলে পরিচিত হল। বুদ্ধের ভাষণ শুনে বহু কুরু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

বলা যেতে পারে প্রাচীন কুরু রাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বর নিয়ে গঠিত। সোনাপত, কার্নাল, এবং পানিপথ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এর উত্তরে সরস্বতী এবং দক্ষিণে দৃষদ্বতী। কুরুরাষ্ট্রের আয়তন ৩০০ লিগ ছিল এবং রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের আয়তন ছিল ৭ লিগ।

বোধিসত্ত্ববদান-কল্পলতায় বলা হয়েছে, রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর।

পাঞ্চাল : পাঞ্চাল রাজ্য দুভাগে বিভক্ত—উত্তর ও দক্ষিণ পাঞ্চাল। মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভাগিরথী। শতপথ ব্রাহ্মণে পাঞ্চালকে বলা হয়েছে কৃভি। দিব্যাবদান অনুসারে উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী হস্তিনাপুর। কিন্তু কুম্ভকার জাতকে বলা হয়েছে, কাম্পিল্য নগর। মহাভারত অনুযায়ী উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিছত্র—বর্তমান বেরিলী জেলার রামনগর—এবং দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য (ফারুকাবাদ জেলার কামপিল)

কখনও কখনও উত্তর পাঞ্চাল কুরাষ্ট্রের অধীনে ছিল। তখন রাজধানী হোত হস্তিনাপুর। অন্যসময় এটি কাম্পিল্যরাষ্ট্রের অংশ ছিল।

শুরুতে পাঞ্চালরাজ্য দিল্লীর উত্তর এবং পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি এটি এখনকার আধুনিক বদায়ুন, ফারুকাবাদ এবং আশপাশের অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

মৎস্য : বর্তমান জয়পুর নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন মৎস্য রাজ্য। বর্তমান আলোয়ারের এবং ভরতপুরের কিছুটা অংশও এর মধ্যে ছিল। ঋগ্বেদ অনুযায়ী মৎস্য রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে এবং শূরসেনের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। বিরাট নগর বা বৈরাট ছিল রাজধানী। উপ্লবব্য নামে আর একটি নগর ছিল যেখান থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধমন্ত্রণা শুরু করে পান্ডবেরা।

শূরসেন : যমুনার তীরে মথুরা শূরসেনের রাজধানী ছিল। বর্তমান মথুরার ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মাহোলীকে মথুরা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক লেখকরা একে উল্লেখ করেছেন শূরসেনই বলে—রাজধানী মেথোরা। বহু শতাব্দী ধরে মথুরায় বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ছিল। মহাকাচ্চায়ন জাতপাত সম্পর্কে মথুরায় কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ মথুরা থেকে বারাণসী যাবার পথে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নিলে বহু শূরসেনবাসী তাঁকে পূজা নিবেদন করে।

রামচন্দ্রের ভাই শত্রুঘ্ন মথুরা নির্মাণ করে। শত্রুঘ্নের এক ছেলের নাম শূরসেন। তারই নামে রাজ্য। মথুরা তথা যাদবদের ধ্বংস করার জন্য কংসের অত্যাচার এবং কৃষ্ণ কর্তৃক কংসের নিহত হবার কাহিনী পতঞ্জলীর লেখায় এবং ঘট জাতকেও রয়েছে।

মেগাস্থিনিস যখন শূরসেন সম্পর্কে লেখেন তখন শূরসেন নিশ্চয় মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। কুষাণ প্রতিপত্তির যুগে মথুরা আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বহু মূর্তি এখানে খনন করে পাওয়া গেছে।

অস্মক (অস্সক) : অস্মকের রাজধানী ছিল পোটানা বা পোটালি। মহাভারতের পাউদন্যই হচ্ছে পোটালি। দক্ষিণাপথে আরও একটি অস্মক দেশের কথা জানা যায় সুত্তনিপাত গ্রন্থে। অস্মক্‌রাজ্যে গোদাবরীর তীরে বাস করত ব্রাহ্মণ বাভরী। স্থানটি অলকা বা মুলকার খুব কাছাকাছি। কলিঙ্গের দন্তপুরার রাজা এবং পোটালীর রাজার মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁরা বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মহাকাচ্চায়ন এক অস্মক রাজাকে দীক্ষিত করেন। রাজা খারবেলের হস্তিগুম্ফার একটি শিলালিপিতে আমরা জানতে পারি যে তিনি অস্মকদের ভীতি উৎপাদনের জন্যে পশ্চিমে এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। চুল্লকলিঙ্গ জাতকের অস্মক এবং হস্তিগুম্ফার ঐসিকানগর সম্ভবত সুত্তনিপাতের অস্মকই। স্থানটি গোদাবরীর তীরে চিহ্নিত হয়েছে। অস্সক হচ্ছে সংস্কৃত 'অস্মক' বা 'অশ্মক'—যা অসঙ্গ তাঁর সূত্রালংকারে সিন্ধু মোহনার একটি দেশ বলে উল্লেখ করেছেন।

তাই অসঙ্গের অস্মকের সঙ্গে গ্রিকদের অস্সকেনুর মিল পাওয়া যায়—যা কিনা সরস্বতীর পূর্বে সমুদ্র থেকে ২৫ মাইল দূরে সোয়াত উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। মার্কেন্ডয় পুরাণের মতে অস্মক উত্তর পশ্চিমের একটি রাজ্য। প্রাচীন পালি গ্রন্থসমূহে অস্মককে

সবসময়ে অবন্তীর সঙ্গে জড়িত বলে দেখা হয়েছে, কৌটিল্যের ভাষ্যকার ভট্টস্বামী মহারাষ্ট্রকে অস্মক বলে চিহ্নিত করেছেন। যাইহোক, হয় মহারাষ্ট্র আর না হয় গোদাবরীর তীরে অবস্থিত ছিল অস্মক। মূল কথা, দেশটি মধ্যদেশের বাইরে ছিল।

অবন্তী : ষোড়শ মহা জনপদের অন্যতম অবন্তী। (অচ্যুটগামী কর্তৃক নির্মিত) রাজধানী উজ্জয়িনী। অবন্তী মোটামুটি আধুনিক মালওয়া, নির্মার এবং আশপাশের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ভান্ডারকারের মতে প্রাচীন অবন্তী দুভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরের রাজধানী উজ্জয়িনী, এবং অবন্তী দক্ষিণের রাজধানী মাহিষ্যতি। দীর্ঘনিকায়ের মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত বলে, অবন্তীর রাজা বেশ্যভূর রাজধানী ছিল মাহিষ্যতি। অর্থাৎ অবন্তী দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে অবন্তী আর মাহিষ্যতি দুটি আলাদা রাজ্য।

অবন্তী বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। অনেক থের এবং থেরী ওখানে বসবাস করতেন। চন্দ্রপ্রদ্যোতের রাজপুরোহিত মহাকাচ্চায়ন উজ্জয়িনীতে জন্মান। তিনিই রাজাকে ধর্মান্তরীত করেন। ইশিদত্তও তাঁর দীক্ষিত শ্রমণ।

বুদ্ধের সময় ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর মগধ, প্রসেনজিতের কোশল, প্রদ্যোতের অবন্তী, উদয়নের কৌশাম্বী। এই রাজ্যগুলি ষষ্ঠ ও পঞ্চম খ্রিঃ পূর্বে ভারতীয় রাজনীতিতে বহু নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছিল। প্রত্যেকের মধ্যে ছিল ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। একে অন্যকে অধিকার করতে চাইতেন। প্রদ্যোত উদয়নকে জয় করতে চেয়েছিলেন। পরিশেষে কন্যা বাসবদত্তাকে উদয়নের হাতে তুলে দেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধই অবন্তীর হাত থেকে কৌশাম্বীকে রক্ষা করে। মগধের সঙ্গেও উদয়ন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবন্তী আর মগধের মধ্যে প্রাচীর হিসাবে কাজ করার জন্যে এই দুটি বৈবাহিক সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল।

গান্ধার : ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম গান্ধার। গান্ধাররা এক প্রাচীন জাতি। তাদের রাজধানী তক্ষশিলা। মোদগলিপুত্ত তিস্য থের মঝ্ঝনটিককে গান্ধার-কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমান পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি এবং উত্তর পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত ছিল গান্ধার।

কাশ্মীর-গান্ধারের সঙ্গে বিদেহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন গান্ধার রাজ পুক্কুসাতি। জানা যায়, তিনি মগধে একটি পত্র এবং এক রাজকীয় দল পাঠিয়েছিলেন সৌভ্রাত্বের জন্য। তিনি যুদ্ধে অবন্তীর চন্ডপ্রদ্যোতকে পরাজিত করেন।

দরায়ুসের বেহিস্তুন শিলালিপিতে (৫১৬ খ্রিঃ পূ:) বলা হয়েছে যে গদর বা গান্ধার পারসীক সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খ্রিঃ পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্কেমেনিয় রাজারা গান্ধার জয় করে। অশোকের সময় গান্ধার মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতে গান্ধারের উল্লেখ রয়েছে।

কাম্বোজ : উত্তম অশ্বের জন্য কাম্বোজ প্রসিদ্ধ ছিল। কাম্বোজ প্রাচীন রাজওরি বা প্রাচীন রাজপুরার চতুর্দিকের অঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের হাজারা জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। থের মহারক্ষিত কাম্বোজ এবং আশপাশ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সঠিকভাবে জানা যায় না দ্বারকা কাম্বোজের রাজধানী ছিল কিনা। প্রথম এবং

পরবর্তী পালি সাহিত্যে কাম্বোজের রাজধানীর নাম পাওয়া যায় না। তবে নিশ্চিতভাবে কাম্বোজ উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল এবং গান্ধারের কাছেই। লুডারের তালিকা নং ১৭৬ এবং ৪৭২-এ নন্দীপুরা নামে কাম্বোজের একটি নগরের নাম পাওয়া যায়।

সম্ভবত কাম্বোজরা তাদের আদি আর্য রীতিনীতি-প্রথা ভুলে গিয়ে বর্বর হয়ে গিয়েছিল। ভূরিদত্ত জাতকে আমরা জানতে পারি, অ-আর্য কাম্বোজরা বলত, পোকামাকড়, মাছি, সাপ, মৌমাছি, ব্যাঙ ইত্যাদি হত্যা করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। যক্ষের নিরুক্ত এবং হিউয়েন সাঙের রাজাপুরার বিবরণে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উত্তর ভারত

আবাস্তনোই : এটি সংস্কৃত 'অম্বুষ্ঠস' শব্দের গ্রিকরূপ। এই অম্বুষ্ঠরাই দিওডোরাসের সমবস্তাই, কার্টিয়াসেব সাবারকে এবং ওবোসিয়াসের সাবারেগ্রে। আলেকজান্ডারের সময় নিম্ন আকেসিন (অসিক্‌নি) ছিল তাদের রাজ্য। এদের একটি গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। এরা আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে।

অচিরাবতী : (জৈন আভী বা আদি)। এই নদীটি অজিরাবতী বা ঐরাবতী নামেও পরিচিত ছিল। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং এ-চি-লো এর নাম জানতেন, দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হয়ে শ্রাবস্তী অতিক্রম করে যেত। আই-সিং এর মতে অজিরাবতী মানে অজির (ড্রাগন) নদী। জৈন সাহিত্যে এটিকে ইরাভাই বলা হয়েছে। অধুনা অযোধ্যাব রাপ্তি নদী বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এব পশ্চিম তীরে ছিল প্রাচীন নগরী শ্রাবস্তী—কোশলেব তৃতীয় অথবা শেষ রাজধানী। যদি রাপ্তির দক্ষিণতীরে সাহেত-মাহেত আধুনিক শ্রাবস্তীর অবস্থান হয় তবে রাপ্তিই সেই প্রাচীন অচিরাবতী। দশকুমারচরিতের লেখক বলছেন, শ্রাবস্তী একটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মনে হয় নদীটির নাম অচিরাবতী।

হিমালয়ের পর্বতশ্রেণি থেকে উৎপন্ন হয়ে অচিরাবতী সরযূর একটি উপনদী। বৌদ্ধ মধ্যদেশে অচিরাবতী একটি পবিত্র নদী। অচিরাবতীর তীরে বুদ্ধ কোশলের ব্রাহ্মণ গ্রাম মনসাকটের এক আম্রকুঞ্জে বাস করেছিলেন। নদীর তীরে একটি ডুমুব গাছেরও বাগান ছিল। শ্রাবস্তীর একটি ছোট্ট নদী সুতনুতে বুদ্ধশিষ্য অনুরুদ্ধ পড়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, সারিপুত্ত এই নদীতে স্নান করেছিলেন। প্রসেনজিতের রাজপ্রাসাদ থেকে অচিরাবতী দেখা যেত। পাঁচশ বালক অচিরাবতীর তীরে কুস্তি লড়ত। মাঝে মধ্যে এই নদীতে ভীষণ বন্যা হোত। প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিকের আঠারো কোটি টাকার মালপত্র অচিরাবতীর বন্যায় ভেসে গিয়েছিল।

অদ্রাইস্টি দেশ : এটি হাইড্রেওটেস (রাভি) নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। পিম্রপ্রামা ছিল তাদের শক্ত ঘাঁটি। মহাভারতের দ্রোণ পর্বে বর্ণিত অদ্রিজরাই গ্রিক কথিত অদ্রেইসটেই। বলা হয়ে থাকে যে অদ্রেইসটেইরা আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে।

অগুরু : এই কুরুরাজ্যের চন্দ্রকান্ত-সূর্যকান্ত পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি বনের নাম।

অগ্রোহা : হিসার থেকে ১৪ মাইল দূরে হিসার-ফতেবাদ পাকা রাস্তায় অবস্থিত ছিল। সম্ভবত এটি টলেমির অগরা। এইস্থানে খনন করে মুদ্রা, পুঁতি, ভাস্কর্যের টুকরো, পোড়ামাটির জিনিসপত্র পাওয়া গেছে

অহিছত্র : এটি উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী। ভাগিরথী নদী পাঞ্চালকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করেছে।

পাঞ্চাল দিল্লির উত্তর, পশ্চিম এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্য ফারুকাবাদের আধুনিক কাম্পিল। পোড়োসা গুহালেখ এবং রাজা বহাসতিমিত্রের মুদ্রা রামনগরে পাওয়া গেছে। ঐ গুহালেখ থেকে আমরা জানতে পারি, অহিছত্রের রাজা ছিল সাউনাকায়নি। এলাহাবাদের সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলেখতে অচ্যুত নামে একজন শক্তিশালী রাজার নাম উল্লেখ রয়েছে। রামনগরে (অহিছত্র) রাজা অচ্যুতের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙের সময়তেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য নগর। রাজ্যটিতে শস্য, কাঠ উদ্‌পাদন করা হত। অনেক ঝরণা এবং আবহাওয়া সুন্দর ছিল। দশটির বেশি বৌদ্ধ বিহার ও নটি মন্দির ছিল।

নামটি অহিক্ষেত্র এবং অহিছত্র (সাপের ফণারূপী ছাতা) এই নামেই লেখা হয়। প্রাচীন নাম অধিছত্র (লুডারের ব্রাহ্মীলেখের তালিকা)। যা গ্রিক আদিসমা (টলেমির) কাছাকাছি। এটিকে ছত্রাবতীও বলা হত। খ্রিস্টাব্দ শুরু হবার মুখে আসন্ধসেনার পভোসা গুহালেখতে অধিছত্র নামটি পাওয়া যায়। অর্জুন দ্রুপদকে পরাজিত করে দ্রোণের হাতে অহিছত্র ও কাম্পিল্য তুলে দেয়। দ্রোণ দ্রুপদকে কাম্পিল্য নগর ফিরিয়ে দেন। বিবিধ তীর্থকল্প অনুসারে অহিছত্রের পূর্বনাম ছিল সংখ্যাবতী। পার্শ্বনাথ এই নগর পরিভ্রমণ করে গেছেন। কথিত আছে—এক প্রবল বর্ষণে পার্শ্বনাথ আকণ্ঠ ডুবে গেলে নাগরাজা তাঁর সহস্র ফণা বিস্তার করে পার্শ্বনাথকে রক্ষা করেন। সেই থেকে স্থানটির নাম অহিছত্র।

আধুনিককালে ক্যাপ্টেন হগসন সর্বপ্রথম অহিছত্রে পদার্পণ করেন। তিনি দেখেন পাণ্ডুর দুর্গ বলে কথিত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

ঐরাবতী (অচিরাবতী) : এটিকে অনেকে রাভি নদী (এরিয়ানের হাইড্রোওটেস) বলে চিহ্নিত করেন। কাম্বিস্থলী (কাপিসস্থলা) রাজ্য থেকে এটি প্রবাহিত হয়েছে। এরিয়ান ও ডিয়োডোরোসের মতে এটি একেসাইনস (চেনাব) সঙ্গে মেশে। কারটিয়াস এবং প্লিনি বলতেন হাইপাসিস। স্ট্রাবো বলতেন হাইপানিস। অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা বলতেন, বিপাসিম (বিপাশা)।

অজয়গড় : এটি উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলা।

অজুধান : এই প্রাচীন নগর শতদ্রুর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানের নদী থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দেপালপুরার ২৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

অক্ষস্থলী : জৈন নিশিথচূর্ণী অনুযায়ী এটি মথুরা।

অলকানন্দা : হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের একটি নদী। এটি গঙ্গার উপরাংশের পথ। মন্দাকিনী এর একটি উপনদী।

অলসন্দা : যবন রাজ্যের এটি একটি মুখ্য নগর। গেইগার এটিকে কাবুলের কাছে আলেকজান্ডার প্রতিষ্ঠিত অ্যালেকজান্দ্রিয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। এর উল্লেখ রয়েছে মিলিন্দপ্রশ্নহোতে একে একটি দ্বীপ বলা হয়েছে যেখানে রাজা মিলিন্দ জন্মেছিলেন।

অমরনাথ : ইসলামাবাদের প্রায় ষাট মাইল দূরে হিমালয়ের ভৈরবঘাটি পর্বতশ্রেণির এক গুহায় একটি শিব মন্দির। হিন্দুদের কাছে পবিত্র। এখানে প্রতিবছর প্রাকৃতিকভাবে একটি বরফের শিবলিঙ্গ গড়ে ওঠে।

অম্বষ্ঠ দেশ : চন্দ্রভাগার নিম্ন ভাগে এই দেশ। মহাভারত এবং ভাগবত পুরাণে

এর উল্লেখ রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, বায়ু এবং বিষ্ণুপুরাণেও এর উল্লেখ রয়েছে। পাণিনী ও তাঁর একটি সূক্তে এর উল্লেখ করেছেন। ঐতেরিয় পুরাণের যুগে সম্ভবত তারা পাঞ্চালে বসবাস করা শুরু করে। মহাভারতে এদের উত্তর পশ্চিমের উপজাতি বলা হয়েছে। তাদের শিবি ও যৌধেয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং এরা পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে বসবাসকারী। পরবর্তীকালে সম্ভবত এরা স্থান ত্যাগ করে মেকল পাহাড়ের কাছে চলে এসেছিল। এই মেকল পাহাড় নর্মদার উৎস।

অন্ধবন : এটি শ্রাবস্তীতে অবস্থিত ছিল। থের অনুরুদ্ধ এখানে বনবাস কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অঙ্গদপুর : কালিদাস পরোক্ষ ভাবে রঘুবংশে এই স্থানটির কথা উল্লেখ করেছেন।

অঞ্জন পর্বত (অঞ্জন গিরি) : এটি মহাবনে অবস্থিত ছিল। মার্কেণ্ডেয় পুরাণ ও রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এটির উল্লেখ রয়েছে। জৈন আবশ্যকচূর্ণীতেও এর উল্লেখ রয়েছে। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে এটি স্বর্ণ নির্মিত। এটি পাঞ্জাবের সুলেইমান পর্বতশ্রেণি। প্রাচীন ভূগোলবিদেরা একে অঞ্জনগিরি বলতেন। এটি বালুচিস্থান থেকে উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবকে আলাদা করেছে। তখত-ই-সুলেমান (সোলোমানের সিংহাসন) এর উচ্চতম শৃঙ্গ (১১২৬৫ ফুট) এই পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ অংশ বেলে পাথরের। এর উত্তর অংশ চুণাপাথরে নির্মিত। অনেক গিরিপথ এই পর্বতশ্রেণিকে বিভক্ত করেছে। এদের মধ্যে দিয়েই ভারত থেকে বালুচিস্তানে যাবার পথ ছিল।

অঞ্জন বন : সাকেতের এক মৃগ বন। বুদ্ধ এখানে বাস করতেন।

অনোম : মনে হয় পর্বতটি হিমালয়ের কাছাকাছি ছিল।

অনোমা : এটি গোরখপুর জেলার আউমি নদী। কার্লাইল বস্তি জেলার কুদওয়া নদী বলে এটিকে চিহ্নিত করেন। বুদ্ধ কপিলাবস্তু ত্যাগ করে এই নদীর তীরে আসেন। তারপর সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন।

অনতত্ত : এই হ্রদটি রাবণ হ্রদ বা লঙ্গ হ্রদ বলে চিহ্নিত। বুদ্ধ অনেকবার এখানে এসেছিলেন।

অংশুমতী : কুরুক্ষেত্রের একটি নদী বলে ঋগ্বেদে কথিত।

অন্তরভেদী : ইন্দোরের স্কন্দগুপ্তের (৪৬৬ খ্রিঃ) তাম্রলেখে জানা যায়, দেশটি গঙ্গা-যমুনা এবং প্রয়াগ-হরিদ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে। এখানকার ইন্দ্রপুরের এক সূর্য মন্দিরে দেববিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণের দানে সব সময়ের জন্য একটি প্রদীপ জ্বলত। বুলন্দশহর জেলা এই অন্তরর্ভেদীতে ছিল।

অনুপিয়া আম্রবন : এটি মল্ল রাজ্যে ছিল। এখানে গৌতম গৃহত্যাগের পর রাজগৃহের পথে যাবার আগে প্রথম সাত দিন অতিবাহিত করেন।

অপর 'বশিষ্ঠ আশ্রম' : হিমালয়ের কাছে এর অবস্থান ছিল। আশ্রম পুড়িয়ে দেবার জন্য তাপস বশিষ্ঠ এখানে কার্তবীর্যার্জুনকে অভিশাপ দেন।

আরেইল : এই প্রাচীন গ্রামটি গঙ্গা-যমুনার সংগম স্থলে যমুনার ডান তীরে অবস্থিত ছিল।

অরিষ্ঠপুর (অরিষ্টপুর) : পাণিনীর একটি সূক্তে এর নাম পাওয়া যায়। এটি শিবি

রাজ্যের রাজধানী। রাজা তক্ষশিলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। পিতার জীবদ্দশায় তিনি প্রদেশপাল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। রাজা খুব ন্যায়বান ছিলেন, ভিক্ষা দেবার জন্য নগরের মধ্যস্থলে তিনি ছ'টি প্রশস্ত ঘর নির্মাণ করেন। প্রতিদিন তিনি ছ'লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। পাঞ্জাবের শোরকোট অঞ্চলকে শিবি রাজ্য বলেন চিহ্নিত করা যায়। প্রাচীন গ্রিক লেখকরা পাঞ্জাবে শিবোই নামে একটি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন।

অরুণাচল : কৈলাস পর্বত শ্রেণির পশ্চিমে রয়েছে পাহাড়টি।

অসিত-অঞ্জন-নগর : এটি উঃপ্রঃ-এর প্রাচীন কংসা জেলা যেখানে রাজা মহাকংস রাজত্ব করতেন।

অসনি : উঃ প্রদেশের ফতেপুরের ১০ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম যেখানে একটি শিলাস্তম্ভলিপি আবিষ্কার হয়েছে।

অশোক : মনে হয় পাহাড়টি হিমালয় থেকে দূরবর্তী ছিল না।

আসপাসিয়ান অঞ্চল : আলেকজান্ডারের সময় এটি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইরানী শব্দ অসপ হচ্ছে সংস্কৃতের অশ্ব বা অশ্মক। এই আসপাসিয়ানরা সম্ভবত অশ্বক বা অশ্মকদের কোনও পশ্চিমী শাখা। এদের দেশ ছিল পূর্ব আফগানিস্তান। কেউ কেউ বলেন এটি ছিল সুবাস্তুতে (আধুনিক সোয়াত উপত্যকা)। অশ্মকরাই প্রথম ভারতীয় যারা আলেকজান্ডারের আক্রমণেরর মুখোমুখি হয়। আসপাসিয়ানদের একটি নগর সম্ভবত ইউআনপ্লা নদীর তীবে বা কাছাকাছি ছিল। কাবুলের একটি উপনদী কুনারই ইউআনপ্লা নদী।

অষ্টাপদ : এটি একটি বড় জৈন তীর্থ। সম্ভবত এটি কৈলাস পর্বত। বিবিধ তীর্থকল্প অনুসারে এখানে অনেক সন্ন্যাসী এবং ঋষভের পুত্রেরা মুক্ত হতে এসেছিল।

অষ্টাবক্র আশ্রম : হরিদ্বারের ৪ মাইল দূরে আশ্রমটি ছিল। অনেকে বলেন।

আওদুমবর : অনেকের মতে এটি গাড়োয়ালের শ্রীনগরের কাছে পাউরিতে অবস্থিত ছিল। পাণিনী অষ্টাধ্যয়ীতে এর উল্লেখ করেছেন। পাঠানকোট অঞ্চলে সম্ভবত রাজ্যটি ছিল।

অভিমুক্তা : বারাণসীর একটি প্রখ্যাত পবিত্র স্থান।

অযোধ্যা : এটি হিন্দুদের সাতটি পবিত্রতম স্থানের একটি। অযোঝ্যা বা অয়ুধা নামেও এটি পরিচিত। এটি ইক্ষ্বাকুদের রাজধানী ছিল। এটি রাম এবং সাগরদের রাজ্য। কোশলনগর বলেও এটি পরিচিত ছিল। বিনিতা নগরটির আরও একটি নাম। এটি প্রথম এবং চতুর্থ তীর্থঙ্করের জন্মস্থান। ফা-হিয়েন এটিকে বলেছেন শাব এবং টলেমি *বলেছেন সোগেডা। ব্রাহ্মণিক সাহিত্যে এটিকে একটি গ্রাম বলা হয়েছে। নগরটিকে সাকেত* রামাপুরী এবং কোথাও ইক্ষ্বাকু ভূমিও বলা হয়। ভাগবত পুরাণ এটিকে একটি নগর বলেছে। স্কন্দপুরাণ বলেছে, অযোধ্যাকে মাছের মতো দেখতে। এটি সরযূ থেকে দক্ষিণে *ও পূর্বে এক যোজন এবং পশ্চিমেও এক যোজন। উত্তরের তমসা থেকেও এক যোজন* বিস্তৃত।

রেল স্টেশন থেকে ছ মাইল দূরে। ঐ লেখতে বলা হয়েছে অযোধ্যা সমুদ্র গুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের একটি জয়স্কারার বা বিজয় শিবির। বুদ্ধের সময় এটি একটি গুরুত্বহীন নগর ছিল। রামায়ণে বলা হয়েছে, এটি কোশলের রাজধানী ছিল। এটি ঋষভ, অজিত, অভিনন্দন, সুমতি, অনন্ত এবং অচলাভানুর জন্মস্থান। এখানে প্রভু আদিগুরু সিদ্ধি লাভ করেন। চালুক্যরাজ কুমারপাল এখানে একটি জৈন দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আজও নাভিরাজ বলে মন্দিরটি রয়েছে। বুদ্ধের সময় দক্ষিণ কোশলের রাজধানী ছিল অযোধ্যা।

অযোধ্যা পুষ্যমিত্রের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে পাওয়া একটি লেখতে বলা হয়েছে পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন অযোধ্যা ভ্রমণকালে দেখেছিলেন যে এখানকার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্প্রীতি নেই। তিনি একটি স্তূপ দেখেছিলেন যেখানে চারজন বুদ্ধ হাঁটাচলা করতেন এবং বসতেন। সপ্তম শতাব্দীর এক চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ বলেছেন, অযোধ্য ছিল অসঙ্গ আর বসুবন্ধুর সাময়িক বাসস্থান। তিনি বলেছেন, অযোধ্যাই সাকেত। দেশটি শস্যশ্যামলা এবং সমৃদ্ধ ছিল। সেখানে প্রায় একশ বৌদ্ধবিহার এবং তিনহাজার পড়ুয়া ছিল যারা হিনযান-মহাযান সম্পর্কে শিক্ষা নিত। দশটি দেবমন্দির ছিল—অবৌদ্ধের সংখ্যা খুবই কম ছিল। রাজধানীর ভেতর পুরোন বিহারে বসুবন্ধু অনেক শাস্ত্র রচনা করেন। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সভাগৃহ ছিল যেখানে বসুবন্ধু বিদেশ থেকে আগত রাজপুত্র ও সন্ন্যাসীদের ধর্ম ব্যাখ্যা করতেন। গঙ্গার কাছে অশোকের স্তূপ সম্বলিত একটি বড় বিহার ছিল যেখানে বুদ্ধ অনেক ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঐ বিহার থেকে কিছু দূরে বুদ্ধের একটি স্মৃতি স্তূপ ছিল এবং এরও উত্তরে এক বিহারের ধ্বংসস্তূপ ছিল যেখানে সৌত্রান-টিকা-বিভাসাশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। নগরের ৫৬ লি দক্ষিণে এক আম্রকুঞ্জে একটি বিহার ছিল যেখানে অসঙ্গ শিক্ষা নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ সংঘ পরিচালন বিষয়ে তিনটি নীতি বিষয়ক গ্রন্থের কথা মৈত্রেয় এখানে অসঙ্গকে জানান। আম্রকুঞ্জের সামান্য দূরে উত্তর পশ্চিমে একটি বুদ্ধ স্মৃতিস্তূপ ছিল। অসঙ্গ তাঁর ধর্মীয় জীবন শুরু করেন একজন মহাশাসকের রূপে। পরে মহাযানের প্রবক্তা হন। বসুবন্ধু তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন সর্বাস্তিবাদের এক শিক্ষালয়ে। অসঙ্গের মৃত্যুর পর, বসুবন্ধু যিনি মহাযান সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ৮৩ বছর বয়সে অযোধ্যায় মারা যান।

রামায়ণের মতে অযোধ্যা একটি সমৃদ্ধ মনোরম নগর ছিল। মহাভারতে একে পূজ্য লক্ষণযুক্ত নগর বলা হয়েছে। রামায়ণের মতে অযোধ্যায় চর্তুবর্ণ প্রচলিত ছিল।

অযোধ্যা হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নগর। অযোধ্যায় অনেক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এখানকার ইক্ষবাকু রাজারা বশিষ্ঠের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত *ছিলেন। বশিষ্ঠ ছিলেন পুরুষানুক্রমে তাঁদের* রাজপুরোহিত। অযোধ্যা এক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হতে শুরু করে যুবনাশ্ব দ্বিতীয় এবং তাঁর পুত্র মান্ধাতৃর সময় থেকে। ক্রমে অযোধ্যার ক্ষমতা কমে আসে এবং কান্যকুব্জের উত্থান ঘটে। হৈহয়েরা অযোধ্যাকে পরাজিত করে এবং বিদেশী উপজাতিরা সেখানে বসবাস করা শুরু করে। অযোধ্যা আবার ভগীরথ এবং অম্বরীশ নাগাভির সময়ে ক্ষমতার সামনের সারিতে চলে আসে।

অযোধ্যার রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কথাসরিৎ সাগরে রাজা নন্দের অযোধ্যায় সৈন্যাবাসের কথা বলা হয়েছে। যোগিনীতন্ত্রেও এই নগরের কথা উল্লেখ রয়েছে।

অয়োমুখ : কানিংহামের মতে স্থানটি প্রতাপগড়ের ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল।

আদিত্য তীর্থ : এটি সরস্বতী নদীর তীরে ছিল।

আলাভি : কানিংহাম স্থানটি উঃ পঃ উন্নাও জেলার নেওয়াল বা নাওয়াল বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ আবার এটোয়ার ২৭ মাইল উত্তর পূর্বে অবিওয়াকে চিহ্নিত করেছেন। আলাভি নগরের কাছে অগগালভ বলে একটি মন্দির ছিল। বুদ্ধ সেখানে একবার বসবাস করেছিলেন। অনেক নারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর একবার আলাভিতে এসেছিলেন।

আমলকপ্পা : মহাবীর একবার এখানে এসেছিলেন। স্থানটি বেথদীপের অদূরে অল্লাকপ্পা বলে চিহ্নিত।

আপয়া : ঋগ্বেদ বর্ণিত নদীটি সরস্বতী আর দৃষদ্বতীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হত। কেউ কেউ বলেন এটি চিতং নদীর একটি শাখা, মহাভারতেও এই নদীটির কথা আছে। এটি কুরুক্ষেত্রের অন্যতম পবিত্র নদী। কেউ কেউ বলেন, এটি গঙ্গারই একটি নাম।

আরজিকা : এটি হয় কাশ্মীরে না হয় কাশ্মীরের কাছে একটি রাজ্য।

আত্রেয়ী : দিনাজপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আত্রাই। এটি তিস্তার একটি শাখা নদী।

বভ্রুতীর্থ : মাহী নদীর মোহনায় স্থানটি অবস্থিত।

বদরী : বরাহ পুরাণ বলে এটি হিমালয়ের একটি নির্জন স্থানে অবস্থিত। এখানে দুটি পবিত্র স্থান হয়েছে—ইন্দ্রলোক ও পঞ্চশিখা। পদ্মপুরাণে বদরীতে সারস্বত তীর্থের কথা বলা হয়েছে।

বদরীকারামা : মহারাজা বৈশ্রবণের কানাম লেখতে বলা হয়েছে, কৌশাম্বীর আশপাশে ছিল এই বৌদ্ধ বিশ্রামাগার—বুদ্ধ একবার এখানে বাস করেছিলেন। এখানে অর্হৎ রাহুল সন্ন্যাসীজীবনের নিয়ম কানুন প্রস্তুত করেছিলেন। খেমকা বলে আরও একজন প্রবীণ এখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে নিকটবর্তী ঘোষিতরামা বিহার থেকে দাশক বলে একজনকে খোঁজ খবর নেবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল।

বদরিকাশ্রম : শ্রীনগরের ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে পাইন খণ্ডের পারগণা মহল্লার একটি গ্রাম এবং আধুনিক বদ্রীনাথ। মহাভারতে এর কথা উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে বদরীকা তীর্থ। যোগিনীতন্ত্রেও এই তীর্থের উল্লেখ করা হয়েছে। বাণের কাদম্বরীতে বলা হয়েছে অর্জুন এবং কৃষ্ণ এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে স্থানটি দর্শন করলে এক পাপী পাপমুক্ত হতে পারে। বছরে যখন ছ'মাস বরফাবৃত থাকে তখন এখানে কোনও পূজা হয় না। এই তীর্থ গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত ছিল। এখানে রাজা মুচুকন্দ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মিত্র ও বরুণও এখানে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। আনন্দ ভট্টের বল্লালচরিতে বলা হয়েছে। এটি গারওয়ালের কাছে গঙ্গার তীরে দেবদারু বনে যা দারুবনে অবস্থিত ছিল।

বদ্রীনাথ : এটি গারওয়ালে। এটি প্রধান হিমালয় পর্বতশ্রেণির একটি শিখর। শ্রীনগর

থেকে ৫৫ মাইল উত্তর পূর্বে। অলকনন্দার উৎসের কাছে পশ্চিম তীরে নরনারায়ণের মন্দিরটি তৈরি করা হয়। বলা হয়, অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

বাল্হীক : অথর্ববেদ অনুযায়ী এটি একটি উপজাতির নাম। এরা উত্তরের এক উপজাতি।

বলখ (Fo-ho) : কুন্দুজের বেশি পশ্চিমে বা উত্তর পশ্চিমে নয় স্থানটি। এখানে বৌদ্ধ হীনযানের ১০০টি বৌদ্ধবিহার ও ৩০০ জন শ্রমণ ছিলেন। রাজধানীর বাইরে দক্ষিণ পশ্চিমে এক নতুন বিহার হিন্দুকুশের উত্তরে একমাত্র বৌদ্ধ সংস্থা ছিল। প্রাজ্ঞকার নামে হীনযানের অভিধর্মের একজন পণ্ডিত এখানে বাস করতেন।

বামিয়ান : বলখের প্রায় অর্ধেক আয়তনের একটি নগর একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এখানে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল এবং শ্রমণেরা বাস করত। পাহাড়ের গায়ে খচিত সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি দর্শনীয় ছিল। আধুনিক আফগানিস্থানের তালিবান আমলে মূর্তিগুলি ধ্বংস করা হয়েছে।

বাঁশখেরা : সাহাজাহান পুরের ২৫ মাইল দূরে এই স্থানটিতে হর্ষবর্দ্ধনের একটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে।

বর্বরিক (টলেমির বারবারেই) : এটি নিঃসন্দেহে বারবারিকাম বা বারবারিকন বাজার যা পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সীতে বলা হয়েছে। সিন্ধুর মোহনার মুখে এটি একটি বাজার শহর এবং বন্দর। এটি সিন্ধুর মোহনার 'ব' দ্বীপের একটি নগর। বর্বরদের এই দেশ সম্ভবত আরব সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। মহাভারতে শক এবং যোনদের বর্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ এদের সিন্ধু প্রদেশের একটি দেশ বলে উল্লেখ করেছে। বৃহৎ সংহিতা এদের উত্তর বা উত্তর পশ্চিমের এক উপজাতি বলে বর্ণনা করেছে।

বসহী : এটোয়া তহসিলের কার্যালয় শহর বিন্ধুনা থেকে ২ মাইল উত্তর পূর্বে একটি গ্রাম। এখানে একটি লেখ পাওয়া গেছে—যা শুরু হয়েছে বিষ্ণু বন্দনা দিয়ে। তারপর এটি মহিয়ালা থেকে মদনপাল পর্যন্ত বংশধারার পরিচয় দেয়।

বটেশ্বর : আগ্রা জেলার আগ্রা থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে যমুনার ডান তীরে একটি নগর। এখানে এক প্রাচীন ঢিবির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাহুদা (বাহুকা বা বহুকা) : এই নদীটি হিমালয় থেকে উৎপন্ন। পারজিটার বলেন, এটি রামগঙ্গা যা কনৌজের কাছে গঙ্গার সঙ্গে বাঁ দিক দিয়ে যুক্ত হয়েছে। কেউ বলেন, এটি ধবলা, আধুনিক ধুমেল বা অযোধ্যার রাপ্তির একটি উপনদী বড়া রাপ্তী। দাক্ষিণাত্যে এই নামে আর একটি নদী রয়েছে। এই নদীতে স্নান করে সন্ন্যাসী লিখিতের কাটা হাত জোড়া লেগে যায় বলে কথিত—তাই নাম বাহুদা। মার্কেণ্ডেয় পুরাণ হিমালয়, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গে নদীটি সম্পর্কিত বলে বলেছে। শিবপুরাণ অনুসারে গৌরী তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে বাহুদা নদীতে পরিণত হয়। মঝিঝম নিকায় অনুসারে এটিকে বাহুকাও বলা হয়। বুদ্ধ এই নদীতে স্নান করেছিলেন। এই নদীতে স্নান করলে পাপমুক্তি ঘটে। জাতকে গয়া, দোন এবং টিম্বরুর সঙ্গে এর উল্লেখ রয়েছে যদিও শেষ

দুটিকে চিহ্নিত করা যায় না।

বাহুমতী : নেপালের বৌদ্ধদের এক পবিত্র নদী বাগমতীকে বাহুমতী বলে চিহ্নিত করা যায়। ল্যাসেন এরিয়ানের ককনথিসকে নেপালের বাগমতী বলেই চিহ্নিত করেছেন। বাগমতীকে বাচমতীও বলা হয। বুদ্ধ ক্রাকুছন্দ নেপাল ভ্রমণের সময় নাকি মুখের কথায় এটিকে সৃষ্টি করেছিলেন। বাগমতীর তীরে বৎসলা নগর।

বেলখার : উঃ প্রদেশের মির্জাপুর জেলার চুনারের ১২ মাইল দক্ষিণপূর্বে একটি গ্রাম। বেলখার প্রস্তর স্তম্ভলিপি এই গ্রামে পাওয়া গেছে। একটি স্তম্ভের ওপর এটি খোদাই করা। গণেশের একটি মূর্তিও খোদিত রয়েছে।

ভদদ্‌বটিকা : শ্রাবস্তীর পারিলেখ্য বনভূমির রাস্তায় একটি বাজার শহর। শ্রাবস্তীতে বর্ষাকাল কাটিয়ে বুদ্ধ ভিক্ষায় বেরিয়ে এখানে এসেছিলেন। বাগারের কাছে একটি বাগান ছিল। বুদ্ধ এখানে বাস করেছিলেন। এই শহর থেকে তিনি কৌশাম্বী যান।

ভদ্রশিলা : এটি একটি সমৃদ্ধ উন্নতিশীল নগর ছিল। নগরটি ছিল বৃহৎ এবং চারটি তোরণ দ্বার ছিল। এই নগরে একটি রাজকীয় উদ্যান ছিল। বোধিসত্ত্বদান-কল্পলতা অনুসারে এটি হিমালয়ের উত্তরে। এই নগরটি পরবর্তী সময়ে তক্ষশিলা বলে পরিচিত হয়। এখানে রাজা চন্দ্রপ্রভাকে একজন ভিখারী ব্রাহ্মণ শিরচ্যুত করেছিল।

ভরদ্বাজ আশ্রম : এলাহাবাদে গঙ্গা যমুনার মিলন স্থল প্রয়াগে ছিল ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রম। রাম নিজেই বলেছিলেন যে আশ্রমটি অযোধ্যা থেকে দূরে নয়। অযোধ্যা থেকে মধুপঘ্নে লবণ দৈত্যকে হত্যা করার জন্যে শত্রুঘ্নের যাত্রাপথে অবস্থিত ছিল। স্থানটি আধুনিক মুত্রার ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। দণ্ডকারণ্যে যাবার পথে রামচন্দ্র লক্ষণ ও সীতা এখানে এসেছিলেন এবং হনুমানকে ভরতের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। রামের সন্ধানে ভরতও এখানে ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে এসেছিলেন। রাজা দিবোদাস বীতহব্যসের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এই আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ভর্গ : ভর্গ রাজ্য বৎসের আশ্রিত ছিল। মুখ্য নগর ছিল সংসুমারগিরা। স্থানটি বৈশালী এবং শ্রাবস্তীর মধ্যবর্তী হলেও এটিকে চিহ্নিত করা যায় নি।

ভাস্করক্ষেত্র : নুটিমাদুগু তাম্রপর্ণে এটির উল্লেখ রয়েছে। স্থানটি বেরিলী জেলার হাম্পি। কোন সংগত কারণ না দেখিয়েই এন. এল. দে এটি প্রয়াগ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভেস কলাবন : এটি ভার্গদের সুংসুমারগিরি বা সুংসুমারগিরার পার্শ্ববর্তী। এখানে বুদ্ধ বাস করেছিলেন। এটি কেসকলাবন বলেও পরিচিত ছিল। এটি বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্র এবং প্রথম দিকে এখান থেকেই বৎস দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হোত। এই উদ্যানটি যুবরাজ বোধীর ছিল। তিনি একনিষ্ঠ বৌদ্ধ সমর্থকে রূপান্তরিত হন।

ভিতরগাঁও : এটি কানপুর জেলায়। এখানে একটি বড় মন্দির রয়েছে।

ভিতরী : গাজীপুর জেলার মাজ্জিদপুর তহশিলের ৫ মাইল উত্তর পূর্বে একটি গ্রাম যার নাম স্কন্দগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

ভিটা : মহাবীরের সময় উন্নতিশীল একটি নগরের নাম যা বীরচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি প্রাচীন বিটভায়াপত্তন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিটভায়াপত্তনে রাজা উদয়ন জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। এলাহাবাদের কাছে ভিটার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ১৮৭২

খ্রিঃ জেনারেল কানিংহাম দেখে তা বর্ণনা করে গেছেন।

ভৃগু আশ্রম : মহাভারতে বলা হয়েছে ভৃগু তীর্থ। উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় গঙ্গা-যমুনার সংগমে এই ঋষির আশ্রম ছিল। এখানে পরশুরাম রামচন্দ্র কর্তৃক অপহৃত ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পান। কথিত আছে রাজা ভিতব্য পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভৃগুর কল্যাণে ভিটব্য ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হন।

বিলসাদ ; বিলসাদে প্রাপ্ত কুমারগুপ্তের একটি প্রস্তর স্তম্ভ লেখতে গ্রাম হিসাবে বিলসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব বিলসাদ, পশ্চিম বিলসাদ, এবং বিলসাদের উপকণ্ঠ অঞ্চল। এটি এটায়া জেলার আলিগঞ্জের প্রায় ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

বিঠুর : কানপুরের ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ঋষি বাল্মিকীর আশ্রম ছিল।

ব্রহ্মপুরা : এটি পাঞ্জাবের ছাম্ব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এখানে তিনটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। বড়টি মণিমহেশ—শিবের অবতারের নামে উৎসর্গীকৃত। এটি পাথরের। দ্বিতীয়টিও পাথরের—বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের রূপে। তৃতীয়টি প্রায় কাঠ দিয়েই তৈরি এবং লক্ষ্মণদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। কানিংহামের মতে ব্রহ্মপুর বৈরাট পত্তনেরই একটি নাম। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, ব্রহ্মপুর রাজ্য ৬৬৭ মাইল পরিধি বিশিষ্ট্য। এখানে পাঁচটি বৌদ্ধবিহার ছিল কিন্তু সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। নিশ্চয় এটি অলকনন্দা এবং কার্নালী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল। ব্রহ্মপুর পো লো-লি-সো-পু-লো হিসাবেও পরিচিত ছিল। কানিংহাম বলেছেন এটি গারওয়াল ও কুমায়ুন জেলা জুড়ে ছিল। এইসব জেলায় কাতুর বা কাতুরিয়ার রাজারা রাজত্ব করতেন। এলাহাবাদের সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ করা কোর্তিপুরের সঙ্গে এদের চিহ্নিত করা হয়।

ব্রহ্মবর্ত জনপদ : কালিদাস মেঘদূতে এর উল্লেখ করেছেন। এটি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী একটি দেশ।

বুড়িগণ্ডক : এর উৎস নেপালের হরিহরপুর। চম্পারণ জেলার মতিহারীর উত্তরপূর্বে প্রথম উপনদীটি এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উপনদীটি ছটি ছোটনদীর মিলিত ধারা। মুঙ্গের জেলার গোগরীতে এটি গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

চন্দপহা : এটি কোশাম্বপটেলর একটি গ্রাম। কর্ণদেব এটি পণ্ডিত শান্তি শর্মাকে দান করেছিলেন।

চন্দ্রভাগা : বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হয়েছে এই নদীর তীর ধর্মীয় উৎসর্গের জন্য প্রশস্ত। পালির অপাদানে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মিলিন্দপঞ্হোতে বলা হয়েছে হিমবন্ত (হিমালয় অঞ্চল) থেকে উৎপন্ন। জৈন থামংগতে এর উল্লেখ রয়েছে। চেনাব বা চন্দ্রভাগা কিশওয়ারের ঠিক ওপরে দুটি ছোট্ট নদীর মিলিত ধারা হিসাবে বয়ে যায়। কিশতওয়ার থেকে রিশতওয়ার পর্যন্ত এর দক্ষিণ গতি। জম্মু পার হয়ে এটি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে নিজের ও বিতস্তার (ঝিলাম) মধ্যে একটি দোয়াব অঞ্চল গড়ে তোলে। এটিই ঋগ্বেদ বর্ণিত অসিকনি, এরিয়ানের একেসাইনস এবং টলেমির সন্দবাগা বা সন্দবাল। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের মতে এই নামে দুটি নদী ছিল। মহাভারতও এই মত সমর্থন করে। কিন্তু দ্বিতীয় নদীটি চিহ্নিত করা যায় না। পদ্মপুরাণে এই নদীর নাম পাওয়া যায়।

চন্দ্রাবতী : বারাণসী জেলার গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। এখানে গাহদবালের রাজত্বের দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

চাবল : এই পাহাড়টি হিমালয় থেকে অদূরে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ছাম্ব : এই জেলাটি রাভী নদীর সব উপনদীর উপত্যকাগুলি এবং লাহুল ও কাশতওয়ারের মধ্যবর্তী চেনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর ওপর দিককার উপত্যকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাচীন রাজধানী বর্মপুরা।

ছাতারপুর : কানপুরের ২৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে শেওরাজপুরের কাছে অবস্থিত ছিল। এখানে গোবিন্দ চন্দ্রদেবের একটি তাম্রপত্র উদ্ধার করা হয়েছিল।

চীনা : বীরপুরুষ দত্তের নাগার্জুন কোন্ডার লেখতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি হিমালয়ের চিলাত এবং কিরাত ছাড়িয়ে। পালি শাসনবংশে বলা হয়েছে হিমবন্ত প্রদেশেই চিনাধ্ব। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং বায়ুপুরাণে উত্তরের এই রাজ্য এবং তার অধিবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চীনমরু : চকসু নদীর জলে স্থানটি সিঞ্চিত হয়।

চিত্রকূট (পালি—চিত্তকূট) : পদ্মপুরাণে বর্ণিত পবিত্র স্থানগুলির মধ্যে এই মনোরম পাহাড়টিও স্থান পেয়েছে। জৈন ভাগবতী টিকায় এর উল্লেখ রয়েছে—চিত্তকূড় নামে, কালিদাসের লেখা পড়ে মনে হয় যেন একটি বুনো ষাঁড় যেন একটি পাথর বা ঢিবিকে গুঁতোচ্ছে। ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে স্থানটি ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। উত্তরচরিতে কালিন্দীর তীরবর্তী যে রাস্তা চিত্রকূট পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। এটি অধুনা চিত্রকূট—এলাহাবাদের ৬৫ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে। বর্তমান চিত্রকূট রেল স্টেশনের ৪ মাইল দূরে। এটি প্রয়াগের দক্ষিণ পশ্চিমে। গড়হোয়া শিলালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণ এটিকে পর্বত বলেছে। ললিত বিস্তার বলেছে এটি একটি পাহাড়। জলপ্রপাতের জন্য এটি উল্লেখযোগ্য। বুন্দেলখণ্ডের কাম্পতানাথ গিরিকে চিত্রকূট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সচরাচর এটিকে উঃ প্রদেশের কালিঞ্জরের ২০ মাইল উত্তর-উত্তর-পূর্বে বান্দা জেলার একই নামের একটি পাহাড় বলে মনে করা হয়। মহাভারত এটিকে কালঞ্জরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

রামায়ণ অনুসারে রাম পয়স্বিনী (পয়সুনী) বা মন্দাকিনী নদীর তীরে একটি পাহাড়ে বাস করতেন।

ভরদ্বাজের আশ্রম থেকে ফেরার পথে তিনি যমুনা পার হয়ে এখানে এসেছিলেন। ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে স্থানটি ৩ যোজন দূরে। কালিকা পুরাণে চিত্রকূটের পূর্বে কজ্জল বলে একটি পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে।

চিত্রকূটে দুটি নদী ছিল—মন্দাকিনী ও মালিনী। বলা হয়ে থাকে, মন্দাকিনী এই পাহাড়ের উত্তর দিকে ছিল। চিত্রকূটের বনভূমি বিচ্ছিন্ন নয়, নীল বনের সঙ্গে যুক্ত। মহাভারতে চিত্রকূট পর্বত এবং মন্দাকিনী নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

চুকশা : জোহ্যোনিকার তক্ষশিলা-র রূপার ফুলদানীতে উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায়, স্থানটি তক্ষশিলার কাছে ছাছ সমতলভূমি। স্টেইনের মতে চুকশা আটক জেলার উত্তরে বর্তমান ছাছ।

দধিচী আশ্রম : সরস্বতীর তীরে ছিল এই আশ্রম। দেব কল্যাণে দধিচী এখানে দেহত্যাগ করেন।

দলমাউ : এটি একই নামের এক পরগণার রাজধানী এবং তহশিল দলমাউয়ের সদর কার্যালয়। এটি একটি অতি প্রাচীন শহর এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের দিক দিয়ে আকর্ষণীয়। রায় বেরিলী থেকে ১৯ মাইল দূরে গঙ্গার তীরে এটি অবস্থিত। এখানে একটি কেল্লা রয়েছে—আসলে তা দুটি বৌদ্ধস্তুপের ধ্বংসাবশেষ।

দণ্ডকহিরঞ্চ : হিমালয় অঞ্চলে সম্ভবত পাহাড়টি ছিল।

দবালা : মহারাজা সমখোবের তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি এটি ডাহলার পূর্বরূপ। সম্ভবত স্থানটি আধুনিক বুলেন্দখণ্ড।

আড়বক (গাজিপুর) এবং ডবালা বা জব্বলপুরের সঙ্গে এই অরণ্য রাজ্য যুক্ত ছিল।

দর্বাভিসার : মহাভারতে উল্লিখিত স্থানটি স্টেইনের মতে ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যবর্তী পাহাড়ের নিচের দিক ও মধ্যভাগের ভূমি নিয়ে গঠিত ছিল। কারোর মতে এটি কাশ্মীরের নওশেরা ও পুঞ্চ জেলা এবং প্রাচীন কাম্বোজের অংশ।

দেওলিতা : উঃ প্রদেশের প্রতাপগড়ে অবস্থিত ছিল।

দেওরিয়া : এলাহাবাদের ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং কর্চনার ৯ মাইল পশ্চিমে যমুনার ডান তীরের একটি গ্রাম।

দেবিকা : হিমালয় জাত একটি নদী। পাণিনীর অষ্ট্যাধ্যয়ী, যোগিনীতন্ত্র এবং কালিকা পুরাণে এর কথা বলা হয়েছে। পারজিটার রাভীর একটি উপনদী দিগ হিসাবে এটিকে চিহ্নিত করেছেন। বামনপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী এই চিহ্নিতকরণ সঠিক। অগ্নিপুরাণ অনুযায়ী এটি সৌবীর দেশের মধ্যে দিয়ে বইত। পদ্মপুরাণেও নদীটির উল্লেখ রয়েছে। কালিকা পুরাণ মতে শিবালিক পর্বত শ্রেণির মৈনাক পাহাড় এর উৎস। উঃ প্রদেশের দেব বা দেবিকা নদীই এটি—বলে কেউ কেউ মনে করেন। আসলে এটি সরযূর দক্ষিণ গতির নাম। কালিকা পুরাণ বলছে, এটি সরযূ এবং গোমতীর মধ্য স্থান দিয়ে প্রবাহিত হোত। মহাভারত কিন্তু দেবিকা আর সরযূকে ভিন্ন ভিন্ন নদী বলে মনে করে। বীরনগর এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ধম্মপালগাম : গ্রামটি কাশীরাজ্যে ছিল।

দৃষদ্বতী : ঋগ্বেদে বলা হয়েছে নদীটি তদানিন্তন ব্রহ্মাবর্তের দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমানা রচনা করেছে। এটি হিমালয় জাত নদী। কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুর আসার পথে এটিকে অতিক্রম করেছিলেন। মহাভারত অনুযায়ী মনে হয়, এটি কুরুক্ষেত্রেরও একটি সীমা নির্দ্ধারণ করেছিল। কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, এটিকে গঙ্গার মতো দেখতে। দৃষদ্বতী এবং কৌশিকীর সঙ্গমকে অতি পুণ্যস্থান বলা হয়েছে। বর্তমানে চিতরং নদী বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নদীটি সরস্বতীর সমান্তরাল ভাবে বয়ে যায়। এই নদীর উৎস সিরমুর পাহাড়। এলফিন স্টোন এবং টড এটিকে আম্বালা ও সিন্ধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঘঘর নদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা রাজস্থানের মরুভূমিতে লুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে কানিংহাম থানেশ্বরের দক্ষিণপূর্ব বয়ে যাওয়া রাক্ষি নদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বামন পুরাণে কৌশিকীকে দৃষদ্বতীর শাখা নদী

হিসাবে দেখান হয়েছে। ভাগবত পুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বৈতবন : বনবাসকালে পাণ্ডবেবা এই বনে বসবাস কবেছিলেন। মনে করা হোত, রাজ অধিকারেব বাইবে এটি একটি মুক্তাঞ্চল। সীমান্তে দ্বৈত বলে একটি হ্রদ থাকায় এর নাম ছিল দ্বৈত। মহাভারতের মতে এটি একটি মরুভূমির কাছে ছিল—সরস্বতী তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেত। হিমালয়ের অদূরেই ছিল এই বন। উত্তর-পূর্বে তঙ্গন এবং দক্ষিণ পূর্বে কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনাপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বনটি ছিল। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের তীর্থযাত্রা এখান থেকে শুরু হয়।

একশাল : এটি একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। বুদ্ধ কোশলবাসীর সঙ্গে এখানে একবার ছিলেন। এখানে বিশাল একদল গৃহীর সামনে বুদ্ধ ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখানে বুদ্ধের কাছে 'মার' পরাস্ত হয়েছিল।

গড়ওয়া : এলাহাবাদ জেলার অরৈল ও বর পরগণার অনেক গ্রাম নিয়ে এই গড়টি তৈরি হয়েছিল। এখানে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের একটি প্রস্তর লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপি অনুযায়ী এলাহাবাদ জেলার করচনা মহকুমায় গড়ওয়া অবস্থিত ছিল।

গম্ভীরা : চম্বল নদীর (চর্মবতী) ওপর দিকে এটি যমুনার একটি উপনদী।

গণ্ডকী (গণ্ডক) : ভাগবত পুরাণ এটিকে গণ্ডকী এবং চক্রনদী বলে অভিহিত করে। কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ) এর উল্লেখ রয়েছে। পদ্মপুরাণের মতে এটি একটি পবিত্র নদী। যোগিনীতন্ত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ তিব্বতে উৎপন্ন এই গণ্ডকী গঙ্গার একটি বড় উপনদী। নেপাল অতিক্রম করার সময় বাঁ দিকে চারটি ও ডান দিকে দুটি উপনদীকে গণ্ডকী গ্রহণ করে। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত নদীটিকে ওয়েবার গণ্ডকী বলে চিহ্নিত করেছেন।

গন্দরী (গনদারতিস) : টলেমির মতে এটি কাবুল নদী বরাবর খোয়াস্পেস ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

গণ্ডপর্বত : এটি গঙ্গোত্রী পর্বত—এর পদতলেই রয়েছে বিন্দু সরোবর।

গন্ধমাদন : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, এই পর্বতের ওপর ব্রহ্মা অবতরণ করেছিলেন। জাতকে বলা হয়েছে, এটি একটি পাথুরে পর্বত। রাজা বেশ্যান্তর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে এই পর্বত দর্শন করেছিলেন। এই পর্বতটি রুদ্র হিমালয়ের একটি অংশ এবং মহাকাব্যকারদের মতে এটি কৈলাস পর্বতশ্রেণির অংশ। হরিবংশ অনুযায়ী রাজা পুরুরবা উর্বশীকে নিয়ে এই পর্বতের পদতলে দশবছর বসবাস করেছিলেন। পদ্মপুরাণের মতে এখানে সুগন্ধ নামে একটি তীর্থ ছিল। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও বিক্রমোর্বশীতে গন্ধমাদনের উল্লেখ রয়েছে। এই পর্বতে একটি বড় শিবলিঙ্গ ছিল। দিব্যাবদানে বলা হয়েছে রত্নক নামে এক আশ্রম রক্ষক এখানে অশোক তরু লাগিয়েছিলেন এবং সেখানে বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন।

গন্ধর্ব : কেউ কেউ মহাভারতে বর্ণিত গন্ধর্বদের দেশ হিসাবে গান্ধার দেশকে চিহ্নিত করেন। রামায়ণে বর্ণিত গান্ধার দেশ সিন্ধুর তীরে অবস্থিত ছিল।

গান্ধার : পালি সাহিত্যে বর্ণিত ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল গান্ধার। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ এবং বীরপুরুষ দত্তের নাগার্জুন কোন্ডার লিপিতেও

এর উল্লেখ রয়েছে। রাওয়ালপিণ্ডি এবং পেশওয়ার জেলা নিয়ে এটি গঠিত ছিল। কাবুলও যুক্ত ছিল। ভান্ডাবকার বলেছেন, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ব আফগানিস্থানও এর ভেতরে ছিল। কানিংহামের মতে গান্ধারের সীমারেখা ছিল, পশ্চিমে লমঘান ও জালালাবাদ, উত্তরে সোয়াতের পাহাড় এবং বুনির, পূর্বে সিন্ধু এবং কালবাঘ পাহাড় দক্ষিণে। দারায়ুস প্রথমের বাহিস্তুন লিপিতে গান্ধারের উল্লেখ রয়েছে। গান্ধারের লোকেরা সম্ভবত পারসীকদের অধীনে ছিল। ঋগ্বেদের সমসাময়িক প্রাচীন ছিল গান্ধারবাসীরা, অশোকের শিলালিপি পঞ্চমেও গান্ধারের যে উল্লেখ রয়েছে তাতে মনে হয় সিন্ধুর উভয় তীরেই গান্ধার রাজ্যটি ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, বিস্তৃত দেশটি ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, প্রচুর ফল এবং আখ উৎপন্ন হোত। অধিবাসীরা বাস্তব শিল্প পছন্দ করত। এক হাজার বৌদ্ধ বিহার থাকলেও তা ভগ্নদশায়। ১০০টির বেশি দেবমন্দির ছিল। গান্ধারের প্রাচীনতম রাজধানী পুষ্কলাবতী এবং তক্ষশিলা। ভরতের পুত্র এবং রামের ভাগিনেয় পুষ্কর এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কেউ কেউ বলেন, কাশ্মীব এবং তক্ষশিলা অঞ্চল গান্ধারের ভেতর ছিল। কিন্তু জাতক কাহিনী তা সমর্থন করে না। প্রখ্যাত অভিধর্ম কোশা শাস্ত্রের লেখক বসুবন্ধু পুষ্কলাবতীর স্থানীয় লোক ছিলেন।

গণেশ্রা : এটি মথুরার কাছে। ভোগেল এখানে একটি শিলালিপির টুকরো আবিষ্কার করেছিলেন। ঘটাক নামে পরিচিত ক্ষরাতের এক সামন্ত পরিবারের নাম ঐ লিপি থেকে জানা যায়।

গঙ্গা : গঙ্গা, অলকনন্দা বা দ্যুধুনী বা দ্যুনদী নামে ঋগ্বেদে বা শতপথ ব্রাহ্মণে পরিচিত। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে, ব্রহ্মান্ড পুরাণে এবং যোগিনীতন্ত্রে, কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবে এটির উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গা ভাগিরথী ও জাহ্নবী নামেও পরিচিত। কালিদাসেব বিক্রমোর্বশীতে গঙ্গা-যমুনার সংগমের কথা বলা হয়েছে। মেঘদূতে বলা হয়েছে, গঙ্গা দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তৈত্তরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারীদের বিশেষ সম্মান জানানো হোত। লুডিংগের মতে অথর্ববেদেব বরণাবতীই গঙ্গা। বলা হয়েছে, গঙ্গা নারায়ণের পদ থেকে নির্গত হয়ে মেরু পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এরপরে এটি চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। রাজা ভরতের মধ্যস্ততায় শিব দক্ষিণ ধারাটিকে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেন। হরিবংশে বলা হয়েছে, রাজা পুরুরবা উর্বশীর সঙ্গে মন্দাকিনী তথা গঙ্গার কূলে বসবাস করতেন। মার্কন্ডেয় পুরাণে গঙ্গাকে ত্রিপথগামিনী বলা হয়েছে। পূর্বদিকের ধারাটি চৈত্ররথ বন হয়ে সীতা নামে বরুনোদ সরোবরের দিকে গেছে। গন্ধমাদনের দিকে বয়ে যাওয়া ধারাটি সুমেরু পর্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন হয়ে অলকনন্দা নাম নিয়ে তীব্র স্রোতে মানস সরোবরে পড়েছে। বায়ু ও মৎস্য পুরাণ প্রায় একইভাবে মার্কন্ডেয় পুরাণের গঙ্গার অবতরণের কথা বলে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ এমন কি মহাভারতও এই বর্ণনাকে প্রায় সমর্থন করে। বাণের কাদম্বরী অনুযায়ী, ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করা সময় যজ্ঞরত জহ্নু ঋষির যজ্ঞবেদি ধুয়ে মুছে যায়। পদ্মপুরাণে গঙ্গাসাগরকে পুণ্যতীর্থ বলা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ অনুযায়ী বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বাহিত গঙ্গা হচ্ছে গৌতমগঙ্গা এবং উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গার নাম ভাগিরথী

গঙ্গা। পদ্মপুরাণে গঙ্গা আর সিন্ধুর মিলনস্থলকে পূণ্যক্ষেত্রে বলা হয়েছে। পুরাণে গঙ্গাকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, বটোদকা, নলিনী, সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা, এবং সিন্ধু (স্বর্গখন্ড)। এরিয়ান গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন। মেগাস্থিনিস বলেন, গঙ্গা ও সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা অনেক বড়।

সোনোস নদী, সিত্তোকাটিস এবং সোলেমাতিস নদীকে গঙ্গা ধারণ করেছে। এগুলি নাব্য। এছাড়াও রয়েছে, কোন্ডোছাতেস সাম্বোস, মগোন, এগোরানিস এবং ও ওমালিস। উপরন্তু বিশাল নদী কোম্মেসনাম্বে, কাকাউথিস এবং এন্ডোমাতিসও গঙ্গায় পড়েছে। জম্বুদ্বীপান্নত্তি অনুযায়ী পূর্বগামী গঙ্গায় ১৪০০০ নদী মিলিত হয়েছে, মহাকাব্যে বলেছে, এই নদীর উৎপত্তি স্থান বিন্দুসার। কিন্তু পালি সাহিত্যে এটি অনোতত্ত হ্রদের দক্ষিণ ভাগ থেকে উৎপন্ন। গারোয়াল জেলার গঙ্গোত্রিতে ভাগিরথী-গঙ্গা প্রকাশ্যে আসে। হরিদ্বার থেকে বুলন্দশহর পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ গতি—তারপর এলাহাবাদ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব গতি। এখানে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত পূর্বগতি। রাজমহলের পরে এটি বাংলায় প্রবেশ করে। হরিদ্বার থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এটি যমুনার প্রায় সমান্তরাল ভাবে বয়ে গেছে। মহাভারতে সপ্তগঙ্গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গর্গ-আশ্রম : রায়বেরিলী জেলার অস্নির বিপরীতে গঙ্গার পাড়ে এটি অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, এটি কুমায়ুনের অরণ্যে ছিল।

গর্গরা : বিশ্ববর্মনের গান্ধার লিপিতে এটির উল্লেখ রয়েছে। অধুনা চম্বলের উপনদী কালিসিন্ধের এটি প্রাচীন নাম।

গড়মুক্তেশ্বর : মিরাট জেলার গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটি নগর। এটি হিন্দুদের একটি পবিত্র স্থান। গঙ্গা মন্দিরের জন্য স্থানটি বিখ্যাত।

গর্জপুর (গর্জপত্তি পুরা) : বারাণসীর ৫০ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরে একটি নগর এবং আধুনিক গাজিপুর। এটি গর্জনপতি নামেও পরিচিত ছিল। এর চিনা নাম চেন-চু। ভূমি উর্বর এবং মনোরম আবহাওয়া। এখানে দশটি সঙ্ঘারাম এবং কুড়িটি দেবমন্দির ছিল।

গৌরীশংকর : এটি নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ২৯০০২ ফুট। এটির অনেক নাম। যেমন দেবধুংগ, কোমো কংকর, কোমোলুংমা, কোমো উরি, দেলুংবু, মি-তি-কা-পুলোংগা। ১৯৫৩ সালে তেনজিং ও হিলারী এখানে আরোহণ করেন।

গোবিধুমট : এটওয়ার ২৪ মাইল উত্তর পূর্বে এবং ফরুকাবাদ জেলার সানকিসা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে স্থানটির উল্লেখ রয়েছে।

ঘোষিতারাম : শ্রেষ্ঠী ঘোষিত কৌশাম্বীতে এই বিহারটি নির্মাণ করেন। অধুনা এখানে খনন করে একটি লিপি পাওয়া গেছে—যা থেকে জানা যায়, প্রসিদ্ধ 'আরাম'টি কৌশাম্বীর উত্তর-পূর্ব কোণে শহরের প্রান্তে অবস্থিত ছিল, বুদ্ধের মৃত্যুর পরেও 'আরাম'টি আনন্দের অতি প্রিয় স্থান ছিল। প্রায়ই এখানে সারিপুত্ত, মহাকাচ্চায়ন, উপবাণ আসতেন। অনুপিয়া ছেড়ে বুদ্ধ কৌশাম্বীতে এসে এই 'আরামেই' বসবাস করেছিলেন। এখানে বিহারবাসী চন্নের সঙ্গে আনন্দের দেখা হয়। এখানে মনদিস্সা এবং জালীয় নামে দুই পরিব্রাজক বুদ্ধের সাক্ষাৎকার নেন। পিন্ডোল্যা ভরদ্বাজ যিনি রাজা উদয়নকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত

করেন—এখানে বসবাস করতেন। এই আরামের প্রায় ৩০ হাজার সন্ন্যাসী—খের উরুধর্ম্মরক্ষিতার নেতৃত্বে খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতকে সিংহলে গিয়েছিলেন। তখন রাজা দুধ্ধগামনী শাসনকাল। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন কৌশাম্বী পরিদর্শন কালে দেখেন যে ঘোষিতরামর অধিকাংশ ভিক্ষুই হীনযান মতাবলম্বী। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং কৌশাম্বী পরিদর্শন কালে দেখেন, দশটির বেশি সঙ্ঘারাম ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে, এরই মধ্যে অন্যতম ঘোষিতরাম বিহার। কুক্কুটরাম এবং পাবারিক-আম্রবন ঘোষিতরাম-র দক্ষিণ পূর্বে এবং পূর্বে অবস্থিত ছিল। অশোক ঘোষিতরামর কাছে ২০০ ফুট উঁচু এক স্তুপ নির্মাণ করেন।

গোহারওয়া : এলাহাবাদ জেলার মনঝানপুর তহশিলে গ্রামটি অবস্থিত ছিল। এখানে কর্ণদেবের দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

গোকুল : ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী বৈষ্ণবদের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি যমুনার পূর্ব-তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে গোকুলনাথজীর মন্দির রয়েছে। কংসের ভয়ে বসুদেব ভীত হয়ে সদ্যভূমিষ্ঠ কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে এখানে নন্দগৃহে রেখে আসেন। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বল্লভাচার্য—বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবনের অনুকরণে নবগোকুল নির্মাণ করেন। গোকুলের কাছে বৃহৎবন বলে একটি অরণ্য ছিল।

গোমতী : নদীটি ঋগ্বেদের গোমতী, সম্ভবত আধুনিক গোমাল। সিন্ধুর একটি পশ্চিমী উপনদী, বারাণসীর নীচে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত আধুনিক গুমতি বলেও এটিকে চিহ্নিত করা হয়। রামায়ণে বলা হয়েছে, গুমতি অযোধ্যার মধ্যে ছিল এবং গবাদিপশুতে পূর্ণ থাকত। শাহজাহানপুর থেকে নির্গত হয়ে বারাণসী ও গাজিপুরের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গার সংগে মিশেছে। মহাভারত, ভাগবতপুরাণ, বিষ্ণুস্মৃতি এবং পদ্মপুরাণেও এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে একই নামে অন্য একটি নদীর নাম বলা হয়েছে যা গুজরাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোত এবং দ্বারকা তার তীরে ছিল। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী গোমতী গঙ্গার একটি উপনদী—বারাণসীর কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বলরাম এই নদীটি পরিদর্শন করেন।

গোমতীকোট্টক : জীতগুপ্তের দেও বরনার্ক লিপিতে স্থানটির উল্লেখ আছে। গোমতী (অধুনা গুমতির) তীরে কোথাও স্থানটি ছিল।

গোমুখি : রামায়ণের গোকর্ণ হিসাবে স্থানটিকে চিহ্নিত করা হয়।

গোতম : মনে হয় পর্বতটি হিমালয়ের কাছাকাছি ছিল।

গোবর্দ্ধন : মথুরা জেলার বৃন্দাবনের ১৮ মাইল দূরে এই পাহাড়। কথিত আছে পৈথ গ্রামে কৃষ্ণ কড়ে আঙ্গুলে পাহাড়টিকে তুলে ধরে গ্রামবাসী এবং গবাদিপশুদের ইন্দ্র প্রেরিত প্রবল বর্ষণের হাত থেকে ছাতার মতো রক্ষা করেছিলেন। ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, যোগিনীতন্ত্র, এবং কালিদাসের রঘুবংশে পাহাড়টির উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণ আর হরিবংশে বলা হয়েছে, গোবর্দ্ধন গিরিতে হরিদেব, চক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং শ্রীনাথজীর (পূর্বতন গোপালা) মূর্তি রয়েছে।

গোবিসনা : মোরাদাবাদের উত্তরে কোথাও ছিল। চিনারা একে বলত কু-পি-সাং-না। উজ্জৈন গ্রামের কাছে পুরোন কেল্লাটিই গোবিসনা। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ

এটি পরিদর্শন করেন। ওখানে দুটি বৌদ্ধ বিহারে ১০০র বেশি বৌদ্ধ হীনযান পন্থী ভিক্ষুরা বাস করতেন। গোবিসনা জেলাটির পরিধি ছিল ৩৩৩ মাইল, এটি গোবিসন্ন নামেও পরিচিত ছিল এবং উত্তরে ছিল ব্রহ্মপুরা, পশ্চিমে মদাওয়ার, দক্ষিণ এবং পূর্বে ছিল অহিচ্ছত্র। বর্তমান কাশিপুর, রামপুর এবং পিলিভিটকে পশ্চিমে রামগঙ্গা পর্যন্ত বাড়িয়ে এবং পূর্বে ও দক্ষিণে বেরিলী পর্যন্ত বর্দ্ধিত স্থানটি ছিল গোবিসনা জেলা।

হলিদ্দবসন : কোলিয়দের একটি গ্রাম। বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন।

হরপ্পা : পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্টেগোমারী জেলায় হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। হরপ্পা সভ্যতা সিন্ধু নদী ছাড়িয়েও প্রসারিত হয়েছিল। ১৯৪৬ এর খননে চিনামাটি শিল্পের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। হরপ্পার লোকেরা মাটি খুঁড়ে মৃতদের কবর দিত। 'এবি'ঢিবি প্রতিরক্ষা প্রাচীর ইত্যাদি প্রমাণ করে, হরপ্পা সভ্যতা অনেক এগিয়েছিল, অধিবাসীরা সুখী জীবন ধারণ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা অগ্রগামী ছিল।

হরাহা : এটি বড়াবাকি জেলায়। এখানে ঈশানবর্মা মৌখারীর পাথরের পাটার ওপর একটি লেখ পাওয়া গেছে।

হরিদ্বার : উত্তর ভারতের বৈষ্ণবদের কাছে স্থানটি পবিত্র। মহাভারতে একে গঙ্গাদ্বার এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে একে মায়াপুরী বলা হয়েছে। গঙ্গার তীরে বিদুর মৈত্রেয়র কাছে শ্রীমদভাগবত পাঠ শুনেছিলেন। এখানে গঙ্গা হিমালয় থেকে নেমেছে। এটি সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত। হিউয়েন সাঙের মতে নাম মো-ইউ-লো বা ময়ূর—মাদাওয়ারের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এবং গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। গঙ্গা খালের মাথায় দিকে ময়ূর মায়াপুরীর ধ্বংসাবশেষের স্থান। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে এটি ৩.৫ মাইল পরিধি বিশিষ্ট জলবহুল নগর। কানিংহামের মতে নগরটিকে ময়ূরপুরও বলা যায়। কারণ আশপাশে প্রচুর ময়ূর রয়েছে।

হরিয়ূপিয়া : এই স্থানে অভ্যাবর্তীন চারমান কর্তৃক বৃচিবন্তেরা পরাজিত হয়েছিল। ইব্যাবতী নদী তীরে (লুডিংগ) এটি একটি নগর। হিল্লেব্রান্ট এর মতে নদীটির নাম ইর্‌য়াব (হালিয়াব)—কুরুম নদীর উপনদী। কিন্তু এটি সঠিক নাও হতে পারে।

হস্তিনাপুর : উঃ পূঃ মিরাট জেলার গঙ্গার তীরে ছিল কুরুদের প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুর। মিরাটের মাওয়ানা মহকুমার একটি পুরোন শহরকে সাধারণত হস্তিনাপুর বলে চিহ্নিত করা হয়। ধৃতরাষ্ট্র এখানে রাজত্ব করতেন। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ হস্তিনাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভরতের রাজ্যাভিষেক করেছিলেন। ভরত আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দেন। রাজা হস্তি ভাগিরথীর তীরে হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। মহাবীর প্রায়ই এই নগরে আসতেন। হস্তি বা হস্তিনের দুই পুত্র ছিল। আজমীঢ় এবং দ্বিমিঢ়। আজমীঢ় পৌরবকুলের প্রধান ধারা বহন করে হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেন।

হেমবত (হিমবন্ত) : প্রাচীন কালে হিমালয় পর্বত হিমবান, হিমাচল, হিমবন্তপ্রদেশ, হিমাদ্রি, হৈমবত এবং হিমবত নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এর উল্লেখ রয়েছে। একে পর্বতরাজ বা নাগধিরাজও বলা হোত। এটি ৫ যোজন বিস্তৃত। ৮৪০০ শৃঙ্গ এবং ৫০ নদীর জন্মদাতা। কথিত আছে রাজা রঘু এই পাহাড়ে উঠেছিলেন। মহাকাব্য অনুযায়ী, হৈমবত অঞ্চল নেপালের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। মহাভারত অনুযায়ী কুলিন্দ বিষয়

(টলেমির কুনিনদ্রা)—অর্থাৎ সেইসব উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল যেখান থেকে গঙ্গা, যমুনা এবং শতদ্রু উৎপন্ন হয়েছে। তাই বর্তমান হিমাচল প্রদেশ, তার আশপাশ অঞ্চল, এবং দেরাদুনের কিছু অংশ এর অন্তর্গত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের লেখক জানতেন যে হিমবত পর্বত ধনুকের জ্যার মতো সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় মহাভারত এবং কুমারসম্ভবে। দুটি উচ্চতম পর্বত— কৈলাস এবং হিমালয় (হিমবান) মেরু পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই দুই পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে সাগর পর্যন্ত প্রসারিত। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রায়ই বলা হয়েছে যে কৈলাস পর্বত হিমালয় পর্বত শ্রেণির মধ্যভাগে অবস্থিত। বাণের হর্ষচরিতে বলা হয়েছে, অর্জুন হেমকূট পাহাড়কে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত করার জন্য বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিল। বাণের কাদম্বরীতে বলা হয়েছে, পর্বতটি শ্বেতবর্ণ। কুনাল জাতকে হিমালয়ের বর্ণনা রয়েছে। অশ্বঘোষ হিমালয় (হিমবান) এবং এই পর্বত ও পারিপাত্র পর্বতের মধ্যবর্তী মধ্যদেশের স্থানগুলি উল্লেখ করেছেন। শিব কৈলাসে বসবাস করতেন।

বিশাল হিমালয় পর্বতশ্রেণির একটি অংশ মৈনাক পর্বত। হিমালয় অঞ্চলে দদ্দরা নামে আরও একটি পর্বত ছিল। ঐ পর্বতের চারটি শ্রেণি, অরণ্য ও একটি হ্রদ ছিল। হিমালয়ের কাছে ধম্মক নামে আর একটি পর্বত ছিল। হিমালয়ের গায়ে দাঁড়িয়েছিল চণ্ডগিরি—কাছাকাছি একটি বনও ছিল। কালগিরি এবং রজতব্বত হিমালয় অঞ্চলেরই।

অসম ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের পূর্বাঞ্চল মোটামুটি জম্বুদ্বীপের হৈমবত ভাগ গঠন করেছিল। এই প্রেক্ষিতে অশোক তাঁর ১৩নং শিলালিপিতে নাভক এবং নভপংক্তিদের কথা বলেছেন। অর্হৎ মজ্জিমকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য হিমালয় অঞ্চলে পাঠান হয়। তিনি হিমালয়ে বসবাসকারী যক্ষদের ধর্মান্তরীত করেন। পৌলস্ত রাক্ষসেরা হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী এই রাক্ষসদের কৈলাসের ওপরে পাওয়া যেত।

জম্বুদ্বীপের হিমালয় অঞ্চল (হিমবন্ত প্রদেশ) উত্তরে সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। হিমবত বিভাগের কথা কালসীর শিলালিপিগুলিতে, নিগলীবতে লুম্বিনী এবং চম্পারণ জেলায় প্রাপ্ত অশোকের স্তম্ভলিপিগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ তিব্বত, ফার্গুসন অনুযায়ী নেপাল, রিজ ভেভিস অনুযায়ী মধ্য হিমালয় অঞ্চল বলে হিমবত প্রদেশকে চিহ্নিত করেন। প্রাচীন ভূগোলবিদেরা হিমবত বলতে সমগ্র হিমালয় পর্বতশ্রেণিকে বোঝাতেন যা পাঞ্জাবের পশ্চিমে সুলেইমান পর্বত থেকে শুরু করে পূর্বে অসম ও আরাকানের পর্বত শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। কৈলাস পর্বত হিমালয়ের অংশ হলেও মার্কণ্ডেয় পুরাণ একে একটি স্বতন্ত্র পর্বত বলেছে। শ্বেত শুভ্র কৈলাসের সুউচ্চ সব শিখর ছিল। এই পর্বতের বিহার থেকে প্রাচীন সুরিয়গুত্ত ৯৬০০০ সন্ন্যাসী নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। কৈলাস পর্বতের মাথার দিকে তিব্বতের কাংগ্রিনপোচি। মানস সরোবরের ২৫ মাইল দূরে ছিল সুধম্মপুর।

আলবেরুনীর মতে মেরু ও নিষাদ—যাদের পুরাণে বর্ষপর্বত বলে উল্লেখ করা হয়েছে—সেগুলি হিমালয় পর্বত শৃঙ্খলের মধ্যেই ছিল। হিমালয় থেকে গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বিতংসা, চন্দ্রভাগা উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু পুরাণ ১০টির

বেশি নাম বলে। যেমন গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধুতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, রনক্ষু, নিশ্চিরা, গন্ডকী, এবং কৌশিকী। টলেমি বলেছিলেন, গঙ্গা, সিন্ধু, কোয়া এবং সোয়াতের নদীগুলির উৎস ইমাওস (হিমালয়)। মিগসম্মাতা নদীটি হিমালয় থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। মিলিন্দপঞ্চহো বর্ণিত উহানদীকে হিমালয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। পালি অপদানে হিমালয়ের আশপাশেঁ আরও কয়েকটি পর্বতের নাম করেছে। যেমন, কদম্ব, কুক্কুট, কোসিকা, গোতম, পদুমা, ভারিকা, লম্বক, বসভ, সমাংগ, এবং শোভিতা। হিমালয় পর্বতই একমাত্র বর্ষপর্বত এবং সেটি ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে অবস্থিত। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের দানলিপিতে হিমালয়ের কেদারের কথা বলা হয়েছে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে, শিবপার্বতী হিমালয়ের মহা-কৌশিকী নদীর প্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন। কুমারসম্ভবে বলা হয়েছে, অপূর্ব হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে তা সাগরের সঙ্গে মিশেছে। এই পর্বত নানান মণিমুক্তার আকর। এর শিখরদেশে নানানপ্রকারের ধাতু রয়েছে। সাধুরা হিমালয়ের রৌদ্রোজ্জ্বল শিখরদেশে আশ্রয় নেন—গুহাগুলি মেঘে পূর্ণ। বন্য শিকারী কিরাতেরা এই পর্বতে সিংহের চলনপথ অনুসরণ করে তাদের শিকার করে। রক্তের দাগ থাকে না কারণ বরফগলা জলে তা ধুয়ে যায়। হিমালয়ের অন্ধকার গুহায় বসবাসকারী কিরাতেরা আলোর জন্যে স্বয়ং-আলোক-উজ্জ্বল লতাগুল্মের শিকড় ব্যবহার করে। কিরাতদের প্রধান বাসভূমি, কৈলাস, মন্দারা, এবং হৈম পর্বত ঘিরে অর্থাৎ মানস সরোবরের চতুর্দিকে। হিমালয়ের বরফ আস্তরণের জন্যে এর ওপর দিয়ে হাঁটা চলায় অসুবিধা ঘটে। হিমালয়ের ইয়াকেরা 'ফারের' জন্য বিখ্যাত। পরীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেছিল, আমরা রাজার জন্যে হিমালয়ের হেমকূট শিখরে অপেক্ষা করব।

বৌদ্ধ সাহিত্য ১৫০ যোজন এলাকা জোড়া হিমালয়ের সাতটি মহাহ্রদের নাম উল্লেখ করেছে, অনতপ্ত, কন্নমুন্ড, রথকার, ছদদন্ত, কুনাল, মন্দাকিনী, শিহপ্পপাত। প্রত্যেকটি পঞ্চাশ লীগ লম্বা, চওড়া এবং গভীর। এদের চিহ্নিত করা যায়নি। হিমালয়ের মণিপর্বত, হিঙ্গুলপর্বত, অঞ্জনপর্বত, সানুপর্বত এবং ফলিকপর্বতের শৃঙ্গগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এবং হরিবর্ষের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে হিমালয় পর্বতশ্রেণি এবং হেমকূট। প্রথমটি দ্বিতীয়টির দক্ষিণে। জৈন জম্বুদ্বীপন্নত্তি এবং মহাভারতে দেশগুলির বিন্যাস এভাবেই দেওয়া রয়েছে। হেমকূট অঞ্চল কিম্পুরুষবর্ষ এবং হেমকূট অঞ্চল কিন্নর-খণ্ড নামেও পরিচিত। দক্ষিণী বৌদ্ধদের ধারণা অনুসারে হিমালয় পর্বতশ্রেণি উত্তরে গন্ধমাদন পর্বতশ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং গন্ধমাদন রুদ্র হিমালয়ের অংশ, কিন্তু মহাকাব্যের লেখকরা বলেছেন, এটি কৈলাস পর্বতশ্রেণির অংশ। অনতপ্ত হ্রদ বা মানস সরোবরে যা কিনা হিমালয়ের সাতটি বৃহৎ হ্রদের অন্যতম—সেটি কৈলাস এবং চিত্রকূট শৃঙ্গের সঙ্গে জড়িত। জম্বুদ্বীপন্নতি সম্ভবত ঠিকই বলেছে যে দুটি হ্রদ ছিল। দুটিকেই মহাপদ্মহ্রদ বলা হোত। এদের একটি পশ্চিম হিমালয় পর্বতশ্রেণি (ক্ষুদ্র হিমবন্ত) এবং অপরটি পূর্ব হিমালয় পর্বতশ্রেণির (মহা হিমবন্ত) সঙ্গে জড়িত। হিমালয়ে ছদ্দন্ত হ্রদ ৫০ লীগ চওড়া ও ৫০ লীগ লম্বা। এই হ্রদে শ্বেত এবং লাল পদ্ম, লাল এবং সাদা লিলি ফুল ফুটত।

হিমালয়ের সুন্দরী-মহিলাদের খপ্পরে যারা পড়ত—তারা ধ্বংস হয়ে যেত।

হিমালয় পর্বত অঞ্চলে হাতি, হরিণ, গন্ডার, মহিষ, ব্যাঙ, ময়ূর প্রভৃতি বন্য পশুপক্ষীর আবাস স্থল ছিল।

পার্বত্য অঞ্চলে যেত সাধু-সন্ন্যাসী, শিকারী এবং শিকাররত রাজারা। সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানে অনেক আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। যেমন ভাগিরথীর অদূরে হিমালয়ের কাছে ছিল কপিল আশ্রম। বৃষপর্বনের বিখ্যাত আশ্রম ছিল হিমালয়ের কৈলাস পর্বতের কাছে।

হিঙ্গুলা পর্বত : এটি হিমালয় অঞ্চলে। হিংলাজ বেলুচিস্তানের প্রান্তে হিংগুলা বা হিংগুল পর্বতশ্রেণিতে—সমুদ্র উপকূল থেকে ২০ মাইল দূরে অঘোর বা হিংগুলা নদীর তীরে অবস্থিত।

হিরণঞবতী (হিরণ্যবতী) : এটি কুশীনারার কাছে ছোট গন্ডক বা অজিতবতী নদী। বৃহৎ গন্ডকের ৮ মাইল পশ্চিমে গোরক্ষপুর জেলার মধ্যে এটি প্রবাহিত হয়ে গোগরা (সরযূ) নদীতে পড়ে। কুশীনারায় মল্লদের শালবন এরই তীরে ছিল।

হৃষিকেশ : হরিদ্বারের ২৪ মাইল উত্তরে এই পর্বত অবস্থিত। এখানে দেবদত্তের আশ্রম ছিল। হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ যাবার পথে গঙ্গার তীরে এটি অবস্থিত। অনেকের মতে বৈষ্ণবদের এই পবিত্রভূমি হরিদ্বার থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

হূণদেশ : রঘু বংশ বা অক্ষু নদী এবং তার উপনদীগুলির তীরে অবস্থিত হূণদের রাজ্যে উপস্থিত হন। রঘু হূণদের পরাজিত করেন। সিন্ধু নদীর মতো অক্ষু নদীর তীরও গেরুয়া রঙের ফুলের জন্য বিখ্যাত।

ইচ্ছানংগল : কোশলের একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। বুদ্ধ একবার এখানকার ইচ্ছামংগল বনসন্দে বাস করেছিলেন। সুত্তনিপাতে এই গ্রামটির নাম দেওয়া হয়েছে ইচ্ছানংকাল।

ইক্ষুমতী : কুরুক্ষেত্রের একটি নদী।

ইন্দ্রপুর : স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলিপিতে বলা হয়েছে এই সুউচ্চ পর্বতটি দিভাইয়ের ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। বুলন্দশহর মহকুমার দিভাই পরগণার এটি মুখ্য শহর।

ইন্দ্রস্থান : ভাগবতে এটিকে বড় নগর বলে বলা হয়েছে, পদ্মপুরাণ অনুযায়ী ইন্দ্র বহুবার এখানে নানান যাগযজ্ঞ করেছিলেন এবং বহুবার রমাপতির পুজো করে নারায়ণের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের ধনদান করেছিলেন। তখন থেকে স্থানটি ইন্দ্রপ্রস্থ নামে বিখ্যাত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের কামউলি তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক দিল্লীর ২ মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরে ইন্দ্রপ্রস্থকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাত লীগ ব্যাপি এই নগর বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে এটিকে বৃহস্থলও বলা হয়েছে। এটি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল, কুরুদের এটি দ্বিতীয় রাজধানী। প্রথমটি হস্তিনাপুর গঙ্গার তীরে—উঃ প্রদেশের মিরাট জেলাকে এই হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুর শাসন করতেন। অন্যদিকে তাঁর পাঁচ ভ্রাতুষ্পুত্র যমুনার তীরে এই নগর পত্তন করেন। কুরুদের প্রাচীন রাজধানী কালক্রমে গুরুত্ব হারায়। বর্তমান ভারতের রাজধানী এই ইন্দ্রপ্রস্থে।

ইরাবতী : পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি আধুনিক রাভী নদী, গ্রীকদের হাইড্রাউটিস বা অদ্রিশ বা রোনাডিস। রাভী বাংগহালের পাথুরে অববাহিকায় উৎপন্ন হয়ে পীরপাঞ্জালের দক্ষিণ ঢাল ও ধাউলাধরের উত্তর ঢালের জলরাশি বহন করে নিয়ে

যায়। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী এই নদীর উৎস ইরা-হ্রদ, হিমালয়ের বুকে এর দৈর্ঘ ১৩০ মাইল। কাশ্মীরে ছাম্ব-এ এই নদী আমাদের প্রথম দৃশ্যমান হয়। ছাম্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমের গতি নিয়ে এটি লাহোর অতিক্রম করে যায়। এটি চেনাব (ঝিলম) বা বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মিলিত ধারার সঙ্গে আহমদপুর ও সরাইসিন্ধুর মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হয়।

ইশধর : মেরুপর্বতকে ঘিরে থাকা সাতটি পাহাড়ের একটি।

ইশিপত্তন মিগদায় (ঋষিপতন-মৃগদাব) : সারনাথের অনুরূপ।

ইশুকার (ঋষুকার) : কুরুরাজ্যে এই বিখ্যাত সম্পদশালী সুন্দর নগরটি অবস্থিত ছিল।

জঠর : মেরু (সিনেরু) পর্বতের পূবের একটি পর্বত। এটি নীল এবং নৈষাধ পাহাড়কে যুক্ত করেছে।

জ্বালামুখি : এটি হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার ডেরা গোপিপুর তহশিলের একটি প্রাচীন স্থান। কাংড়া থেকে নদায়ুন যাওয়ার পথে অবস্থিত। এর ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে এটি একদা একটি যথেষ্ট সম্পদশালী নগর ছিল। বর্তমানে বিতস্তার উপত্যকায় দেবী জ্বালামুখির মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

জালন্ধর (শে-লাম-তা-লো) : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে, উত্তরে ছাম্বরাজ্য, মন্দি এবং পূর্বে সুখেত ও দক্ষিণ পূর্বে শতদ্রু নিয়ে জলন্ধর গঠিত ছিল। এটি ১০০০ লী বা ১৬৭ মাইল লম্বায় এবং ৮০০ লী বা ১৩৩ মাইল চওড়া ছিল। পদ্মপুরাণ (উত্তরখন্ড) বলা হয়েছে, দৈত্যরাজ জলন্ধরের এটি রাজধানী ছিল। এখানে ২০০০ এর বেশি ভিক্ষু নিয়ে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি বিহার ছিল।

জানখাট : এটি উঃ প্রঃ এর ফারুকাবাদ জেলার তিরওয়া তহশিলে অবস্থিত। এখানে বীরসেনের সময়কার একটি লিপি পাওয়া গেছে।

জেতবন : উত্তর ভারতের এটি অন্যতম রাজকীয় উদ্যান ছিল। স্থানটি বুদ্ধের খুব প্রিয় এবং এটি প্রথম দিককার বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। এটি শ্রাবস্তীর (বর্তমান সাহেত-মাহেত) এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এটি রাজকুমার জেতের উদ্যান ছিল। অনাথপিন্ডকের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্যে জেতবন মহাবিহারকে অনাথপিন্ডিকের আরামও বলা হয়। এই শ্রেষ্ঠীই রাজকুমার জেতের কাছ থেকে এই উদ্যান ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এটি নির্মিত হয়ে বুদ্ধের নামে উৎসর্গীকৃত হওয়ার পর কোশলের স্থায়ী বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজগৃহ থেকে বুদ্ধ-দর্শন করে ফেরার পর অনাথপিন্ডিক বিহার নির্মাণের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানের খোঁজ করতে থাকেন। তাঁর জেতের উদ্যানটি পছন্দ হয়। কেনার প্রস্তাব দিলে রাজকুমার জেত বলে, উদ্যানটির ভূমি ঢাকতে যত স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন হয় আমি তাই নেব। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক সম্মত হন। ভারহুত স্তূপের 'বাস্-রিলিফে' এই বিহার উৎসর্গীকরণ উৎসব এবং বুদ্ধ গয়ার রিলিফে অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রায় ভূমি আচ্ছাদন করার দৃশ্য উৎকীর্ণ করা রয়েছে। জেতবনের করেরিকুঠি, কোশাম্বকুঠি, গন্ধকুঠি এবং শালাঘর ছিল ঐ বিহারের চারটি প্রধান গৃহ। এই স্থানেই কোশলের মহারাজা প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জয়চন্দ্রদেবের রাজত্বকালে বুদ্ধগয়ার একটি লিপিতে জানা যায় যে গোবিন্দচন্দ্র, কনৌজের গাহদাভাল বংশীয় রাজা (যিনি এক বৌদ্ধ রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন), তিনি জেতবন বিহারের

ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু গ্রাম দান করেছিলেন। এই বিহারে বুদ্ধ কিছুকাল বসবাস করেন।

ঝুসি : ফুলপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গার বামতীরে অবস্থিত এই প্রাচীন নগর।

জ্যোতিষ্মতী : বারকোবান হ্রদ থেকে নির্গত জ্যোতিষ্মতী সরস্বতীর একটি উপনদী।

কদম্ব : মনে হয় পর্বতটি হিমালয়ের অদূরেই ছিল।

কহায়ুম : কহায়ুসের স্কন্দগুপ্তের প্রস্তরস্তম্ভ লিপিতে এই গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। এটি ককুভা বা ককুভাগ্রাম বলেও পরিচিত ছিল। এটি সালামপুর মজহাউলির দক্ষিণে পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। গোরখপুর জেলার দেওয়ারিয়া তহশিলে সালামপুর মজহাউলী পরগণার মুখ্য শহর এই সালামপুর মজহাউলী।

কহ্‌রোর : মুলতানের ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং বহাওয়ালপুরের ২০ মাইল উত্তর পূর্বে প্রাচীন বিতস্তার দক্ষিণ তীরে এই প্রাচীন নগরটি অবস্থিত ছিল। আলবেরুনীর মতে, বিক্রমাদিত্য ও শকদের মধ্যে এইখানেই যুদ্ধ হয়।

কৈলাস : যোগিনীতন্ত্র এবং রামচন্দ্রের পুরুষোত্তমপুরীর তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। একে পর্বতরাজ বলা হয়েছে। নন্দা বা গঙ্গা দ্বারা পরিবেষ্টিত কৈলাসকে ভূতেশগিরিও বলা হয়। জম্বুদ্বীপান্নতি সূত্রে একে অঠ্‌ঠাবয় বলা হয়েছে। কালিকা পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। শিবপার্বতী এই স্থান দর্শন করেছেন। শান্তনু এই পর্বত এবং গন্ধমাদনেও বসবাস করতেন। মহাভারত কুমায়ুন ও গারোয়াল পর্বতকে কৈলাশ পর্বত শ্রেণির অন্তর্গত বলে বলেছে। মহাভারত একে হেমকূটও বলেছে। ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা বেগবতের নাতি, রাজা মানসবেগের পুত্র বীরশেখর এই পর্বত দর্শন করেছিলেন। এটিকে শংকরগিরিও বলা হয়। কালিদাস কুমারসম্ভবে কৈলাস পর্বতের কথা উল্লেখ করেছেন, জৈনরা একে অষ্টপদ বলে অভিহিত করতেন। এখানে ঋষভ প্রমুখ অনেক ঋষি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ইন্দ্র তিনটি স্তূপ তৈরি করেছিলেন। ভরত সিংহনিশাদ্য নামে একটি চৈত্য নির্মাণ করান। সেখানে ২৪ জন তীর্থঙ্কর এবং তাঁর মূর্তি ছিল। কৈলাস শ্রেণির পেছনে পঞ্চাশ মাইল দূরে লাডাক শ্রেণি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে। বৈদূর্য পর্বত বলে একে চিহ্নিত করা যায়। মানস সরোবরের ২৫ মাইল উত্তরে এটিই তিব্বতের কাংগ্রিন পোচে। কথিত আছে, বদরিকা আশ্রম এই পর্বতেই ছিল।

ককুত্থা : এটি বারহি নামে ছোট্ট একটি নদী। কাশিয়ার আট মাইল নীচে ছোট গণ্ডকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গোরক্ষপুর জেলার চিতিয়াওনের ১$\frac{1}{2}$ মাইল দূরে ঘাগী নদী বলে কার্লাইল একে চিহ্নিত করেছেন। বুদ্ধ রাজগীর থেকে কুশীনারায় যাবার পথে এই নদী অতিক্রম করেছিলেন। নদীটি কুশিনারার কাছে ছিল। তিনি নদী পার হয়ে প্রথমে আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করেন। পরে কুশিনারার কাছে মল্লদের শালকুঞ্জে প্রবেশ করেন।

কলসি গাম : এটি অলসন্দ বা আলেকজান্দ্রিয়া দ্বীপে অবস্থিত ছিল—রাজা মিনান্দারের জন্মস্থান।

কলাহ গ্রাম : হিমালয়ের পূর্ব ঢালে অবস্থিত। এখানে ঋষি মনু বাস করতেন। দেবাপি এখানে তাঁর সন্ন্যাস করেন। এখানে কৃত্যযুগে মনু এবং দেবাপি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর

উদ্ভব ঘটান। এখানে মনুর জাতি সমগ্র কৃত, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে শাসকদের জন্য দায়ী থাকেন।

কমলা : এটি গঙ্গার ওপর দিককার একটি উপনদী। এর নীচের গতি ঘুঘরী নামে পরিচিত। এটি নেপালের মহাভারত পর্বতশ্রেণিতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ পূর্ণিয়ার করগোলায় গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কমলার ডানদিকে দুটি উপনদী এবং বামদিকে পাঁচটি উপনদী রয়েছে।

কমাউলি : বারাণসীতে বরুণা এবং গঙ্গার মিলন স্থলের কাছে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায়, মহারাজকুমার গোবিন্দ্রচন্দ্র বিষ্ণুপুরায় তাঁর বিজয় শিবিরে বসে উশিথ গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে ঐ গ্রামটি দান করেন। কান্যকুব্জ এবং তার ওপর নির্ভরশীল অঞ্চল গুলির ওপর গোবিন্দচন্দ্রই তাঁদের রাজত্বের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। এগুলো আসলে দাহলার কালচুরী রাজারা ব্যবহার করতেন। কনৌজের রাজার ২১টি তাম্রলিপি এবং অন্যান্য ৪টি লিপি এই গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

কম্বোজ (কাম্বোজ) : সম্ভবত এরা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল অধিকার করেছিল। ভৌগোলিক ভাবে এদের উত্তরে চিহ্নিত করা হয়। এদের কথা পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী, পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এবং অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতে রয়েছে। মনে হয় কাম্বোজরা এক প্রাচীন বৈদিক উপজাতি ছিল। কারণ, ঋগ্বেদে এদের কথা নেই। যদিও এরা যে বৈদিক আর্যদের মধ্যে পরিগণিত ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কাম্বোজ ভারতের উত্তর পশ্চিমের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল এবং দ্বারকা তাদের রাজধানী ছিল। সিন্ধুর উত্তর পশ্চিমে যে কাম্বোজেরা ছিল—প্রাচীন পারসীক লিপির কাম্বুজিয়রাই ছিল একই কাম্বোজ। ম্যাকক্রিনডলের মতে কাম্বোজ হচ্ছে আফগানিস্থান যা কিনা হিউয়েন সাঙের কাউফু (কেম্বু)! কেউ কেউ বলেন কাম্বোজেরা তিব্বতের কিংবা তার সীমান্ত রাজ্যের লোক। কেউ আবার তাদের রাজপুরায় চিহ্নিত করেন। রঘু কাম্বোজদের পরাজিত করেন। রঘু সুন্দর সুন্দর অশ্ব, মণিমাণিক্য এবং সোনা উপহার পেয়েছিলেন। ভাগবত পুরাণে এটিকে একটি রাজ্য বলা হয়েছে। রাজপুরার কথা বলতে গিয়ে হিউয়েন সাঙ বলেছেন, লম্পা থেকে রাজপুরা পর্যন্ত অধিবাসীরা সাধারণ কর্কশ চেহারার লোক স্বভাব উগ্র। এরা প্রকৃত ভারতবর্ষের অধিবাসী নয়। সীমান্তের নিম্নশ্রেণীর মানুষ। ভি. এ. স্মিথ বলেছেন, স্থানটি হয় তিব্বত কিংবা হিন্দুকুশ। কেউ কেউ বলেছেন, আধুনিক গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশের চারপাশে এই দেশ। কাম্বোজ উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্যে বিখ্যাত ছিল।

কংসভোগ : কংস রাজ্য হিসাবে এটি চিহ্নিত হয়েছে। রাজধানী অসিতঞ্জনা।

কানহাগিরি : এটি কৃষ্ণগিরি (কানহেরি) পর্বত। হিন্দুকুশের পশ্চিমের নিরবিচ্ছিন্ন ভাগটিই কনহাগিরি। আধুনিক ভূগোলবিদদের মতে, প্রকৃত হিমালয়ের অনেকপূর্বেই কারাকোরাম পর্বত উঁচু হয়েছিল। এই পর্বতটি হারসিনিয়ান যুগের এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সময় এটি যথেষ্ট ভাঁজ খেয়েছিল ও চ্যুতির জন্ম দিয়েছিল।

কণ্খল : গঙ্গা এবং নীলধারার সংগমে—হরিদ্বার থেকে ২ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। বিষ্ণুস্মৃতি, যোগিনীতন্ত্র ও কালিদাসের মেঘদূতে স্থানটির উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণের

দক্ষযজ্ঞের স্থান। পদ্মাপুরাণ এটিকে একটি তীর্থস্থান বলেছে।

কন্বমুণ্ডা : হিমালয়ের একটি হ্রদ।

কণ্ব আশ্রম : সাহারান পুর জেলা ও অযোধ্যার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া মালিনী নদীর তীরে ধর্মারণ্য বা শকুন্তলার প্রতিপালক কন্বমুনির আশ্রম ছিল। আশ্রমটি হরিদ্বারের ৩০ মাইল পশ্চিমে ছিল।

কপিলাবস্তু (বিয়া-ওয়েই-পো-যুহে) : বুদ্ধ যাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই শাক্যদের রাজধানী ছিল এটি। স্থানটি কপিলাপুরা বা কপিলাহয়পুরা নামেও পরিচিত ছিল। মহাবস্তু অনুসারে সাতটি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এই নগরী। দিব্যাবদান কপিলমুনির সঙ্গে কপিলাবস্তুকে যুক্ত করে। লই-বিং-চুর মতে এই নগরীতে কিছু উপাসক ও ২০টি শাক্য পরিবার বাস করত। এই নগরীর অধিবাসীরা ধর্মীয় ব্যাপারে খুবই উৎসাহপ্রবণ এবং আজও তা রয়েছে। ভগ্নস্তূপগুলিকে তারা সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করেছিল। বিখ্যাত রুমিনদেই স্তম্ভ—লুম্বিনী উদ্যান এবং বুদ্ধের জন্মস্থান নির্দেশ করে। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, লুম্বিনী গ্রামের অদূরে এবং নেপাল সীমান্তের বস্তি জেলার উত্তরে পিপরাওয়ার মধ্যবর্তী কোনও স্থানে কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। রিজ ডেভিস টিলাউরা কোটকে প্রাচীন কপিলাবস্তু বলে চিহ্নিত করেন। পি. সি. মুখার্জী রিজ ডেভিসকে সমর্থন করে বলেন, তাউলিবের ২ মাইল উত্তরে—যা কিনা তরাইয়ের স্থানীয় প্রশাসনের মুখ্য কার্যালয়, নেপালী গ্রাম নীগলিবের ৩$\frac{1}{2}$মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং গোরখপুরের উত্তরে নেপাল-তরাই অঞ্চলে ছিল কপিলাবস্তু। রুমিনদেই কপিলাবস্তুর মাত্র ১০ মাইল পূর্বে এবং ভগবানপুরার ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মহাবস্তু কপিলাবস্তু স্থাপনের একটি কাহিনী উপহার দেয়।

ফা হিয়েনের কথা অনুযায়ী, নগরের লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল। নানান স্থানে ছিল স্তম্ভ। হিউয়েন সাঙের মতে রাজ্যটি আয়তনে ছিল ৪০০০ লী। গ্রাম ছিল খুব অল্প এবং প্রায় জনশূন্য। ভিন্ন ধর্মীদের জন্য দেবমন্দির ছিল। বুদ্ধের মহানির্বাণের পর কপিলাবস্তুর কাছাকাছি বা কপিলাবস্তুতে স্তূপ এবং মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। চৈনিকরা যে নগরটিকে কাই-নি-লো-ফা-সেস-টি বলে জানত তার কোন প্রধান শাসক ছিল না। স্থানটি উর্বর, আধিবাসীরা নম্রবিনয়ী ছিল। নগরে সংস্থাগার ছিল। সেখান থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো হত। কপিলাবস্তু নগর ও কোলিয়দের নগরের মধ্যবর্তী রোহিণী নদীর জল একটি বাঁধেই ধরা হত। ললিতবিস্তার অনুযায়ী কপিলাবস্তু একটি বড় নগর—উদ্যান, বাজার এবং সুশোভিত পথে পূর্ণ ছিল। চারটি নগরতোরণ এবং সারা নগর জুড়ে রক্ষীস্তম্ভ ছিল। এটি পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকদের আবাসস্থল ছিল। নগরের মন্ত্রীরা বুদ্ধিমান ছিল। অযৌক্তিক কোনও কর ছিল না। দারিদ্র ছিল না। কেবল মাত্র ছিল ক্রমবর্ধমান উন্নতি।

রুমিনদেই স্তম্ভলিপি অনুসারে বুদ্ধের জন্মস্থানকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য স্বয়ং অশোক এখানে এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধের জন্মস্থানে একটি প্রস্তরস্তম্ভ বসান। তিনি লুম্বিনীগ্রামকে করমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। গ্রামের জনসাধারণকে উৎপন্নের এক অষ্টমাংশ কর দিতে বলেন। (এমনিতে ছিল এক ষষ্ঠাংশ)

কপিশা (চৈনিক কা-পি-শি) : এটি প্লিনির কাপিসসা এবং সোলিনাসের কাফুসা।

টলেমির মতে এটি কাবুলের ১৫৫ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত ছিল। জুলিয়েন মনে করেন, কোহিস্তানের উত্তর সীমান্তে পানজশির ও তাগাও উপত্যকা নিয়ে কপিলা গঠিত ছিল। হিউয়েন সাঙ অনুযায়ী দেশটি আয়তনে ৪০০০ লীর বেশি ছিল। এখানে যব, গম, বার্লি, ফল এবং কাঠ উৎপাদন করা হত। অধিবাসীদের ভাষা উদ্ধত, তারা ছিল নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। অধিবাসীরা 'ফারের' পোষাক-আশাক পরত। তারা সোনা, রূপা এবং তামার মুদ্রা ব্যবহার করত। রাজা ছিল একটি ক্ষত্রিয়। তিনি প্রজা বৎসল ছিলেন। প্রতি বছর তিনি রূপো দিয়ে বুদ্ধের এক আঠারো ফুট উঁচু মূর্তি তৈরি করাতেন। মোক্ষ মহাপরিষদ নামে একটি সভা আহ্বান করতেন, দরিদ্র এবং হতভাগ্যদের ভিক্ষা দিতেন। সেখানে একটা বিহার, স্তূপ, সঙ্ঘারাম এবং দেবমন্দির ছিল। ৬০০০ ভিক্ষু (বেশি মহাযান পন্থী) একশটি বিহারে বসবাস করতেন

কণিশ : কাফির হতে পারে যা থেকে আধুনিক কাফ্রিস্তান। একটি বড় বিহারে ৩০০ জন হীনযান মতাবলম্বী ভিক্ষু ছিলেন।

কর : এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি সিরাথুর ৫ মাইল উত্তর পূর্বে এবং এলাহাবাদের ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

কর্মসাধর্ম : কুরুদেশের এই ছোট্ট নগরটি বুদ্ধ পরিদর্শন করেছিলেন।

কর্ণিকাচল : মেরুপর্বতের নাম।

কৌশাম্য পুরা : অজয়গড়ের প্রস্তরলিপিতে এটির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত কৌশামপুরা কৌশাম্বী বা কোসমেরই নাম।

কৌশিকী : এটি আধুনিক কুশী নদী বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। রামায়ণ এটিকে হিমালয় থেকে উৎপন্ন একটি বড় নদী বলেছে। ভাগবতপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে নদীটির উল্লেখ রয়েছে। নেপালের পূর্ব ভাগে চারটি নদীর নদীর এক মিলিত ধারা রূপে কোশী নদীর দেখা মেলে। চারটির তিনটি নদী তিব্বতে উৎপন্ন। এটি কোশী নদী নামেও পরিচিত। সম্ভবত কোসসোয়ানাস নদী যার কথা মেগাস্থিনিস অনুযায়ী এরিয়ান তাঁর ইন্ডিকা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। গঙ্গার উপনদীর মধ্যে এটিই নাব্য। ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের মতে এটি খরস্রোতা। নদীটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে আয়েত্রী ও তিস্তার জলে পূর্ণ করতোয়ার সঙ্গে মিশেছে।

কবিলাস : শিবের আবাসভূমি কৈলাস পর্বত।

কাকমদি : জৈন পট্টাবলী এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে অনুসারে এটি কাকন্দি। অবস্থিতি অজ্ঞাত। কাকংদিতে ঋষি কাকন্দ বাস করতেন।

কালকারাম : এটি সাকেতের এক বিহার। বুদ্ধ এখানে একবার বাস করেছিলেন। উদ্যানটি কালক নামে এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে দান করেছিলেন।

কালঞ্জর : উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার একটি শৈল দুর্গ। একদা চান্দেল্যদের এটি একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল।

কালিন্দী : যমুনা দেখুন।

কাম-আশ্রম : সরযূ ও গঙ্গার সংগমে ছিল এই আশ্রম। কথিত আছে মহাদেব তাঁর ত্রিনেত্রের আগুনে মদনকে এখানে ভস্ম করেছিলেন।

কামগাম : শাক্য রাজ্যের পূর্ব দিকে কোলিয় দেশের রাজধানী।

কাম্পিল্য : (বৈদিক কামপিলা। পালি—কম্পিল্ল) এটি দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী। রামায়ণ বলেছে, এটি ইন্দ্রের আবাসভূমির মতোই সুন্দর। মহাভারতেও এটিকে দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী বলা হয়েছে। কিন্তু জাতকে ভুলক্রমে এটিকে উত্তর পাঞ্চালের বলা হয়েছে। পাণিনী এই প্রাচীন নগরটি উল্লেখ করেছেন। জৈনদের এটি একটি পবিত্রভূমি। একটি নারী সম্পর্কিত 'কাম্পল্যবাসিনী' শব্দটি তৈত্তরীয় সংহিতা, মৈত্রায়নি সংহিতা, তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে। ওয়েবার এবং জিমার একে পাঞ্চালের রাজধানী বলে চিহ্নিত করেছেন। জৈন ওববাইয়া সূয়তে এর উল্লেখ রয়েছে। অবশ্যক নিঝ্ঝুটি বলে এটি তের জন তীর্থঙ্করের জন্মস্থান।

বদায়ূন ও ফারুকাবাদের মধ্যবর্তী পুরোন গঙ্গার তীরে আধুনিক কাম্পিলকে কাম্পিল্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাভারত এবং জৈন বিবিধতীর্থকল্প নিশ্চিতভাবে এটিকে গঙ্গার তীরে বলেছে। এন. এল. দের মতে এটি ফারুকাবাদ জেলার ফতগড়ের ২৮ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। এটি কাইমগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে। দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীর সয়ম্বরসভা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা কৃতবর্মণ ও রানী সোনাদেবীর পুত্র বিমলনাথ—তেরতম তীর্থঙ্করের জীবনের পাঁচটি শুভ ঘটনা এখানেই ঘটে। এরজন্য এই নগর পঞ্চকল্যাণক বলেও প্রসিদ্ধ। জৈন সন্ন্যাসী আরশমিত্র—কৌদিন্য ও গরদবালির শিষ্য এখানে মুক্তি লাভ করেন। এখানে পৃস্থি চম্পার রাজা কাম্পিখ্য গাগলী গৌতম কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। কারোর মতে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এখানে জন্মেছিলেন।

অনেক নামকরা রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন। দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ, ব্রহ্মদত্ত, হর্যবের পুত্র কাম্পিল্য, অজমীঢ় বংশের রাজা নিপের পুত্র সমর এখানে রাজত্ব করেছেন। কাম্পিল্যের রাজা সঞ্জয় রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। অনেক সৎ এবং অসৎ রাজাও এখানে রাজত্ব করে গেছেন। আধুনিক কাম্পিল শহরে দুটি জৈন মন্দির রয়েছে।

কাঞ্চন পর্বত : এটি উত্তর হিমালয়।

কাঞ্চনগুহা : হিমালয়ের একটি গুহা।

কান্যকুব্জ : গাধিপুরা, কুশস্থল এবং মহাদয় বলেও স্থানটি পরিচিত ছিল। এটি আধুনিক কনৌজ। ঋষি বিশ্বামিত্র নগরটি পরিদর্শন করেছিলেন। বিনয়পিটক অনুসারে, শ্রদ্ধেয় অর্হৎ রেবত কান্নকুজ্জ বা কান্যকুব্জ পরিদর্শন করেছিলেন। ভগবতপুরাণ অনুসারে এটি অজামিলের নগর। পরশুরাম এই নগর জয় করেছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। বাণের হর্ষচরিতে বলা হয়েছে রাজ্যশ্রী নামে কান্যকুব্জের জনৈক রাজপুত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পাঞ্চালে কান্যকুব্জ নগর অবস্থিত ছিল। ৮৬৬ চেদি সংবতের জাজল্লদেবের রত্নপুরের প্রস্তর লিপিতে বলা হয়েছে : জাজল্লদেবের সঙ্গে চেদি শাসকের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল এবং কান্যকুব্জের রাজপুত্র জেজাভূতিক তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। খালিমপুরে আবিষ্কৃত এক তাম্রলিপি বলে, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু এবং যবনরাজেরা চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একাদশ

শতাব্দীর শেষ ভাগে গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণদেব কান্যকুব্জ অধিকার করেন। সুস্থিত বর্মণ মৌখারির বংশধর অবন্তীবর্মণ ও গ্রহবর্মণের অধিকারে ছিল কান্যকুব্জ। কান্যক্যুব্জর প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল কুলুসপুরা। এটি বিশ্বামিত্রের জন্মস্থান।

পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়েন এখানে হীনযান অধ্যুসিত দুটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ এই নগরীতে ১০০টি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেখেছিলেন। তাঁর মতে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে ছিল কনৌজ—কানিংহাম অনুযায়ী পূর্ব তীরে নয়। এই রাজ্যের পরিধি ছিল ৪০০০ লী। কান্যক্যুব্জর চারপাশে শুরুখাত এবং উঁচু উঁচু রক্ষীস্তম্ভ ছিল। অধিবাসীরা সুখী, সৎ, আবহাওয়া মোটামুটি ভাল ছিল। অলংকৃত এবং উজ্জ্বল রঙের পোষাক ব্যবহৃত হোত। রাজা সৎ, প্রজা বৎসল এবং কর্মঠ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের আগে কান্যক্যুব্জ মৌখরী রাজাদের অধীনে ছিল। ত্রিলোচন পালের সুরাটের এক দানপত্রে কান্যক্যুব্জে জনৈক রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূটেরা যে কান্যক্যুব্জের আশপাশেই থাকত তা লক্ষণপালের বদায়ূন শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে। মালব, কোশল এবং কুরুরাজ্য মনে হয় কনৌজের গুর্জর রাজাদের অধীনে ছিল। কনৌজের রাজাকে পরাজিত করে ধংগ্ন একচ্ছত্রাধিপতি হন। গহদবাল রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পাঁচটি তাম্রলিপি কনৌজে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপিতে কনৌজে মহারাজধীরাজ মহেন্দ্রপালের রাজত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গোয়ালিয়ার প্রশস্তিতে বলা হয়েছে, কনৌজরাজ ভণ্ডিকুলের কাছ থেকে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নেয়। ওয়ানি এবং বন্ধনপুর তাম্রলিপিতে দেখা রাষ্ট্রকূট ধ্রুব বৎসরাজকে পরাস্ত করেন। ধর্মপাল কনৌজ জয়ের আশা পরিত্যাগ করেননি যদিও প্রথমবার তিনি পরাস্ত হন। গোবিন্দচন্দ্রের কামাউলি তাম্রলিপিতে ১১৮৪ বিঃ সং-এ উল্লেখ রয়েছে কৌশিক, গাধিপুরা এবং কান্যকুব্জ—এগুলিকে আধুনিক কনৌজের নাম বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই গোবিন্দচন্দ্রই কান্যক্যুব্জর ওপর তাঁর বংশের অধিকার পুনরায় স্থাপন করেন।

কারপচব : যমুনার তীরে একটি স্থান।

কারাপথ : কালিদাসের রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। মনে হয়, এটি মল্ল রাজ্যে অবস্থিত ছিল।

কারিতলাই : জব্বলপুর জেলার জুরওয়ারার ২৯ মাইল উত্তরের একটি ছোট গ্রাম।

কারোতি ঃ শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখিত হয় একটি নদী বা স্থান যেখানে তুর কাবশেয় একটি সুন্দর যজ্ঞবেদি রচনা করেছিলেন।

কাশী ঃ ভারতের তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম কাশী বা বারাণসী। ষোড়শ মহাজন পদের অন্যতম ছিল কাশী। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, ভাগবত্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, যোগিণীতন্ত্রে ও গোবিন্দচন্দ্রের কামাউলি লিপিতে কাশীর উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসীর নাম লুডারের তালিকায় রয়েছে। জৈন উবাসগদশাল বর্ণিত জিয়সত্তুর রাজ্যে কম্পিল্লনগর, পলাশপুর ও অশাভির মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন যুগে এর বিভিন্ন নাম ছিল। (যেমন সুরুধা, সুদনশান, ব্রহ্মবধধন, পুপ্পাবতী, রম্ম ও মোলিনী)। কূর্মপুরাণ অনুযায়ী এটি বরণা ও অসী নদীর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। গঙ্গার উত্তর তীরে এলাহাব্যদ

থেকে ৮০ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। বরণা ও অসী নদী নগরটিকে উত্তর ও দক্ষিণে বেড় দিয়ে রয়েছে এবং তাদের যুগ্মনাম থেকেই বারাণসীর উৎপত্তি। অথর্ববেদে উল্লিখিত ছোট্ট বরণাবতী নিঃসন্দেহে বরণা। বিষ্ণুস্মৃতির কাশীনগর বা কাশীপুরাই বারাণসী। জাতক অনুযায়ী এই রাজ্যের বিস্তার ছিল ১২ যোজন। এই নগরটি শূলপানি মহাদেব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে এই নগরে এসেছিলেন। শ্রাবস্তী থেকে সুবিধাজনক পথে এখানে আসা যায়। এটি একটি জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী এবং শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। শ্রাবস্তী ও তক্ষশিলার সঙ্গে এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বারাণসীর বহুল উল্লেখ রয়েছে। আনন্দরচিত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের জন্য নির্দিষ্ট বড় বড় নগরগুলির মধ্যে বারাণসীর নাম ছিল। সারনাথের এক লিপিতে এই নগরের কিছু ধর্মীয় অট্টালিকার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

জৈন বিবিধতীর্থকল্প অনুযায়ী বারাণসীকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) দেব বারাণসী : বিশ্বনাথের মন্দির—সেখানে ২৪টি জিনপট্ট দেখা যাবে। (২) রাজধানী বারাণসী : এখানে যবনেরা বাস করত। (৩) মদন বারাণসী। (৪) বিজয় বারাণসী।

চৈনিকরা বারাণসীকে পো-লো-নি-সেস বলে জানত। নগরে ৩০টি সঙ্ঘারাম এবং ১০০টি দেবমন্দির ছিল। বুদ্ধপ্রেমীর সংখ্যা কম ছিল। বারাণসীর কাছে চুণ্ডখিল (চুণ্ডবিল) নামে একটি অঞ্চল ছিল যার উল্লেখ ভারহুত লিপিতে রয়েছে।

গাহ্দাবালের কিছু তথ্য থেকে জানা যায় যে উত্তরে বরণা ও গঙ্গার সংগমের কাছে আদি কেশবঘাট বারাণসীর অংশ বলেই বিবেচিত হোত। বারাণসীর দক্ষিণ সীমা নিশ্চয় অসী ও গঙ্গার সংগমস্থল অবধি বিস্তৃত ছিল। জয়চন্দ্রদেবের রাজত্বকালে বুদ্ধগয়ার এক বৌদ্ধলিপিতে কাশীর উল্লেখ রয়েছে। মাধাই নগর দানপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে লক্ষ্মণ সেন কাশীর এক রাজাকে পরাজিত করেন। চন্দ্রদেবের চন্দ্রাবতী দানপত্রে দেখা যায়, গাহ্দাবাল রাজ্য সরযূ ও অযোধ্যার ঘর্ঘরা সংগম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বারাণসীর উত্তর সীমায় কোশল, পূর্বে মগধ, পশ্চিমে বৎস রাজ্য। বৈদিক সাহিত্যে, মহাকাব্যে কাশীর উল্লেখ বহুবার করা হয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দেখা যায়, বারাণসী নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দিবোদাস পরাজিত হয়ে বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দেখা যায় যে ভীমসেনের পুত্র কাশীর রাজা দিবোদাসের একটি পুত্রের নাম ছিল প্রতর্দন। হরিবংশে দিবোদাসের আর এক রকমের জীবনী পাওয়া যায়। মহাভারত ও পুরাণে কাশীর বহুরাজার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণকর্তৃক বারাণসীকে বহুবার অগ্নিদগ্ধ করার কথা রয়েছে। জৈনদের মতে পার্শ্বনাথ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের কথাতেও কাশীর উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু, জৈন সাহিত্য ছাড়াও জাতক কাহিনীগুলোয় কাশী সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময় কাশী তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এটি কোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়। মগধের বিম্বিসারের সঙ্গে কন্যা কোশলা দেবীর বিবাহের সময় প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল যৌতুক হিসাবে কাশীগ্রাম বিম্বিসারকে দান করেন। শেষ পর্যন্ত কাশী মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কাশীর উৎসাহী যুবকেরা শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় যেত। বুদ্ধ বহুবার কাশীতে

এসেছেন। ইসিপতন মৃগদাব নগরেব কাছেই ছিল। বোধিলাভ করার পর বুদ্ধ এখানেই তার ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। বারাণসীর বহুলোককে তিনি ধর্মান্তরীত করেন।

কাসিয়া : গোরখপুরে জেলার গোরখপুরের ৩৪ মাইল পূর্বে পদ্রাউনা তহশিলের প্রস্তর মূর্তির গায়ের লিপিতে এই গ্রামের নাম পাওয়া যায়। কাসিয়া মহকুমার সদর কার্যালয় গোরখপুর থেকে ৩৪ মাইল পূর্বে, দেওরিয়ার ২১ মাইল উত্তর পূর্বে এবং পদ্রাউনার ১২ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে একটি বড় গ্রামে। মল্লরাজ্য দুভাগে বিভক্ত ছিল। রাজধানী ছিল কুশিনারা এবং পাবা। কেউ কেউ, ছোট গণ্ডকের তীরে পাবাকেই কাসিয়া বলে চিহ্নিত করেন। কাসিয়ার ধ্বংস স্তূপে ১৮৭৬ সালে অনুসন্ধান চালাবার সময়ে নির্বাণ স্তূপটি বেরিয়ে আসে। কাসিয়ার অন্যান্য অংশে খননকার্য চালিয়ে অনেক প্রাচীন অট্টালিকা এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন জিনিসপত্র পাওয়া গেছে।

কাশ্মীর : বীরপুরুষ দত্তের নাগার্জুন কোণ্ডার লিপিতে টলেমির কাসপেরিয়া বা কাশ্মীরের নাম উল্লেখ রয়েছে। নগরটি পাণিনী, পতঞ্জলির পরিচিত ছিল। যোগিনীতন্ত্র এবং বৃহৎ সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। এই দেশটি পাঞ্জাবের উত্তরে। এই নগর সাহিত্য, ধর্ম এবং দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন দেখেছে। দিব্যাবদান এই সুন্দর নগরটির কথা উল্লেখ করেছে। অবদান শতক এবং বোধিসত্ত্ববদানকল্পলতায় এই নগরটিকে মূলত 'নাগ' অধ্যুষিত বলা হয়েছে। 'স্রগধরাসেতাত্রম'-এর লেখক কাশ্মীরের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। আনন্দ মধ্যয়নটিক নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রচারের জন্যে কাশ্মীরে পাঠিয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী এই নগরে একদা হীরা পাওয়া যেত।

আয়তনে কাশ্মীর রাজ্য ৭০০০ লী এবং সুউচ্চ পর্বত দিয়ে চারদিকই ঘেরা। রাজধানীর পশ্চিম সীমানায় একটি বড় নদী ছিল—নিশ্চিতভাবে এটি বিতস্তা। ভূমি উর্বর এবং ফুল ফলে শোভিত। নানান আয়ুর্বেদিক লতাগুল্ম এখানে জন্মাত। আবহাওয়া ঠাণ্ডা এবং কঠোর। নাগরিকেরা দেখতে সুন্দর। অধিবাসীদের মধ্যে দেবপূজক ও বৌদ্ধ উভয়ই ছিল। স্তূপ ও সঙ্ঘারাম এখানে ছিল। এটি গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসভার পরে মোদগলিপুত্রতিস্সকে ধর্মপ্রচারের জন্যে কাশ্মীরে পাঠান হয়েছিল। অশোকের সময় এটি মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কাশ্মীরের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে দুটি মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—মার্তন্ড এবং পায়েক। মার্তন্ডকে সূর্যমন্দির বলা হোত। ইসলামাবাদের তিনমাইল পূর্বে পাহাড়ের এক ঢালে এটি অবস্থিত। অষ্টম শতাব্দীতে ললিতাদিত্য এই বিশাল মন্দিরটি তৈরি করান। পায়েক শ্রীনগরের দূরে নাউনাগ্রি কারেওয়ায় এবং ঝিলম নদীর পূর্বতীরে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি নান্দনিক রূপরেখার দিক দিয়ে কাশ্মীরের সব মন্দিরের সেরা। কাশ্মীরে শৈবদর্শনের একটি বিশেষ ধারা বর্তমান ছিল যা শংকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত মতবাদের মতোই। দক্ষিণ ও পূর্ব কাশ্মীর হিন্দুদের ছিল এবং পশ্চিম নানান রাজাদের। উত্তর এবং পূর্বের কিছু অংশ খোটানের তুর্ক এবং তিব্বতের অধিকারভুক্ত ছিল। আলবেরুনী বলেছেন, কাশ্মীরে ভারবাহী পশু বা হাতি ছিল না। অধিবাসীরা পদাতিক ছিল। সম্ভ্রান্তেরা পাল্কী ব্যবহার করতেন। তারা তাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা জানতেন। তাই প্রবেশপথগুলিতে কঠোর প্রহরা থাকত। আগেকার দিনে তারা একজন বা দুজন বিদেশীকে প্রবেশ করতে দিতেন। বিশেষ

করে ইহুদিদের। সবচেয়ে পরিচিত প্রবেশ পথ বাব্রাহান—ঝিলাম ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। আদিস্থান (শ্রীনগর) তাদের রাজধানী ছিল। আলবেরুনী লোহার দুর্গের কথা বলেছেন। যা বর্তমান লোহারা দুর্গ বলে চিহ্নিত। পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণির দক্ষিণ ঢালে লোহারিন বলে স্থানটিকে সনাক্ত করা হয়েছে।

কাত্রিপুরা : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এটির উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত কুমায়ুন, আলমোড়া, গারওয়াল ও কাংড়া জুড়ে এই রাজ্যটি ছিল।

কেদার : মহাভারত ও বিষ্ণুস্মৃতিতে কেদার তীর্থের উল্লেখ রয়েছে। গণপতির সময়কার দুটি উৎকীর্ণ লিপিতেও এর উল্লেখ রয়েছে। যোগিনীতন্ত্র এর উল্লেখ করেছে।

কেকয় : মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে উল্লেখিত কেকয় দেশকে পাঞ্জাবের সাহপুর জেলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বায়ুপুরাণ এটিকে একটি জনপদ বলেছে। গোমন্তের কেকয় অবরোধকালে কেকয় রাজকুমারেরা উত্তরে সরে গিয়েছিল। কৌরবদের বিরুদ্ধে ভারত যুদ্ধের সময় পাঁচজন কেকয় রাজকুমার পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছিল। রামায়ণ অনুযায়ী কেকয় দেশ গান্ধার সংলগ্ন এবং বিপাশা (বিয়াস) ছাড়িয়ে ছিল। কানিংহাম ঝিলমের তীরে গিরজাক বা জালালপুরকে কেকয়দেশের রাজধানী বলে চিহ্নিত করেছেন। পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী ও পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। রাজশেখর 'তাঁর কাব্যমিমাংসায় ভারতের উত্তর অংশে শক, হুণ, কাম্বোজ, বাহ্লিক ইত্যাদি দেশের সঙ্গে কেকয় দেশের উল্লেখ করেছেন।

স্ট্র্যাবোর মতে এটি একটি বিস্তৃত ও উর্বর দেশ ছিল। নগরের সংখ্যা প্রায় ৩০০টি।

কেসপুত্ত : অঙ্গুত্তর কেসপুত্তকে কোশলে অবস্থিত বলেছে। বিম্বিসারের সময়ে এইস্থানের অধিবাসী কালামাস একজন প্রজাতন্ত্রী ছিলেন। দার্শনিক আলাড় কেসপুত্তের লোক ছিলেন।

কেতকবন : এটি কোসলের নলকপান গ্রামের কাছে ছিল।

কেতুমতী : রাজা বেস্সন্তর স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে এই নদীর তীরে বিশ্রাম করেছিলেন। তিনি নদী পার হয়ে নালিক পাহাড়ে গিয়েছিলেন। এরপর উত্তরে বাঁক নিয়ে মুকালিন্দ হ্রদে পৌছেছিলেন।

খাণ্ডব : তৈত্তরীয় আরণ্যক অনুসারে এটি কুরুক্ষেত্রের একটি সীমানা। মহাভারতের বিখ্যাত খাণ্ডববন বলে এটিকে মনে করা যেতে পারে। অর্জুন এই বনকে দগ্ধ করেছিলেন। পঞ্চবিংশ আরণ্যকে এই বনের উল্লেখ রয়েছে।

কীর : ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। কিয়েলহর্নের মতে এটি উত্তরপূর্ব ভারতে ছিল। পাল বংশের ধর্মপাল এই রাজ্যের অধিবাসীদের পরাস্ত করেন। কীর রাজ বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে কনৌজের রাজকীয় সম্মেলনে আসেন। খাজুরাহ লিপিতে জানা যায় যে কীরের রাজা ভগবান, ভূতের কাছ থেকে বৈকুণ্ঠের মূর্তি লাভ করেন। কর্ণের রেওয়া প্রস্তর লিপিতে বলা হয়েছে, কাংড়া উপত্যকার বৈজনাথের কাছে ছিল কীর রাজ্য।

কীরগ্রাম : কাংড়া জেলার বৈজনাথ বলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে লিঙ্গ মন্দির ছবির মতো প্রাচীন বিন্দুক (বর্তমান বিন্দু) নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিরাত : এটি হিমালয়ে এবং সম্ভবত তিব্বতে অবস্থিত। টলেমির মতে কিরাতদের উত্তরাপথে দেখা গেছে। পূর্বদিকেও তাদের বসতি ছিল। টলেমি কিরাতদের দেশকে কিরহাদিয়া বলেছেন। কিরহাদিয়াদের দেশ কিরহাদাইকে 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী'তে বলা হয়েছে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত। ভরত এদের পূর্বদেশবাসীদের পরাস্ত করেন। সাগরও এদের পরাজিত করেন। টলেমির কিরহাদোই বা ইরহাদোই শুধুমাত্র গাঙ্গেয় ভারতে ছিল না তা পূর্বের আরও দেশে প্রসারিত ছিল। প্লিনি ও মেগাস্থিনিস স্কাইরিটেস বলে কিরাতদের উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিসের মতে এরা যাযাবর শ্রেণির লোক। মহাভারতে যবন, কাম্বোজ, গান্ধার এবং উত্তরাপথের অন্যান্য বর্বরদের সঙ্গে এদের উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, এরা আর্যশ্রেণির বাইরের লোক। বীরপুরুষদত্তের নাগার্জুন কোণ্ডার লিপিতে এদের উল্লেখ রয়েছে। উত্তরাপথের কিরাতদের অপরাধ প্রবণ এবং শিকারী মনোবৃত্তির লোক বলে বলা হয়েছে। শিকারী এবং শকুনের সঙ্গে এরা তুলনীয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কিরাত রমণীদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সহবাসের কথা বলা হয়েছে।

কিরথার : এই পর্বত সুলেইমানের দক্ষিণে বেলুচিস্তানের সিং ও ঝালাওয়ান দেশের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত। এটি মূলা নদীর গিরিখাতের সমান্তরালে ১৯০ মাইল ব্যাপী কয়েকটি পর্বতশ্রেণিতে প্রসারিত হয়েছে।

কিটাগিরি : এটি একটি দেশ।

কোশল : পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ীতে উল্লিখিত ষোড়শ মহাজনপদের একটি হল কোশল। ভাগবত পুরাণ এটিকে একটি দেশ বলে উল্লেখ করেছে। এটি রাম এবং তার পুত্র কুশের রাজ্য ছিল। উত্তর কোশলের অধিবাসীরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভাগ নিয়েছিল। উত্তর কোশলের রাজা সূর্যগ্রহণে সামন্তপঞ্চকে গিয়েছিলেন। পরশুরাম উত্তর কোশলের এক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কুশের রাজধানী ছিল কুশস্থলী। কোশল রাজ্য কুরু ও পাঞ্চালদের পূর্বে এবং পশ্চিমে বিদেহ—মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত সদানীর, সম্ভবত বড় গণ্ডক নদী। কোশলরা সূর্যবংশীয় এবং সম্ভবত মনু থেকে ইক্ষ্বাকুর মাধ্যমে তারা উৎপন্ন হয়েছিল। দশকুমারচরিতে কোশলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এদের রাজা ছিল কুসুমধন্ব এবং তাঁর স্ত্রী ছিল সাগরদত্তা। ইনি আবার পাটলিপুত্রের বণিক বৈশ্রবণের কন্যা ছিলেন। বৌদ্ধেরা জানতেন যে কোশলরা ইক্ষ্বাকু বংশীয়। রামায়ণের যুগের কোশল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রামের বনবাস থেকে আমরা কোশল রাজ্যের ব্যাপ্তি অনুমান করতে পারি। রামপরবর্তী সময়ে সম্ভবত এ সাম্রাজ্য পুত্র এবং ভ্রাতাদের পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রকৃত কোশল দেশের অংশটুকু দুভাগ করা হয়। রামের পুত্র কুশ দক্ষিণ কোশলের রাজা হয়ে অযোধ্যা থেকে রাজধানী সরিয়ে বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণির কাছে কুশস্থলী নামে নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। অপর পুত্র লব উত্তর কোশলের রাজা হয়ে শ্রাবস্তীতে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। কোশলের পরবর্তী ইতিহাস প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে জানা যায়। কোশল আর কাশীর মধ্যে শত্রুতা ছিল। দুটি রাজ্য পাশাপাশি থেকেও সমান শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। পরবর্তী কালে কাশী কোশলের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সাহিত্যে কোশলের অনেক নর-নারীর গল্প রয়েছে

এবং তাদের মধ্যে অনেকেই রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে উত্তর কোশলের নাম হয় শ্রাবস্তী যাতে দক্ষিণ কোশল থেকে একে পৃথক করা সহজ হয়।

কোশাম্বী : কোশাম্বী বংশ বা বৎসের রাজধানী ছিল। এখানে ৬ষ্ঠ তীর্থঙ্কর জন্ম গ্রহণ করেন। এলাহাবাদ জেলার কোসাম অর্থাৎ কৌশাম্বীতে একটি প্রস্তর স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা যায় বৈশ্রবণ শ্রাবস্তীর অন্যতম শাসক ছিলেন। ভদ্রমঘের রাজত্বের শিলালিপি প্রাচীন কৌশাম্বীর স্থানে খনন কাজ চালাবার সময় পাওয়া গেছে। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এই নগরের উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক মতে বৎসের রাজা উদয়নের রাজবংশের উৎপত্তি পুরু থেকে। একদা কুরু রাজধানী—হস্তিনাপুরের রাজসভায় বৎসের জন্য রাজকীয় আসন সংরক্ষিত ছিল। কৌশাম্বী অতীতের বিখ্যাত বাণিজ্যিক পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামস্থল ছিল। এখান থেকে পথ সাকেত ও শ্রাবস্তীকে যুক্ত করত। অন্যদিকে যুক্ত কবত দক্ষিণে গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈথানকে।

কানিংহাম এলাহাবাদের ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনার তীরে কোসাম কৌশাম্বী বলে চিহ্নিত করেন। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি বলেছেন. রাজ্যটি আয়তনে ৬০০০ লী। রাজধানী ৩০ লী। আবহাওয়া উষ্ণ কিন্তু ভূমি উর্বর। চাল, আখ উৎপন্ন উৎপন্ন হোত। দশটির বেশি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার ছিল। ভিক্ষুরা সকলেই হীনযান মতাবলম্বী। পঞ্চাশটিরও বেশি দেবমন্দির ছিল। অসংখ্য অবৌদ্ধবাস করত।

বারাদুর্গের তোরণে একটি দানপত্র উৎকীর্ণ করা রয়েছে তাতে দেখা যায়, ১০৯৩ সম্বৎ (১০৩৬ খ্রিঃ)-এর পভোনার জনৈক মথুরা-বিকটকে কৌশাম্বী মণ্ডলের পয়লাস গ্রামটি চিরস্থায়ী ভাবে দান করেছেন কনৌজের শেষ প্রতিহার বংশীয় মহারাজাধিরাজ যশঃপাল। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে কৌশাম্বীর উল্লেখ রয়েছে। তীর্থঙ্করদের জন্মের জন্য এখানকার ভূমি পবিত্র হয়েছে। এখানকার পদ্মপ্রভু মন্দিরে চন্দনবালার মূর্তি দেখা যাবে। এখানে চন্দনবালা মহাবীরের সম্মানে প্রায় ছ'মাস উপবাস করেছিলেন। রাজা প্রদ্যোতের নির্মিত ইঁটের দুর্গ আজও দেখা যায়।

কোশম-ইনাম কোসম-খিরাজ : মঝহান থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং সরাই আকিল থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে যমুনার তীরে এই দুটি গ্রাম অবস্থিত। দুর্গের পশ্চিমে কোশল-ইনাম এবং পূর্বে কোশম-খিরাজ।

কোসিকা : পর্বতটি সম্ভবত হিমালয়ের অদূরেই ছিল।

কোসিকী : এটি গঙ্গার একটি শাখা। এটি কুশী বলে চিহ্নিত।

কোটেরা : এটি একটি পর্বত। এর পাদদেশে দুর্গের এক কোণায় এক সঙ্গে জোট বেঁধে থাকা ১২টি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে।

ক্রৌঞ্চ : তৈত্তরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত একটি পর্বত।

কৃষানগ্রাম : ললিত বিস্তারের মতে এটি কপিলাবস্তুর কাছাকাছি কোথাও ছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানেই সিদ্ধার্থ তাঁর মুকুট-তলোয়ার ত্যাগ করে চুলের ঝুঁটি কেটে ফেলেন।

কৃষ্ণগিরি : এটি কারাকোরাম বা কৃষ্ণপর্বত। পশ্চিমে এটি হিন্দুকুশের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে গেছে। আধুনিক ভূগোলবিদেরা বলেন, এটি আগেই উন্নত হয়েছিল তাই এটি হিমালয়ের থেকেও প্রাচীন। এটি হারসিনিয়ান যুগের। উন্নত হবার কালে পর্বতটি যথেষ্ট ভাঁজ খেয়েছে এবং অনেক চ্যুতির সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রুমু : ঋগ্বেদে বর্ণিত নদীটি আধুনিক কুরুম বলে চিহ্নিত। কুভা বা কাবুলের নীচে এই বৈদিক নদীটি সিন্ধুর একটি পশ্চিমী উপনদী। নদীটি সুলেইমান পর্বতশ্রেণিকে ভেদ করে গেছে।

কুবজানরক : হরিদ্বার বা তার কাছে একটি পবিত্রস্থান। রৈভ্যের আশ্রম এখানে ছিল।

কুভা : সিন্ধুর পশ্চিমী উপনদীগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কিছু লেখকদের মধ্যে এই নদীটিই ভারতের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারণ করেছিল। এটি এরিয়ানের কোফেস, প্লিনির কোফেস এবং আধুনিক কাবুল নদী। এটি সম্ভবত পুরাণ বর্ণিত কুহু নদী এবং টলেমির কোয়া—যার উৎপত্তিস্থল হিসাবে তিনি বলেছিলেন ইমাওস বা হিমাবত। কুভা সুলেইমান পর্বতশ্রেণির মধ্যে একটি উপত্যকা কেটে বেরিয়ে গেছে। এটি আটকের (সং : হাটক) একটু ওপরে সিন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রাংগে কুভার সঙ্গে তার দুটি উপনদী স্বাত (এরিয়ানের সোয়াসটোম, সং : সুবাস্তু) এবং গৌরী (এরিয়ানের গ্যারোইয়া) যা আধুনিক পানজকোরা—স্বাতের একটি উপনদী বলে চিহ্নিত। বায়ু এবং কুর্মপুরাণে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে।

কুহু : কুভার মতই।

কুলু : এটি মহাকাব্যের কুলুত (কিউ-টো) বা কাউলুট। বিতস্তার ওপর দিককার কুলু উপত্যকার সঙ্গে কিউ-লু-টো রাজ্যের একেবারে মিল পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ রাজ্যটিকে জলন্ধরের ৭০০ লী বা ১১৭ মাইল উত্তর পূর্বে বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে অশোক একটি স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। রাজ্যটিতে ২০টি বিহারে ১০০০ জন ভিক্ষু ছিলেন। এঁদের বেশির ভাগ মহাযানপন্থী। বৌদ্ধধর্মের ক্ষীণ অস্তিত্ব ওখানে এখনও দেখা যায়।

কুরুজাঙ্গল : এটি সম্ভবত কুরুরাজ্যের বন্যপ্রাণী অধ্যুসিত অঞ্চল যা সরস্বতীর তীরের কাম্যক বন থেকে যমুনা তীরের খান্ডববন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি কুরুরাজ্যের পূর্বদিকে। বলা হয় এটি গঙ্গা এবং উত্তর পাঞ্চালের মধ্যেকার ভূমি। এটি পরীক্ষিতের রাজ্য। শূক এবং বিদুর এই রাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন। মৎস্যপুরাণ একে পাঞ্চাল রাজ্য বলেছে।

কুরুক্ষেত্র : মহাভারত অনুসারে এই নগর পবিত্র। এর ধূলিকণা পাপ এবং পাপীদের মুক্ত করে। যারা সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃষদ্বতীর উত্তরে এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে তারা যেন স্বর্গেই বাস করছে। কুরু এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। সরস্বতী নদী এর জল সুরবরাহকারী। কুরুক্ষেত্রের সন্ন্যাসীরা দ্বারকা পরিদর্শন করেন। এখানে কৃষ্ণ ১২ বৎসর ব্যাপী যজ্ঞ করেছিলেন, এখানে পরশুরাম সামন্তপঞ্চক বলে একটি হ্রদ খনন করেছিলেন। বামন অবতারের মূর্তির জন্য স্থানটি বিখ্যাত ছিল। যোগিনীতন্ত্র, পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী এবং কালিদাস কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন। সৌরপুরাণও এটিকে পবিত্রস্থান

বলেছে। প্রাচীন কুরুরাজ্য কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বর নিয়ে গঠিত ছিল বলে বলা হয়। অঞ্চলটি সোনাপত, আমিন, কার্নাম এবং পানিপত-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তৈত্তরীয় আরণ্যক বলে, কুরুক্ষেত্রের সীমার দক্ষিণে খান্ডব, উত্তরে তুরঘ্ন পশ্চিমে পরিনাহ (এরিয়ানের প্যারিনোস)। বুদ্ধের সময় এটি ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। কুরুরাজ্য সম্ভবত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কুরুক্ষেত্র, কুরুদেশ এবং কুরুজাঙ্গাল। কুরুক্ষেত্র কুরুদের আবাদ অঞ্চল যা যমুনার পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে ছিল এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যেকার অঞ্চলও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুরুজাঙ্গাল কুরুরাজ্যের পতিত অঞ্চল।—রাজ্যের পূর্বভাগ—সম্ভবত গঙ্গা ও উত্তর পাঞ্চালের মধ্যবর্তী অঞ্চল, বনাঞ্চল কাম্যক বন থেকে শুরু হয়েছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান সম্ভবত কুরুদেশ ছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে কুরুক্ষেত্র পবিত্র স্থান। তার সীমায় বয়ে চলত সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও আপয়া। স্কন্দপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে। কুরুদের প্রান্তর বা দিল্লী অঞ্চলে কুরু এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ভারতের সব রাজ্যই এক একটি পক্ষে যোগদান করেছিল। মনু কুরুদেশের কথা বলেছেন। র‍্যাপসনের মতে, কুরু অধিকৃত ভূমি পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্র ছাড়িয়েও অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কুরুরা নিশ্চয় গঙ্গা-যমুনার দোয়াব-অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল। পূর্ব দিকে ছিল উত্তর পাঞ্চাল, দক্ষিণে দক্ষিণ পাঞ্চাল, এছাড়াও তা পূর্বদিকে প্রয়াগের (এলাহাবাদের) সংগম পর্যন্ত—বৎসভূমির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউয়েন সাঙের সময় বৈশ্যরাজবংশের রাজত্বকালে রাজধানী ছিল থানেশ্বর। ঐ বৈশ্যবংশ রাজত্ব করত দক্ষিণ পাঞ্চালের কিছু অংশে এবং পূর্ব রাজস্থানে। ৬৪৮ খ্রিঃ একজন চৈনিক প্রতিনিধিকে থানেশ্বরে হর্ষবর্ধনের কাছে পাঠান হয়েছিল, তিনি দেখেছিলেন যে সেনাপতি অর্জুন বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে এবং বৈশ্যবংশ মুছে যায়। থানেশ্বরের গৌরব প্রায় ১০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু ঐ সময় গজনীর সুলতান ম্যমুদ থানেশ্বরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরে ১০৪৩ খ্রিঃ দিল্লীর এক রাজা থানেশ্বরের গৌরব পুনরুদ্ধার করলেও কয়েক শতাব্দী ধরে থানেশ্বর যেন একাই থেকে যায়।

কুশপুরা (কুশভবনপুরা) : এটি রামচন্দ্রের পুত্র কুশের নাম অনুসারে। স্থানটি তিন দিকে গুমতি (গোমতী) নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

কুশাবতী : এটি কুশিনারার প্রাচীন নাম। বুদ্ধ এখানে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। গোরখপুরের পূর্বে ৩৭ মাইল দূরে ছোট গন্ডকের তীরে বেতিয়ার উত্তর পশ্চিমে কাশিয়া গ্রামটিই কুশাবতী বা কুশিনারা। কালিদাসের রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে।

কুশিক : এটিই গাবিপুর এবং কান্যকুব্জ (আধুনিক কনৌজ)। গোবিন্দ্রচন্দ্রের কামাউলি দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

কুশিনারা : মল্লদের অন্যতম নগর। বুদ্ধের সময় যে এটি রাজগৃহ, বৈশালী বা শ্রাবস্তীর মতো উন্নত নগর ছিল না—তা বুদ্ধের কাছে আনন্দের কথাতেই পরিষ্কার হয়। জঙ্গলের মধ্যে এই ছোট্ট নগরটিকে ভগবান যেন তাঁর নির্বাণস্থান বলে চিহ্নিত না করেন। চৈনিকরা এই নগরকে বলতেন কিউ-শি-না-কি-ইয়ে-লো। সামান্য সংখ্যক লোকজন বাস করত। রাস্তাঘাট প্রায় পরিত্যক্ত। নগরতোরণের উত্তর পূর্ব কোণায় অশোক

একটি স্তূপ নির্মাণ করান। গ্রামগুলি ছিল নির্জন।

এই নগরে ছিল চুন্দার পুরোন বাড়িটি যেখানে তিনি বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কুশিনারা থেকে পাবার দূরত্ব বেশি ছিল না। এটিও পরিস্কার যে বুদ্ধ শেষবারের মতো রোগাক্রান্ত হয়ে কুশিনারা থেকে পাবায় দ্রুত চলে আসেন। কানিংহামের মতে গোরখপুর জেলার পূর্বে কাসিয়া গ্রামটিই কুশীনারা। একটি আবিষ্কারে মতটি দৃঢ় হয়েছে। এই গ্রামের কাছে নির্বাণ মন্দিরের পেছনে স্তূপের কাছে একটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে যাতে লেখা রয়েছেঃ পরিনির্বাণ-চৈত্য-তাম্রপট্ট বা পরিনির্বাণ চৈত্যের তাম্রপত্র। আবার ভিন্ন ভিন্ন মতও রয়েছে। ভি. এ. স্মিথ প্রথম পর্বতশ্রেণির পেছনে নেপালে কুশিনারা ছিল বলে মনে করেন। রিজ ডেভিস বলেন, যদি আমরা চৈনিক পরিব্রাজকদের বৃতান্ত সঠিক বলে মনে করি ; তাহলে কুশীনারার মল্লভূমি শাক্য রাজ্যের পূর্বে পর্বতের ঢালে, এবং বৃজি-গণরাজ্যের উত্তরে ছিল। কিন্তু কেউ কেউ তাদের রাজ্যটিকে শাক্যদের দক্ষিণে এবং বৃজিগণরাজ্যের পূর্বে ছিল বলে মনে করেন।

দিব্যাবদানতে আমরা দেখি যে অশোক বুদ্ধের মহাপবিনির্বাণ স্থান পরিদর্শন করেন। বিবরণটি শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। বুদ্ধকে কুশিনারা থেকে রাজগৃহে যাবার পথে ককুত্থা নদী পার হতে হোত। কাসিয়ানীর নীচের দিকে আটমাইল দূরে ছোটগন্ডকে গিয়ে পড়েছে এক স্রোতস্বিনী, যার নাম বারাই—প্রাচীন ককুত্থা। কুশিনারার কাছ দিয়ে হিরণ্যবতী বা ছোট গন্ডক বয়ে গিয়েছে গোরখপুর জেলার বড়গন্ডকের আট মাইল পশ্চিম দিয়ে এবং মিলিত হয়েছে গোগরা (সরযূ)র সঙ্গে। এই হিরণ্যবতীর তীরেই ছিল মল্লদের শালবন।

মল্লদের যখন রাজতন্ত্র ছিল তখন কুশাবতী ছিল রাজধানী। কালিদাস রঘুবংশে নগরটির সম্বন্ধে লিখেছেন, জনবহুল। সহজেই ভিক্ষা পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময় এটি যখন গণরাজ্যে পরিণত হয় তখন নাম হয় কুশিনারা। বুদ্ধ নিজেই বলেছেন, কুশিনারাই প্রাচীন কুশাবতী। বুদ্ধ কুশিনারার অতীত গৌরব বলতে গিয়ে বলেছেন, নগরের সাতটি প্রাকার ছিল—চারটি তোরণ ছিল, তালগাছ শোভিত সাত রাজপথ ছিল। দিব্যাবদানও বলেছে, এটি একটি সুন্দর নগর ছিল।

মল্লদের একটি সংস্থাগার ছিল যেখানে রাজনৈতিক, ধর্মীয় সব বিষয়ই আলোচিত হোত। দীর্ঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সুত্তন্ত 'পুরিষ' বলে একদল কর্মচারীর উল্লেখ করেছে। রিজ ডেভিসের মতে এরা অধস্তন ভৃত্য ছিল। কুশিনারার পূর্বে মুকুটবন্ধন বলে একটি মল্লমন্দির ছিল। বুদ্ধের মৃতদেহ দাহ করার জন্যে ওখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। যখন বুদ্ধ অনুভব করলেন যে তাঁর শেষ সময় আগতপ্রায় তখন তিনি আনন্দকে কুশিনারার মল্লদের খবর দিতে বলেন। মল্লেরা তখন সংস্থাগারে তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। খবর পেয়েই তারা দলে দলে শালবনে বুদ্ধের কাছে ছুটে এল। বুদ্ধ মারা যাবার পর তারা সংস্থাগারে মিলিত হয়ে আলোচনা করল, কীভাবে প্রভুকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যায়। যে কোনও চক্রবর্তী রাজার মতোই তাঁর চিতা ভস্মকে তারা সম্মান নিবেদন করল। তারপর মল্লদের ভাগের চিতা ভস্ম এবং স্মারকের ওপর একটি স্তূপ নির্মাণ করাল এবং লোকজনকে ভোজন করাল।

লছমনঝোলা : হৃষিকেশের অদূরে সুন্দর একটি স্থান। কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথের পথে এগোবার সময় যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম নেয়। ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে।

লাডাখ : লাডাখ একটি সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি বৃহত্তর হিমালয়ের সমান্তরাল। মানস সরোবর হ্রদের পূর্বদিকে অবস্থিত। প্রায় ৫০ মাইল চওড়া এক উপত্যকার দ্বারা স্থানটি হিমালয় থেকে বিচ্ছিন্ন।

লামঘান : কাবুল নদীর উত্তর তীরে এই নামে একটি ছোট্ট দেশ ছিল।

লামপাক : (লম্প, টলেমির লম্বতাই)—কাবুলের উত্তরপূর্বে ক্যাসিসেনির ১০০ মাইল পূর্বে আধুনিক লমঘান বলে চিহ্নিত। ল্যাসেনের ল্যামাগে আধুনিক কাফ্রিস্তান হিন্দুকুশের দক্ষিণে। হিউয়েন সাঙ স্থানটি পরিদর্শন করে বলেছেন, দশটির বেশি বৌদ্ধ বিহার এবং সামান্য সংখ্যক মহাযানী বৌদ্ধ রয়েছে।

লার : উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার একটি গ্রাম। এখানে কনৌজের গোবিন্দ্রচন্দ্রের তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

লোহারকোট্ট : রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত লোহ-কোট দুর্গ। কেউ কেউ বলেন এটি লাহুর দুর্গ।

লোহাওয়ার : কেউ কেউ বলেন এটি রামচন্দ্রের পুত্র লব প্রতিষ্ঠিত নগর। টলেমি বলেন, এটি লাবোকলা নগর।

লুম্বিনী গ্রাম : অশোকের রুমিনদেই শিলালিপিতে বর্ণিত একটি ছোট্ট গ্রাম। এটিকে রূপদেইও বলা হোত। রুমিমদেই মন্দিরের জন্যে এই নাম। রুমিনদেই কপিলাবস্তু থেকে ১০ মাইল পূর্বে, ভগবানপুরের ২ মাইল উত্তরে এবং পদেরিয়ার ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। লুম্বিনীবন (লা-ফা-নি বন) ফাহিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ পরিদর্শন করেছিলেন। ফাহিয়েনের মতে এটি কপিলাবস্তুর ৫০ লী (৯-১০ মাইল) পূর্বে অবস্থিত। হিউয়েন সাঙ এখানে অশোক প্রতিষ্ঠিত একটি স্তম্ভের কথা বলেন যার মাথায় একটি অশ্বমূর্তি ছিল। পরে বজ্রাঘাতে এটি মাঝামাঝি ভেঙে যায়। পি. সি. মুখার্জী তাঁর ‘এনটিকুইটিস ইন দি তরাই’ বইতে লিখেছেন, রুমিনদেই স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ থেকে দেখা যায়, চীনা তীর্থযাত্রীর বর্ণনা সঠিক। রুমিনদেই শিলালিপি যেখানে পাওয়া গেছে সেটিই লুম্বিনীবন বলে চিহ্নিত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, অশোকস্তম্ভের কাছ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পূর্বে বয়ে যেত। লোকে বলত অয়েল (তেল) নদী। এখনও সেই নদী বজায় আছে। লোকে বলে তিলারনড়ে নদী। এটি তেলির নদীর অপভ্রংশ। তুলনামূলক ভাবে পরবর্তীকালের একটি মন্দির রয়েছে এখানে। মন্দিরে পাথরের ওপর বুদ্ধের মূর্তি খোদিত আছে যা লুম্বিনীবনের স্বপক্ষে আরও একটি প্রমাণ। রুমিনদেইতে অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ রয়েছে : রাজত্বের কুড়ি বছরে অশোক এখানে পূজার জন্যে আসেন, কারণ, এটিই বুদ্ধের জন্মস্থান। বুদ্ধের জন্মস্থান চিহ্নিত করার জন্যে তিনি একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি লুম্বিনী গ্রামকে করমুক্ত করে দেন এবং তাদের উৎপন্নের এক ষষ্ঠাংশের পরিবর্তে এক অষ্টমাংশ রাজস্ব দিতে হোত। নিগলীবস্তম্ভের (উস্কাবাজার রেল স্টেশনের ৩৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত) উৎকীর্ণ লিপিতে লেখা রয়েছে, এটি কোনাগ্রামের কাছে স্থাপন করা হয়েছিল।

বুদ্ধচরিত কাব্যে বলা হয়েছে লুম্বিনীবন—যেখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা কপিলাবস্তুতে অবস্থিত।

মদাবর : উঃ প্রঃ বীজনোরের কাছে পশ্চিম রোহিলখন্ডের একটি বড় শহর। কেউ কেউ এদিকে মাদিপুর—(মো-তি-পু-লো) বলে চিহ্নিত করেন। হিউয়েন সাঙের মতে রাজ্যটি আয়তনে ১০০০ লী ছিল। ভিভিয়েন দ্য সেন্ট মার্টিনের মতে সম্ভবত এটি মেগাস্থিনিসের ম্যাথি।

মধুবন : উঃ প্রদেশের আজমগড় জেলার নাথপুর পরগণায় এটি অবস্থিত। এখানে হর্ষবর্দ্ধনের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

মধুরবন : এই নামটি মথুরায় প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তির গায়ে হুবিষ্কের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এটিকে মধুবন বা মধুরা (আধুনিক মুত্রা) বলে চিহ্নিত করছেন। এটি লুডারের তালিকায় রয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী এটি মথুরা নগরর উপকণ্ঠে মধুরবন।

মদ্রদেশ : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে কথিত মদ্রদেশ সম্ভবত বর্তমান শিয়ালকোট এবং রাভি আর চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয় গঠিত ছিল। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে-এর উল্লেখ রয়েছে। রাজধানী সাকল—শিয়ালকোট বলে চিহ্নিত। সফল বা সাগল (পালি) বাণিজ্যের একটি বিশাল কেন্দ্র ছিল। এটি পর্বতময়, জলসেবিত এক আনন্দময় রাজ্য ছিল। হিউয়েন সাঙের মতে পুরোন রাজধানী 'সকল' আয়তনে ৭০ লী ছিল। এখানে ১০০ জন হীনযানী ভিক্ষুসহ একটি বিহার ছিল। এই বিহারের উত্তর পশ্চিমে অশোক ২০০ ফুট উঁচু এক স্তম্ভ নির্মাণ করান। এখানকার অধিবাসীরা বৈদিক যুগের এক ক্ষত্রিয় জাতি। মদ্রেরা এক যোদ্ধা সংঘ ছিল—তারা রাজার সম্মান উপভোগ করত। ৩২৬ খ্রিঃ পূঃ সাকল আলেজান্দারের অধিকারে আসে। ৭৮ খৃষ্টাব্দে মিনান্দার (পালি—মিলিন্দ) নামে এক শক্তিশালী গ্রিক রাজার অধিকারে আসে সাকল। মিলিন্দ পঞ্‌হোর মতে এই রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মিলিন্দের অনেক আগেই সম্ভবত সাকলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে মদ্ররা সমুদ্রগুপ্তকে কর দান করত।

মহাবন : এটি কপিলাবস্তুর হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল বনভূমি। এখানকার কূটাগারে বুদ্ধ একবার বাস করেছিলেন।

মহাবৃষ : এটি একটি উপজাতির নাম—মুজাবন্দদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ঋক্ষপর্বতই মহাবৃষদের দেশ। হৃতসর্বস্ব মহাবৃষের রাজা ছিলেন। বৌদ্ধায়ন-শ্রুতসূত্রে মহাবৃষের উল্লেখ রয়েছে।

মহী : পালি সাহিত্য বর্ণিত পঞ্চ বৃহৎ নদীর অন্যতম। এটি গন্ডকের একটি উপনদী।

মহোবা : উঃ প্রদেশের হাম্মিরপুরের প্রাচীন মহোৎসবপুর। এখানে কানিহাম ১৮৪৩ সালে ১২৪০ বিক্রমাব্দের পর্মারাদনের একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেছিলেন। এটিতে পরমারদিনের প্রশস্তি এবং তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের যুদ্ধের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রশস্তিটি বাস্তব্যবংশের জয়পাল রচনা করেছিলন। ভি. ভি. মিরাশী এই লিপিটির সম্পাদনা করেছেন।

মৈনাকগিরি : তৈত্তরীয় আরণ্যক, বাণের কাদম্বরী এবং যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ

রয়েছে। এটি শিবালিক পাহাড়শ্রেণি গঙ্গা থকে বিতস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত। মূল শিবালিক পর্বতের বিতস্তা থেকে ২০০ মাইল দূরে গঙ্গা পর্যন্ত প্রসারিত অংশটুকুকে প্রাচীন ভূগোলবিদেরা মৈনাক পর্বত বলতেন। উত্তর প্রদেশে শিবালিক পর্বতমালাকে ছুরিয়া এবং দুন্দয়া পর্বতমালা বলা হয় এবং তা গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে পাহাড়গুলি হঠাৎই খাড়া হয়ে উঠে ধীরে ধীরে দেরাদুন উপত্যকার দিকে নেমে গেছে।

মনোর অবসরপন : এটির মহাকাব্যীয় নাম নাউবন্ধন। এই সেই পাহাড় যার ওপর মনুর জাহাজ থেমেছিল।

মনসাকট : কোশলের এই গ্রামটি বুদ্ধ পাঁচশত জন শিষ্যকে নিয়ে পরিদর্শন করেছিলেন। এর উত্তর দিক দিয়ে অচিরাবতী বয়ে গেছে। এই নদীর তীরে একটি আম্রকুঞ্জ ছিল।

মন্দাকিনী : যোগিনীতন্ত্রে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে। এটিই পশ্চিম কালি নদী (কালিগঙ্গা) যা গারোয়ালের কেদার পর্বতমালায় উৎপন্ন হয়েছে। এটি অলকানন্দার একটি উপনদী। চিত্রকূট পর্বতের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুন্দেলখন্ডের পাইসুন্দির একটি উপনদী মন্দাকিনকে কানিংহাম মন্দাকিনী বলে চিহ্নিত করেছেন।

মন্দার : কালিদাস পর্বতটিকে হিমালয়ে অবস্থিত বলে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এটি কৈলাস ও গন্ধমাদনের আশপাশে। মেগাস্থিনিস ও এরিয়ান এটিকে মল্লুস বলে জানতেন যা ভাগলপুরের ৩০ মাইল দক্ষিণে, বন্সির ৩ মাইল উত্তরে ভাগলপুর জেলার বংশ মহকুমায় অবস্থিত। পার্জিটার বলেছেন, কিরাতদের মূখ্য ভূমি ছিল তিন পাহাড়ে—কৈলাস, মন্দার এবং হৈম।

মণিকর্ণ : এটি মণিকরণ নামেও পরিচিত যা কুলু উপত্যকার বিতস্তার উপনদী পার্বতির কূলে অবস্থিত।

মণিপর্বত : হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত।

মনকুঁয়ার : কুমারগুপ্তের মানকুয়ারের প্রস্তরমূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লিখিত মনকুয়া নামে ছোট গ্রামটি আরেইলের ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনার তীরের কাছাকাছি অবস্থিত।

মরুদ বৃধা : রোথ ও জিমার অনুযায়ী এটি একটি ছোট নদী—অ্যাকেসাইন (অসিকনি) এবং হাইদাসপেস (বিতস্তা)-এর যুগ্ম জলধারায় গঠিত হয়ে পারুষনি (রাভি) নদীতে গিয়ে মিশেছে।

মশকাবতী : গ্রিক লেখকদের অনুযায়ী এটি অশ্বকেনই রাজ্যের রাজধানী। এটি রাজা অস্সকেনসের রাজ্য। আলেকজান্দারের সেনারা এই রাজ্য আক্রমণ করলে এই নগরের বিশাল সংখ্যক দেশীয় সেনারা আলেকজাণ্ডারের বাহিনীতে নাম লেখাতে রাজি হয়। বাকিরা নাম লেখাতে রাজি না হয়ে পালাতে গেলে আলেকজাণ্ডার তাদের সবাইকে হত্যা করেন।

মতিপুর : (মো-তি-পু-লো)—এটি উঃ প্রঃ বিজনোর জেলা বা তার পূর্বভাগ। এখানে ৮০০ ভিক্ষু (বেশির ভাগই সর্বাস্তিবাদ মতের) সম্বলিত দশটিরও বেশি বিহার ছিল। ঐখানে একটি ছোট বিহারে বসে গনপ্রভ ১০০টিরও বেশি সূক্ত রচনা করেন। হিউয়েন

সাঙ এই স্থানটি পরিদর্শন করেন।

মথুরা : মথুরার সকল বৌদ্ধদের উপাসনার জন্যে নির্মিত রত্নগৃহের একটি রেলিং, বেদিকাস্তম্ভ ও আর্চের (তোরণ) গায়ে দাতা হিসাবে উৎকীর্ণ রয়েছে—বাধপাল ধম্মভূতি (ধনভূতির ছেলে) ও বাতসির নাম। পিতামাতা, ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, উপাসিক এবং উপাসিকাদের সঙ্গে একত্রে যে এটি উৎসর্গ করেছিলেন তা খোদাই করা রয়েছে। ধনভূতির পুত্র বাধপালের নাম ভারহুতের একটি রেলিং গাত্রেও দাতা হিসাবে উৎকীর্ণ রয়েছে। আগরজুর (অংগারদূত)—রাজা ধনভূতির পুত্র ও বাতসির এবং রাজা বিশ্বদেবের নাতির নাম ভারহুত স্তুপের একটি অলংকৃত তোরণ-গাত্রে স্পষ্টভাবে খোদিত রয়েছে। ঐ উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে, শুঙ্গরাজ্যে রাজা ধনভূতি কর্তৃক এই প্রবেশ দ্বার প্রতিষ্ঠিত হল। যদি মথুরার বাধপাল ধনভূতি—ভারহুতের ধনভূতিরই পুত্র হন তাহলে ধরে নিতে হবে যে মথুরা শুঙ্গ অধিকারে ছিল। বাধপাল ধনভূতি নিশ্চয় একজন শাসক ছিলেন, তা না হলে কেন তিনি উৎসর্গের সময় তার পিতামাতা (বয়স্ক) ও বৌদ্ধসমাজের চারটি অংশকেই সঙ্গে রাখবেন? ভারহুতে রাজকুমার বাধপালের লেখাটি অশোকের সময়কার প্রাকৃতে, অথচ মথুরার লেখাটি কুষাণ যুগের মিশ্র সংস্কৃততে—যে ভাষার লিপি সচরাচর এই যুগেই দেখা যায়। এর অক্ষরগুলিও অশোকের ব্রাহ্মী এবং কুষাণ যুগের অক্ষরেব মাঝামাঝি অবস্থায়। সময়ের ব্যবধানও এমন কিছু বেশি নয় যে তা এই বিবর্তনের কারণ হিসাবে দর্শানো যাবে। একটি কারণ সহজেই দেখানো যেতে পারে—ভারহুত এবং মথুরা দুটি অল্প ব্যবধানে থাকলেও সামান্য ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে ছিল। প্রমাণাভাবে বলা যেতে পারে যে বাধপাল ধনভূতি এবং তাঁর পূর্বজেরা কুষাণ যুগের আগেই মথুরার স্থানীয় শাসক ছিলেন।

মথুরা শূরসেন দেশের রাজধানী ছিল। রামচন্দ্রের ভাই শত্রুঘ্ন ওখানকার বন কেটে যাদব লবণকে হত্যা করার পর ঐ নগরের পত্তন করেন। এখানে বুদ্ধের মহাকাচ্চায়ন নামে একজন প্রখ্যাত শিষ্য বাস করতেন। উপগুপ্ত, গুণপ্রভ,—বসুবন্ধুর শিষ্য, ধ্রুব, রাজনর্তকী বাসবদত্তা এই নগরে বাস করতেন। নগরটি পাণিনী, পতঞ্জলী, গ্রিক এবং চৈনিকদের কাছে পরিচিত ছিল। যোগিনীতন্ত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। নগরটি আগ্রার কাছে যমুনার তীরে অবস্থিত। কৌশাম্বীর উত্তর পশ্চিমে সোজাসুজি ২১৭ মাইল দূরে। নগরটি মধুপুরী নামে পরিচিত ছিল। এটি আধুনিক মুত্রা শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে। গ্রিকরা এই শহরকে মেথরা বা মাদাউরা (ঈশ্বরের নগর) বলে জানতেন। ফাহিয়েন বলতেন মা-টাউলো বা ময়ূরের নগর। হিউয়েন সাঙ বলতেন মো (মেই) -টু-লো। মেগাস্থিনিসের বক্তব্য অনুযায়ী এরিয়ান এই নগরটিকে শূরসেনের রাজধানী বলেছেন। টলেমিও এর উল্লেখ করেছেন। জৈনরা একে সাউরিপুর বা সূর্যপুর হিসাবে জানতেন। মথুরা একটি ধনী; উন্নতিশীল এবং জনবহুল নগর ছিল। শাসকেরা ছিল যাদববংশীয়, এটি বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্র। ভাগবতধর্মী আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান। মথুরায় অনেক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্ম উল্লেখযোগ্য স্থানে ছিল। দ্বিতীয় খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যভাগ থেকেই জৈনরাও এখানে ছিল। প্লিনি বলেছেন জোমানেস (যমুনা) মেথরা ও ক্রিশোবারা (কৃষ্ণপুরা) নগরের মধ্যে দিয়ে পালিবোথরি (পাটলিপুত্র) হয়ে গঙ্গায় মিশেছে। ল্যাসেন

ক্লিশোবাবাকে কৃষ্ণপুরা বলে ধরেছেন। আগ্রা বলে তিনি স্থানটিকে চিহ্নিত করেছেন। কানিংহাম বলেছেন, এটি মথুরার কেশবপুরা-মহল্লা। এস. এন. মজুমদার বলেছেন, যমুনার বাম তীরে—মথুরার ৫ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে গোকুলই হচ্ছে ঐ ভূমি। গ্রিকদের বক্তব্য অনুযায়ী আগ্রা থেকে ৩৫ মাইল দূরে যমুনার তীরে ছিল মেথরা (মথুরা)। নগরটি ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণে ছিল। শ্রাবস্তী থেকে মথুবার পথটি বিরঞ্জ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবসতির মধ্যে দিয়ে গেছে। মথুরা যমুনার দক্ষিণতীরে এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও কৌশাম্বীর মাঝামাঝি অবস্থিত। সঠিক বলতে গেলে এটি উত্তর মধুরা যা আধুনিক মথুরা শহরের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মাহোলী যায়। বলা যায়, গঙ্গা তীরের সংকিস্স (সং—সংকাশ্য) থেকে উত্তর মধুরা মাত্র ৪ যোজন। আধুনিক মথুরা তার পূর্বতন জায়গায় নেই। নদী এগিয়ে আসার জন্যে একটি উত্তরে সরে গেছে।

ফাহিয়েন ভিক্ষুপূর্ণ অনেক বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। নগরে তখন বৌদ্ধদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, দেশটি ৫০০০ লী এবং রাজধানী আয়তনে ২০ লী। জমি খুব উর্বর এবং কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে মিহি কার্পাস বস্ত্র এবং অশোক নির্মিত তিনটি বৌদ্ধস্তূপও ছিল। বৌদ্ধ বিহার ও দেবমন্দিরও ছিল। মথুরার একটি অসুবিধা ছিল—পথ উঁচুনিচু ধূলায় ভরা। ভয়ঙ্কর সব কুকুর, জন্তু জানোয়ার ও দৈত্যে ভরা, সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায় না।

বৃষ্ণি ও অন্ধকদের এই দেশ দৈত্যেরা আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণের ভয়ে বৃষ্ণি আর অন্ধকেরা মথুরা ছেড়ে দ্বারাবতীতে চলে গিয়েছিল। মগধের রাজা জরাসন্ধও বিশাল সৈন্য নিয়ে এই নগর আক্রমণ করেন। মহাপ্রস্থানে যাবার সময় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নাতি বজ্রনাভকে এখানকার রাজা করে যান। গুপ্তবংশের উত্থানের সময় এখানে সাতজন নাগবংশীয় রাজা রাজত্ব করে গেছেন। শত্রুঘ্ন তাঁর দুই পুত্র সুবাহু ও শূরসেনকে নিয়ে এখানে রাজত্ব করে গেছেন। উগ্রসেন ও কংস এখানকার রাজা ছিলেন। পারজিটার বলেন, রামের ভাই শত্রুঘ্ন কর্তৃক মথুরা ও শূরসেন অধিকার করার কিছু আগে—অর্থাৎ সুদাসের রাজত্বকালের আগে কিছু বশিষ্ঠবংশধরেরা অন্যরাজ্যে চলে গিয়েছিল। ভীম-শাশ্বত শত্রুঘ্নের পুত্রদের মথুরা থেকে বিতাড়িত করে ওখানে রাজত্ব করেন। শাশ্বত যাদবদের আক্রমণ করে মাধব লবণকে হত্যা করে শত্রুঘ্ন মথুরা নির্মাণ করেন। দেশটিকে অতঃপর শূরসেন বলা হয়। অন্ধকেরা যাদবদের মুখ্য রাজধানী মথুরায় রাজত্ব করত। মগধের রাজা কংস ক্ষমতার শীর্ষে উঠে মথুরা পর্যন্ত ক্ষমতার বিস্তার করেন। মথুরার রাজা কংস জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করে জরাসন্ধকে তার প্রভু বলে স্বীকার করে নেয়।

মহাভারত ও পুরাণ অনুযায়ী মথুরার রাজারা যদু বা যাদব বংশের ছিল। যাদবেরা নানান ভাগে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় মথুরার এক রাজার উপাধি ছিল অবন্তীপুত্র। আর তাই তিনি উজ্জয়িনীর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দ্বীপবংশ বলেছে, রাজা সাধীনের পুত্র-পৌত্রেরা মথুধুরা বা মথুরায় রাজত্ব করত। একটি জৈন বিবরণে পাওয়া যায় যে মৌর্যপুরায় (মথুরা) বাসুদেব নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হবার আগে যৌধেয় ও নাগেরা মথুরায় রাজত্ব করত।

কাবুল ও পাঞ্জাবের রাজা মিনান্দার এই রাজ্যটি অধিকার করেন। মথুরার হিন্দু রাজারা শেষ পর্যন্ত হাজান, হাজামাস রাজবুলা এবং অন্যান্য শক রাজা কর্তৃক স্থানচ্যুত হন। এই শক রাজারা প্রথম শতাব্দী বা ঐরকম সময়ে ক্ষমতার শীর্ষে আসতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কুষাণরাজ কণিষ্ক মথুরা অধিকার করেন। এটি তাঁর নামানুসারে একটি চমৎকার বৌদ্ধবিহার থেকে প্রমাণিত হয়।

প্রথম খ্রিঃ পূঃ মথুরার অঞ্চল স্থানীয় রাজাদের হাত থেকে শকদের হাতে চলে যায়। এক গ্রিক রাজা রাজগৃহ অবরোধ করতে এসে কলিঙ্গরাজ খারবেলের ভয়ে মথুরায় ফিরে যায়। যবন বা ব্যাকট্রিয়ান গ্রিকেরা মথুরা অধিকার করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মেগাস্থিনিস যখন শূরসেনের কথা লেখেন তখন দেশটি মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মৌর্যদের পরেই রাজধানী মথুরা ব্যাকট্রিয়ান গ্রিক ও কুষাণদের অধিকারে আসে। মথুরা শুঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তভূর্ক্ত ছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

মথুরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল। শক-কুষাণ যুগে ভাগবতীয়দের প্রভাব দূর হয়। মথুরার মথুরা-নাগে ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ লিপি যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মথুরায় সর্প পূজা হোত। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়নাগ দমনের কাহিনী একটি ভিন্নমাত্রা পায়। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের দোল লীলার পরে অক্রূরের সঙ্গে মথুরা পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি এক রজককে হত্যা করেন। সুদামা নামে এক মালাকারকে বর দান করেন, ত্রিবক্র নামে একজনকে স্বর্গীয় রূপদান করেন। তাঁকে এবং তাঁর দাদা বলরামকে সজ্জিত করে দেবার জন্য এক তাঁতিকে পুরস্কৃত করেন, ইন্দ্রধনু ভগ্ন করেন, কংসের হাতিকে বধ করেন, এবং শেষমেশ অত্যাচারী রাজা কংসকে নিধন করেন। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি তাই তা বৈষ্ণবধর্মেরও জন্মভূমি। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মও ছিল এখানে। বুদ্ধশিষ্য মহাকাচ্চায়ন এই নগরে জাতপাতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। উপগুপ্ত বিহার মথুরার এক বিখ্যাত বিহার ছিল। জৈনধর্মও এখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিবিধতীর্থকল্প অনুসারে দুজন জৈন ঋষির সিদ্ধিলাভের জন্য মথুরাকে সিদ্ধক্ষেত্রও বলা হোত। মথুরার অধিবাসীরা এবং ছিয়ানব্বইটি প্রতিবেশী গ্রামের বাড়িতে এবং উঠোনে জৈন দেবতাদের মূর্তি ছিল। মহাবীর এই নগর পরিদর্শন করেন। মথুরায় প্রাপ্ত অসংখ্য লিপিতে—যেগুলির বেশির ভাগ কুষাণ রাজাদের সময়কার অর্থাৎ ৭৮ খৃষ্টাব্দের পর, প্রমাণ করে যে জৈন ধর্ম এখানে শুধুমাত্র দৃঢ় প্রোথিতই ছিল না—আগের যুগেও তাদের অস্তিত্ব ছিল।

উত্তর পশ্চিমের শৈল্পিক ঐতিহ্য মথুরায় দেওয়াল গাত্রে খোদিত জৈনমূর্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সন তারিখওলা, আবার সন তারিখ ছাড়াও বহু বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি এখানে আবিষ্কার করা গেছে। মথুরার মন্দিরগুলি দেখে গজনীর সুলতান মামুদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং নিজের নগরকে এইভাবে সাজাবার কথা ভাবেন।

মালব : জৈন ভগবতীসূত্র অনুসারে মালব দেশ ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। মালব উপজাতির কথা পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে রয়েছে। এই মালবরা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ঠিক কোথায় তা খুঁজে বার করা দুরূহ। স্মিথ মন করেন, ঝিলাম আর চেনাব নদীর সঙ্গমের নীচের দিকে ছিল এই রাজ্য। অর্থাৎ অবিভক্ত পাঞ্জাবের ঝং

জেলা আর মন্টেগোমারী জেলার কিছু অংশ ছিল। ম্যাকক্রিন্ডলের মতে, আধুনিক চেনাব ও রাভি নদীর দোয়াব অঞ্চল থেকে সিন্ধু ও অ্যাকেসাইন নদীর সংগম পর্যন্ত অঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক মুলতান জেলা ও মন্টেগোমারী জেলার কিছু অংশ, কেউ কেউ বলেন, এটি রাভি নদীর নিম্ন উপত্যকায়—নদীর দুই তীর জুড়ে ছিল।

মালবদের মল্লই-ও বলা হত। তারা তাদের দেওয়াল ঘেরা নগর থেকে দৃঢ় প্রতিরোধ করলেও শেষে আলেকজান্ডার ও তার সেনাপতি পারদিকসের কাছে পরাজিত হয় এবং নগর পরিত্যাগ করে চলে যায়। মনে হয়, এর পরে তারা পাঞ্জাবে কিছুকালের জন্য রাজ্য স্থাপন করে। মহাভারত তাদের শিবি, ত্রিগর্ত ও অম্বোষ্ঠদের অঞ্চলেই দেখিয়েছে। এরপরে তারা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে রাজস্থানের কোথাও সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত মাটি আঁকড়ে থাকে। রাজস্থানের জয়পুরের কাছাকাছি নাগর অঞ্চল যে মালবদের অধিকারে ছিল তা ক্ষত্রপ নহপালের জামাই শক উশবদাতের নাসিক গুহা লিপিতে সমর্থিত হয়। স্কাইথিয়ান আক্রমণ ও বিজয় মালবদের ধ্বংস করতে পারেনি। কারণ, এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে আর্যাবর্তের উপজাতি রাজ্যের তালিকায় পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিমের সীমান্তের কাছে মালব রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। সুপরিচিত কৃত বা মালব বিক্রম অব্দের সঙ্গে মালবেরাও জড়িত। পুরাণে আমরা দেখি, সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর এবং অর্বুদের সঙ্গে মালবদেরও নাম করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, পারিয়াত্র পর্বতমালা বরাবর এরা বসবাস করে। পরবর্তীকালে সপ্তমালব বা সাতটি দেশকে মালব বলা হয়, এ কথা জানতে পারি।

মাল্যবত পর্বত : এটি হিমালয়ে উত্তর পশ্চিম কোণা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে এগিয়ে প্রথমে ভারতকে (পাকিস্তান সহ) আফগানিস্তান থেকে পৃথক করে আবার উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের দিকে এগিয়ে গেছে। পর্বতটির আধুনিক নাম হিন্দুকুশ। মূল পর্বতমালা থেকে অনেকগুলি শাখা বেরিয়ে এসেছে। বাদাখশান শৈলশিরা অক্ষুকে কোকচা থেকে পৃথক করেছে। কোকচাশিরা কোকচাকে কুন্দুজ থেকে আলাদা করেছে। পূর্ব অংশে হিন্দুকুশের উচ্চতা ১৪০০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুট পর্যন্ত। এরপর এর অনেক উচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে—যার একটির উচ্চতা ২৫০০০ ফুট। এই পর্বতমালা যেন টুকরো করে কাটা এবং প্রচণ্ড খাড়াই হবার জন্যে গায়ে মাটি জমতে পারে না। ফলত ঘাস ছাড়া কিছুই জন্মায় না।

মানপুরা : মহারাজ সর্বনাথের (২১৪ খ্রিঃ) তাম্রলিপিতে এই নগরের উল্লেখ রয়েছে। স্থানটি সম্ভবত শোণ নদীর কাছে আধুনিক মানপুর। মানপুর উছরা থেকে ৪৭ মাইল দূরে এবং কারিতলাই-এর ৩২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

মানস সরোবর : রাজা বিভরাজ হ্রদটির সংস্কার করেন। এটি পশ্চিম তিব্বতের কৈলাস পর্বতে অবস্থিত।

মার্কণ্ডেয় আশ্রম : ভীষ্ম আশ্রমটি পরিদর্শন করেন। মহাভারতে স্থানটিকে গুমটি ও গঙ্গার সঙ্গমে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এটি সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত।

মেহেরাউলি : এখানে রাজা চন্দ্রের লৌহস্তম্ভটি রয়েছে। নামটি দিল্লির দক্ষিণে ৯

মাইল দূরের মিহিরপুরীর অপভ্রংশ। এই স্তম্ভে বৈষ্ণবধর্মীয়দের উৎকীর্ণলিপি থেকে জানা যায় যে এটি একটি ধ্বজ বা বিষ্ণুস্তম্ভ যা বিষ্ণুপদ পাহাড়ে স্থাপন করা হয়েছিল।

মেহাতনু : এটি সিন্ধুর এক উপনদী।

মেরস পর্বত : পাঞ্জাবের জালালাবাদের কাছের স্থানটি মার-কোহও বলে পরিচিত। আলেকজান্ডার স্থানটি পরিদর্শন করেন।

মেরু : এই পর্বতটি হিমাদ্রি বা স্বর্ণাচল বলেও পরিচিত। এটি গারোয়ালের রুদ্র হিমালয় বলে চিহ্নিত। এখানেই গঙ্গার শুরু। উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ সিনেরু হিসাবে এটি চিহ্নিত। এটি ৬৮০০ লিগ উচ্চ ছিল। এটি বদরিকাশ্রমের কাছে এবং সম্ভবত এরিয়ানের মেরস পর্বত। এই পর্বতের পশ্চিমে নিষাদ ও পারিপাত্র এবং দক্ষিণে কৈলাস ও হিমবন্ত পর্বত। উত্তরে শৃঙ্গবান ও জরুধি। মহাঋষি সালংকায়ন এই পর্বতে ধ্যান করতেন। তৈত্তরীয় আরণ্যকে এটিকে পর্বত বলা হয়েছে। মেরুপর্বত ইলাবর্তের মাঝামাঝি। বৈশ্যমপায়ন পর্বতটি পরিদর্শন করেন।

মিগসম্মতা : হিমালয় থেকে উদ্ভূত একটি নদী।

মোরা : মথুরা শহরের ৭ মাইল পশ্চিমে এবং মথুরা থেকে গোবর্ধন যাওয়ার পথে ২ মাইল উত্তরে একটি ছোট গ্রাম।

মোরিয় নগর : কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢ়কের হাতে নিপীড়িত হয়ে কিছু শাক্য হিমালয়ের কোলে পালিয়ে গিয়ে এই নগর তৈরি করে। একটি বনের মধ্যে এক হ্রদের তীরে এই নগর গড়ে ওঠে। বনটিতে অজস্র অশ্বত্থ গাছ ছিল। মোটামুটি মনে করা হয়, অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত এই পিপ্পলীবনে বসবাসকারী মোরিয় জাতির বংশধর। নগরটি ময়ূরের চিৎকারে সব সময়েই প্রতিধ্বনিত হত। পিপ্পলীবনের মোরিয়রা বুদ্ধের দেহাবশেষের একটি অংশ লাভ করে তার ওপর একটি স্তূপ রচনা করে।

মউসিকানোস : আলেকজান্ডারের ঐতিহাসিকদের কাছে স্থানটি খুব পরিচিত ছিল। আলেকজান্ডার তাদের হঠাৎ আক্রমণ করে পর্যদুস্ত করে। স্ট্রাবেরা মতে এরা সোনারূপা ব্যবহার করত না। আইন ও আদালতে যাওয়া পছন্দ করত না। বিজ্ঞান ও ওষুধের চর্চা করত।

মুজবন্ত : অন্য নাম মুঞ্জবন্ত—মহাভারতে উল্লিখিত। এটি হিমালয়ের একটি পর্বতের নাম। ঋগ্বেদে একে মাউজবত বলা হয়েছে। পাণিনীর সিদ্ধান্ত কৌমুদিতে এটির নাম মাউঞ্জবত। জিমার বলেছেন, কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে এটি নীচু পাহাড়গুলির অন্যতম।

মুক্তেশ্বর : পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একই নামের একটি তহশিলের প্রধান কার্যালয়, এখানে প্রতিবছর এক শিখ উৎসব পালিত হয়।

মুলাস্থান (মুলা স্থানপুর) : এটি রাভি নদীর দুটি দ্বীপে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন লেখকেরা এটি কাসপ্লাইরোস, কাসপেরিয়া ইত্যাদি বলত। হিউয়েন সাঙ সাউ-লো-সান-পু-লু (সং-মুলাস্থান) পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, সিন্ধের ৯০০ লী পূর্বে রাজ্যটি অবস্থিত। কানিংহাম বলেছেন, মুলাস্থান হচ্ছে মুলতান।

মুনিমরণ : এটি সেই জায়গা সেখানে বৈখানস্কে হত্যা করা হয়েছিল।

মুরুন্ড দেশ : ২য় শতাব্দীতে টলেমিই মোরোনদাই বলে সর্বপ্রথম মুরুন্ডদের কথা বলেন। এরা সম্ভবত বিশাল ভূভাগ ভোগ করত। উত্তর বিহারের সবটুকু থেকে গঙ্গার পূর্বদিকে, এমনকি 'ব' দ্বীপের মাথা পর্যন্ত অঞ্চল। তাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল। সবকটিই গঙ্গার পূর্বদিকে। যেমন : বোরাইটা, কোরয্যগাজ, কোনডোটা, কেল্যিভন অগনাগোরা এবং তালাগ্রা। মার্টিনের মতে গোরার সঙ্গে অঘদ্বীপের (অগ্রদ্বীপ) কিছু মিল রয়েছে। এটি গঙ্গার পূর্ব তীরে কাটোয়ার নীচে অবস্থিত। কনিংহাম বলেন, টলেমির মোরাউন্ডি এবং প্লিনির মোরেডেস একই স্থান। বায়ুপুরাণে মুরান্ড বলে এক মেচ্ছ উপজাতির কথা বলা হয়েছে। হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' মুরুন্ডদের লম্পাক বলে চিহ্নিত করেছে যা কিনা টলেমির লম্বতাই। তিনি বলেছেন, রাজ্যটি কাবুল নদী অঞ্চলের লঘমানকে ঘিরে অবস্থিত ছিল। তাই মনে হয়, মুরান্ডাদের এখানেও বসতি ছিল।

নগরহার (না-কি-লো-হো) : এটি আফগানিস্তানের আধুনিক জালালাবাদ, ফা-ওয়েই বলেন, তাঁর সময়ে এটি পুরুষপুর রাজ্যের অংশ ছিল। ল্যাসেন নগরহারকে নগর বা টলেমির দিওচন্যাসোপোলিম বলে চিহ্নিত করেন। স্থানটি কাবুর ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ফাহিয়েন স্থানটিকে সোজা ভাবে বলেছেন না-কি—এবং ঐ রাজ্যটিতে এক রাজা রাজত্ব করতেন। আবার সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙের সময় রাজ্যটির কোন রাজা ছিলেন না এবং তা কাপিসেনদের অধিকারে ছিল। এটিকে উদানপুরাও বলা হত, পূর্ব-পশ্চিমে রাজ্যটি ৬০০ লী এবং উত্তর দক্ষিণে ২৫০ বা ২৬০ লী ছিল।

নৈমিষারণ্য (উঃ প্রদেশের আধুনিক নিমসার) : এটি একটি অরণ্য এবং পবিত্র স্থানও। সীতাপুর জেলার গুমতির তীরে এটি অবস্থিত। বিষ্ণুস্মৃতিতে এর উল্লেখ রয়েছে। কালিদাস রঘুবংশে নৈমিষ-এর উল্লেখ করেছেন। বায়ুপুরাণে এটিকে দৃষদ্বতীর তীরে বলা হয়েছে। মনে হয় এটি ভুল। এটি হিন্দুদের পীঠস্থানের একটি এবং প্রাচীন ঋষিদের বসবাস স্থান। এখানেই পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। নারদ নৈমিষ্যরণ্য পরিদর্শন করলে সম্বর্ধিত হন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ বলে, নৈমিষীয় অর্থে এই অরণ্যে বসবাসকারীদের বোঝায়। মহাভারতে এর উল্লেখ রয়েছে। কূর্ম পুরাণেও স্থানটিকে অন্যতম পবিত্র স্থান বলেছে। পদ্মপুরাণ বলে এই অরণ্যে ১২ বছর ব্যাপি এক যজ্ঞ হয়েছিল। যোগীনীতন্ত্র এর উল্লেখ করেছে। অধিসীমা কৃষ্ণ নৈমিষ নদীর তীরে ২ বছর তপস্যা করেন। এখানে বিষ্ণুর বরাহমুর্তি পাওয়া গেছে। ঋষি পিপ্পলাদ এখানে বাস করতেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে অঙ্গারকব্রতের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

নন্দী গ্রাম : কালিদাসের রঘুবংশের এর উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এটি অযোধ্যার একটি উপকণ্ঠ অঞ্চল। রামের বনবাস কালে ভরত এখানে বসবাস করে ছিলেন।

নাউহাই : গ্রামটি কোসম স্তম্ভের ১½ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

নাভক : অশোকের পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালিপি উল্লিখিত নাভক সম্ভবত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোথাও অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, নাভক ও নাভপংক্তি কালসির উত্তরে মধ্যহিমালয়ের কোনও রাজ্য ছিল।

নান্যাউরা : উঃ প্রদেশের হামিরপুর জেলার পাওনয়ারী জৈতপুর তহশিলের এই

গ্রামটির কথা নান্যাউরা দানপত্রে উল্লেখ রয়েছে।

নেপাল : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। নেপাল মাহাত্ম্য কথায় বলা হয়েছে, দেশটির পূর্বতন নাম ছিল শ্লেষ্মাতকবন। পশুপতীর্থ বা পশুপতিতীর্থ বাগমতী নদীর তীরে। নেপালের সীমান্ত এরকম : পূর্বদিকে কৌশিকী নদী, পশ্চিমে ত্রিশূল গঙ্গা। উত্তরে শিবপুরী (কৈলাস)। দক্ষিণে একটি পরিষ্কার ও শীতল জলের নদী রয়েছে। কালিনদী নেপালের পশ্চিম সীমান্ত। কালিগণ্ডকী নদী কাশ্মীর আর নেপালকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে নেপালকে সীমান্তবর্তী এক স্বাধীন রাজ্য বলা হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত এটি জয় করেন। মানদেব জিষ্ণুগুপ্তের সময়কার যানকোট উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায় যে নেপালে মানকর নামে একটি কর নেওয়া হয়। এই করটি গোবিন্দ্রচন্দ্রের গহদাবালের উৎকীর্ণ লিপির (১১০৪—৫৪ খ্রিঃ) 'তরুস্কদণ্ড' করের মতোই। সপ্তম শতাব্দীতে নেপাল একটি করদ রাজ্য। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের ওপরকার নির্ভরতা ঝেড়ে ফেলে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালের রাজা নান্যদেবের দেওপারা উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায়, ঐ সময় বিজয় সেন নেপালকে পরাজিত ও অনেক রাজপুত্রকে বন্দী করেন।

বরাহপুরাণ অনুযায়ী, নেপাল উপত্যকা আদিতে নাগবাস বলে একটি হ্রদ নিয়ে গঠিত ছিল। এটি লম্বায় ১৪ মাইল এবং চওড়ায় ৪ মাইল ছিল। দেবী পাটনের বাগমতী নদীর পশ্চিম তীরে নেপালের মৃগস্থলে বিখ্যাত পশুপতিনাথ বা পশুপতিরমন্দির। কাঠমান্ডুর ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে দেবীপাটা নগরটি অশোকের কন্যা চারুমতী প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বতীরে মন্দিরের মুখোমুখি উঁচু উঁচু গাছ ও জঙ্গলে ভরা একটি পাহাড় রয়েছে। পাঁচ জন বুদ্ধ, পাঁচ বোধিসত্ব এবং পাঁচজন 'তারা' নেপালী বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত হন। সয়ম্ভু পাহাড় বা গোশৃঙ্গ পাহাড়েও একটি বড় মন্দির রয়েছে।

নেরু পর্বত : মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এটিকে একটি পবিত্র স্থান বলা হয়েছে। এটির একটি টিবি-র ওপরে রয়েছে পুরুষোত্তম মন্দির।

নীরমান্দ : মহাসামন্ত ও মহারাজা সমুদ্রসেনের নীরমান্দ তাম্রলিপিতে নীরমান্দের উল্লেখ রয়েছে। এটি একটি নাম। শতদ্রুর ডান তীরে কাংড়া জেলার কুলু বিভাগের প্ল্যাচ তহশিলের মুখ্য নগর প্ল্যাচের ২১ মাইল উত্তর পূর্বে এটি অবস্থিত। পরশুরামের নামে উৎসর্গীকৃত একটি প্রাচীন মন্দিরের কাছাকাছি গ্রামটি অবস্থিত। মিহিরেশ্বর নামে ত্রিপূরনতক বা শিবের একটি মন্দিরও রয়েছে।

নিসভ : হিমালয়ের অদূরে এই পর্বতটি গন্ধমাদন পর্বতের পশ্চিমে এবং কাবুল নদীর উত্তরে বর্তমান হিন্দুকুশ বলে অভিহিত। গ্রিকেরা এটিকে প্যারোপানিসোস বলত।

অক্সিকানোস অঞ্চল : কার্টিয়াস এই অঞ্চলের লোকগুলিকে প্রাস্টি যা কিনা মহাভারত কথিত প্রোষ্ঠ। কানিংহাম মনে করেন, অক্সিকানোসদের দেশ সিন্ধুর পশ্চিমে লারকানা অঞ্চলে সমতলভূমিতে ছিল। অক্সিকানোসরা আলেকজান্ডারকে বাধা দিয়ে বিফল হয়।

পভোসা গুহা : উৎকীর্ণলিপি থেকে জানা যায়, অহিছত্রের রাজা আসাধসেনা কৌশাম্বীর আশপাশে দুটি গুহা কাশ্যপপন্থী অর্হৎদের উৎসর্গ করেছিলেন। একটি লিপিতে বলা হয়েছে রাজা বৃহস্পতি মিত্রের মামা ছিলেন রাজা আসাধসেনা। অপর লিপিটিতে রাজবংশের চারটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। আদিতে ছিলেন শাউনকায়ন।

পাদেরিয়া : এটি নেপালের ভগবানপুর তহশিলের ২ মাইল উত্তরের অবস্থিত। ড. ফুয়েরার মতে এটি নিগলীবের ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

পহ্লব : পার্থিয়ানদের ভারতীয় প্রতিশব্দ পার্থবের অপভ্রংশ। বায়ুপুরাণ বলে পহ্লবদের রাজ্য ছিল উত্তরে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং বৃহৎ সংহিতা বলে, রাজ্যটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। রামায়ণের মতে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কামধেনু নিয়ে কলহের সময় পহ্লবদের সৃষ্টি হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এরা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করে। মহাকাব্য এবং পুরাণ অনুযায়ী এরা হৈহেয় তালজঙ্ঘর মিত্রপক্ষ ছিল। রাজা সাগর পহ্লব, শক, যবন ও অন্যদের নিশ্চিহ্ন করেন। জুনাগড়ের প্রস্তরলিপিতে শিবিসক নামে এক পহ্লব কর্মকর্তার নাম পাওয়া যায়। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে বলা হয় পহ্লব, শক আর যবনদের মূলোচ্ছেদকারী।

প্রহ্লাদপুর : প্রহ্লাদপুরের প্রস্তর স্তম্ভের লেখ থেকে জানা যায়, এই গ্রামটি গঙ্গার ডান তীরে—গাজিপুর জেলার ধনোপুর মহকুমার ৬ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

পাহোয়া : এই প্রাচীন নগরটি পাঞ্জাবের কারনাল জেলার কাইথাল তহশিলে সরস্বতীর তীরে—থানেশ্বর থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এটি কুরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে।

পালেঠি : গঙ্গা ও অলকনন্দার সংগমে দেবপ্রয়াগের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে এক গহন উপত্যকায় অবস্থিত পট্টিসাদের একটি গ্রাম। এখানে প্রাচীন সব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

পলি : এটি গোরখপুর জেলার বান্স গাঁও তহশিলের ধুরিয়াপার পরগণার একটি গ্রাম। এখানে গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

পম্পা : তুঙ্গভদ্রার একটি উপনদী।

পাঞ্চালদেশ : বেরিলী, বদায়ুন, ফারুখাবাদ, রোহিলখণ্ডের আশপাশ অঞ্চল ও উত্তর প্রদেশের কেন্দ্রীয় দোয়াব অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। মনে হয় পূর্ব সীমানায় ছিল গুমতি। দক্ষিণে চম্বল। এটি হিমালয় থেকে দক্ষিণে চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী বৈদিক সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে পাঞ্চালের লোকদের কথা বারবার এসেছে। আমরা উপনিষদ এবং পরবর্তী সাহিত্যে পাঞ্চালের ব্রাহ্মণদের দর্শন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে দেখি। বৈদিক সাহিত্যে এখানকার রাজাদের নাম উল্লেখ রয়েছে। পতঞ্জলী তাঁর মহাভাষ্যে এবং পাণিনী তাঁর অষ্টাধ্যয়ীতে পাঞ্চালের কথা উল্লেখ করেছেন। পাঞ্চাল নামের উৎপত্তি এবং পাঁচ সংখ্যাটি পুরাণকারদের ভাবিয়েছে। শুরু থেকে বুদ্ধের সময় পর্যন্ত পাঞ্চাল একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। পাঞ্চাল এবং এর রাজকুমারদের কথা জৈন সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অশোক পরবর্তী যুগে গ্রিকরা পাঞ্চাল আক্রমণ করে। বিশাল পাঞ্চাল দেশ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর পাঞ্চাল—রাজধানী অহিছত্র এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল—রাজধানী কাম্পিল্য। উত্তর পাঞ্চাল গঙ্গার পূর্বে এবং অযোধ্যার উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলি নিয়ে গঠিত ছিল। দক্ষিণ পাঞ্চাল পূর্বে যমুনা গঙ্গার মধ্যবর্তী দেশ এবং কুরু ও শূরসেনের দক্ষিণ পূর্বে ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর পাঞ্চালের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা যায়। কিন্তু ৯ম শতাব্দীতে রাজা ভোজ এবং তার পুত্রের রাজত্বকালে এটি আবার

উত্তর ভারতে তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে বিহার থেকে সিন্ধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ১২ শতাব্দীতে এটি আবার গহারওয়ার বংশের রাজত্বকালে তার গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

পারাউলি : কানপুর জেলার ভীতারগাঁওর ২ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম। এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

পারিণাহ : এই স্থানটি পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, তৈত্তরীয় আরণ্যক, লাট্যায়ন শ্রুত সূত্র, কাত্যায়ন শ্রুত সূত্র এবং সাংখ্যায়ন শ্রুত সূত্রে উল্লেখিত। এটি কুরুক্ষেত্রের একটি স্থান।

পরুষণী : রাভি নদী বলে চিহ্নিত এক বৈদিক নদী।

পটল : সিন্ধুর ব-দ্বীপে অবস্থিত। এটি নিম্নসিন্ধুর জল দ্বারা সেচিত অঞ্চলের রাজধানী। গ্রীকরা একে পাটালেন বলত।

পাণ্ডুকেশ্বর : শ্রীনগরের ৫৪ মাইল উঃ পূর্বে উঃ প্রদেশের কুমায়ুনের গাড়োয়াল জেলায় স্থানটি অবস্থিত।

পারিরেয় : (পালি—পারিল্যেয়ক, সং—পারেরক) : এটি একটি বনের নাম। বনটি পারিল্যেয়ক নামে এক হাতি পাহারা দিত। কৌশাম্বীর ভিক্ষুদের মধ্যেকার ঝগড়ার মীমাংসা করতে না পেরে বুদ্ধ এখানে বসবাস করতে এসেছিলেন এবং এক বর্ষা ঋতুপার করেন। ঐ হাতিটি ও একটি বাঁদর বুদ্ধের সেবা করে। কৌশাম্বী থেকে এই বনে আসার পথ ছিল একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে। পারিল্যেয়ক বনসন্দ-এর চিত্র ভারহুতের জাতক পর্যায় রয়েছে। এর অবস্থান অজানা। সম্ভবত এটি কোশাম্বীর অদূরেই ছিল।

পারিবাত : এটি পারিপাত্র পর্বত। নামটি লুডারের তালিকা নং ১১২৩ এ রয়েছে। সর্বপ্রথমে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে পাওয়া যায় যে এটি আর্যাবর্তের দক্ষিণ সীমানা ছিল। স্কন্দ পুরাণও এটিকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল কুমারী খণ্ডের শেষতম সীমা বলেছে। মনে হয় পর্বতটি যে দেশে অবস্থিত—তার থেকেই সেই দেশটিরও নাম নেওয়া হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, দেশটির নাম পো-লি-ইয়ে-তা-লো এবং এক বৈশ্য এর রাজা।

পারজিটার মনে করেন, এটি আধুনিক বিন্ধ্য পর্বতমালার একটি অংশ যেটি ভূপালের পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতমালার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পর্বত কয়েকটি নদীর উৎস যেমন বেদস্মৃতি, বেদবতী, সিন্ধু, বেন্ব, সদানীরা, মহী, চর্মন্বতি, বেত্রবতী, বিদিশা, শিপ্রা, আবরণী। পারিপাত্র বিন্ধ্যপর্বতমালার পশ্চিম ভাগ এবং তা চম্বলের উৎসের কাছ থেকে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত। এটিই বিন্ধ্য পর্বতমালার সেই অংশ· যেখান থেকে চম্বল আর বেতওয়া উৎপন্ন হয়েছে।

পাটন : এটি কাঠমাণ্ডুর ৩ মাইল দক্ষিণে। গোর্খারা নেপাল জয় করার আগে এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পাবা : গোরখপুর জেলার পূর্বে ছোট গণ্ডকের তীরে অবস্থিত পাবা বা পাপা বা পাবাপুরী যার আর একনাম কাসিয়া। কানিংহাম পদ্রাউনা নামে এক প্রাচীন স্থানকে পাবা বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি জৈনদের অন্যতম পবিত্রস্থান। এখানেই রাজা ষষ্ঠিপালের প্রাসাদে বসবাসকালে মহাবীর দেহত্যাগ করেছিলেন। এটাই সেই পাবা যেখানে বুদ্ধ কর্মকার চুন্দের গৃহে আহার করে আমাশায় আক্রান্ত হন। মহাকশ্যপ পাবা থেকে কুশীনগর আসার পথে বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শোনেন। ফা হিয়েনের মহা-পরিনির্বাণ সূত্রের ভাষ্য

অনুযায়ী তিনি তখন রাজগৃহে ছিলেন। মহাসঙ্ঘয়িকার বিনয় অনুযায়ী তিনি তখন গৃহ্যকূটে ছিলেন। মল্লেরা এই নগরে বাস করত। তারা মহাবীর ও বুদ্ধের ভক্ত ছিল। মহাবীর যেখানে শেষ নিঃশ্বাস নেন সেখানে চারটি সুন্দর জৈন মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। বিবিধ তীর্থকল্প অনুযায়ী মঝিঝম পাবাকে অপাবাপুরী বলা হোত। মহাবীরের মৃত্যুর পর নাম পরিবর্তন করে পাবাপুরী রাখা হয়।

পিলঙ্ঘ গুহা : এই গুহাটি ঘোষিতারামা ও কৌশাম্বীর মাঝামাঝি কোথাও ছিল। এটিকে একটি হ্রদ বা পুকুরের মতো দেখাত—কারণ এখানে বৃষ্টির জল জমা হোত। গ্রীষ্মে এটি শুখিয়ে যেত। সন্দক বলে এক পরিব্রাজক স্থানটি পরিদর্শন করে। আনন্দ তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

পিলশন : অঞ্চলটির সীমা সম্ভবত যমুনার তীরে বুলন্দশহর থেকে ফিরোজাবাদ এবং গঙ্গার তীরে কাদেরগঞ্জ পর্যন্ত ছিল। আয়তনে ছিল ৩৩৩ মাইল।

পিমপ্রামা : পিমপ্রামা রাভি নদীর (হাইড্রেওটেস) পূর্বদিকে আদ্রেইস্টাইদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। কেউ কেউ আদ্রিজদের গ্রিক বর্ণিত আদ্রেইস্টাই বলে চিহ্নিত করেন। আদ্রেস্টাই বা অদ্রষ্ঠরা আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

পিপুলিবন : এটি মোরীয়দের দেশ। কে কেউ বস্তি জেলার বাউপুর তালুকের পিপরাওয়া গ্রামের সঙ্গে পিপ্পলিবনের মিল খুঁজে পান।

পিপরাওয়া : সম্ভবত পিপরাওয়াতেই বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নের ওপরকার স্তুপই ভারতের উত্তর অংশের প্রাচীনতম আবিষ্কার। এটি নেপাল সীমান্তে বস্তিজেলার উত্তরে অবস্থিত। বাউপুর তালুকের পিপরাওয়াতেই বিখ্যাত পিপরাওয়া ফুলদানী পাওয়া গিয়েছিল। ফ্লিটের মতে এটিই কপিলাবস্তু। রিজ ডেভিস মনে করেন, বিরুঢ়ক কর্তৃক পুরোন নগর ধ্বংস হয়ে যাবার পর এই নতুন নগরটির নির্মাণ করা হয়।

প্লাকশ প্রাশ্রবন : সরস্বতী যে অঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যায়—সেখানকার নাম।

পোটোডা : এটি সম্ভবত হিন্দোলের পোটাল।

প্রভাস : এলাহাবাদের ৩২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে তহশিল মঝহানপুরে যমুনার উত্তর তীরে নদীর দিকে ঝুঁকে পড়া এক পাহাড়ের মাথায় প্রাচীন প্রভাস অঞ্চল অবস্থিত ছিল। প্রভাসের পাহাড়টি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে একমাত্র পাহাড়। প্রাচীন কৌশাম্বীর বিরাট দুর্গ কোশাম-খিরাজের ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে এটি অবস্থিত। এখানে কিছু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রকাশা : তাপ্তী ও গোমতীর সংগমে ধুলিয়ার ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে স্থানটি অবস্থিত।

প্রস্থল (পটল) : সম্ভবত এটি আধুনিক বাহমনাবাদের কাছে বা বাহমাবাদেই অবস্থিত ছিল। বাহমনাবাদে অনেক প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে। গ্রিক বর্ণিত ছোট্ট রাজ্য পটলেনকে সিন্ধুর ব-দ্বীপ বলে চিহ্নিত করা হয়। সম্ভবত রাজধানী নগর পটালা থেকেই নামকরণ। আলেকজাণ্ডারের অনেক পরে এটি ব্যাকট্রিয়া গ্রিকদের দখলে আসে। পরে শক বা ইন্দো-স্কাইথিয়ান শাসকেরা ইন্দো-গ্রিকদের হাত থেকে এটি ছিনিয়ে নেয়। ভূগোলবিদ টলেমির কথায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এটি ইন্দো-স্কাইথিয়ানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

অধিকৃত অঞ্চল ছিল।

প্রয়াগ : রামায়ণ অনুযায়ী রাম, লক্ষণ ও সীতা অযোধ্যা থেকে আসার পরে গঙ্গা যমুনার সংগমের এই নগর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখেছিলেন। মহাভারত বলে এটি জগতের পবিত্রতম অঞ্চল। হরিবংশ বলেছে মহান ঋষিরা সর্বদাই এর কথা বলেছেন। যুধিষ্ঠির প্রয়াগে স্নান করেছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। কুর্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণও এর উল্লেখ করেছে। ভিটাতে প্রাপ্ত কয়েকটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে এই অঞ্চলের কয়েকজন রাজার নাম জানা যায়। (১) মহারাজা গৌতমীপুত্র শ্রী শিবমেঘা। (২) রাজন বশিষ্ঠপুত্র ভীমসেন (২য় বা তৃতীয় খ্রিঃ) মহারাজা গৌতমীপুত্র বৃষবিজ (৩য় বা ৪র্থ খ্রিঃ)। আদিত্যসেনের অফসদ প্রস্তরলিপি থেকে জানা যায় যে মৌখারী রাজা ঈশানবর্মার বিজেতা কুমারগুপ্ত এখানে ধর্মীয় আত্মহত্যা করেছিলেন।

প্রয়াগ (চীনা-পো-লো-ইয়ে-কিয়া) হচ্ছে আধুনিক এলাহাবাদ। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী এটি একটি ক্ষেত্র। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রয়াগকে তীর্থক্ষেত্র বা গঙ্গার ওপর একটি ঘাট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মহাপনাদের প্রাসাদ জলে ডুবে যায়। এটি গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী নদীর সংগম। হিন্দুদের কাছে সংগম অতি পবিত্রস্থান। সৌরপুরাণ গঙ্গা-যমুনার সংগমের কথা বলেছে। কালিদাস রঘুবংশে এই সংগমের কথা উল্লেখ করেছেন। রাম, লক্ষণ ও সীতা লক্ষ্য করেছিলেন সংগমের জলের দুটি বর্ণ।

ফা হিয়েন বলেছেন, এই দেশটির আয়তন ৫০০০ খ্রিঃ এবং রাজধানী ২০লী তিনি এই দেশ, তার আবহাওয়া ও অধিবাসীদের প্রশংসা করেছিলেন। তার কথায় এখানে মাত্র দুটি বৌদ্ধ বিহার ও অনেক দেবমন্দির ছিল। বেশির ভাগ অধিবাসী ছিল অবৌদ্ধ। ব্রহ্মপুরাণ বলেছে, কুরু, দুষ্মন্ত ও ভরত এখানে রাজত্ব করেছেন। বিক্রমোর্বশীর নায়ক পুরুরবা এখানকার শাসক ছিলেন। রাজা ধংগ জাহ্নবী ও কালিন্দীর জলে ডুবে স্বর্গসুখ লাভ করেছিলেন। কামাউলি দানপত্র অনুসারে গাহদাবলে জয়চন্দ্র প্রয়াগের স্নান করেছিলেন।

পুপফাবতী : কাশীরাজ্যের রাজধানীর অন্যতম একটি নাম। কাশীরাজ একরাজের পুত্র ছিল চন্দ্র-কুমার। তিনি অন্তরের সঙ্গে দান করতেন এবং ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে তিনি আহার করতেন না।

পূর্বারাম (পুব্বারাম) : শ্রাবস্তীর জেতবনের উত্তরপূর্বে এই বিহারটি অবস্থিত ছিল। বিশাখা এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নির্মাণে কাঠ এবং প্রস্তর ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি দ্বিতল ছিল। এই বিহারটি পূর্বরামা মিগারমাতুপাসাদ বলে পরিচিত ছিল। বুদ্ধ এই বিহারে বাস করার সময়ে অগ্গঞ্ঞ সুত্তন্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন।

পুষ্কলাবতী (পুষ্করাবতী) : এরিয়ানের পিউকেলাওটিস এবং ডায়নিসিয়াসের পিউকালেই। সিন্ধুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত গান্ধারের প্রথম দিককার রাজধানী। সোয়াত এবং কাবুল নদীর সংগমের একটু ওপরে আধুনিক চারসদ্দা (চারসদা)কে পুষ্কালাবতী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন পদ্মনগর বলে পরিচিত এই নগরটিকে সোয়াত নদীর তীরে পেশওয়ারের ১৭ মাইল উত্তর পূর্বে আধুনিক চারসদ্দা বলেই চিহ্নিত করা উচিত। কথিত আছে, রামের ভাগিনেয় এবং ভরতপুত্র পুষ্কর এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা।

কালিদাস রঘুবংশে বলেছেন, পুষ্কল এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং এটি রাজধানী নগর। হস্তি (গ্রিক অ্যাসটেস) নামে এক রাজা আলেকজাণ্ডারের সময় এখানে রাজত্ব করতেন। টলেমি বলেছেন, এখানে একটি বড় এক জনপূর্ণ নগর ছিল। রাজা মাউয়েসের সময় এটি শক অধিকারে আসে (৭৫ খ্রিঃ পূঃ)। তারানাথ বলেন, কনিষ্কের পুত্র এখানে বসবাস করতেন। বৃহৎ সংহিতায় এটিয়ে একটি বড় নগর বলা হয়েছে।

রৈভ্য আশ্রম : হরিদ্বারের অদূরে উত্তরে কুবজামরাতে এটি অবস্থিত ছিল।

রত্নবাহপুর : ঘর্ঘরার জল সেবিত এই নগরটি কোশলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা ভানুর স্ত্রীর গর্ভে ধর্মনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মনাথের নামে একটি মন্দির গড়া হয়।

রাধাকুণ্ড : এটি আরিট নামেও পরিচিত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ষাঁড়বেশী দৈত্য অরিষ্ঠকে এখানে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সখী রাধা ষাঁড় হত্যাকারীর শরীর স্পর্শ করতে না চাইলে শ্রীকৃষ্ণ স্নানের জন্যে ঐখানে একটি পুকুর খনন করিয়ে তাতে স্নান করে গোবধের পাপমুক্ত হন। পুকুরটিকে বলা হয় শ্যামকুণ্ড। রাধাও তার পাশে একটি পুকুর খনন করান। নাম হয় রাধাকুণ্ড।

রাজপুরা (কো-লো-শে-পু-লো) : কাশ্মীরের দক্ষিণ রাজৌরীকে রাজপুরা বলে চিহ্নিত করা হয়। রাজৌরী জেলার উত্তরে পীরপাঞ্জাল, পশ্চিমে পুনাট (পুঞ্চ), দক্ষিণে ভীমবার. পূর্বে রিহাসী ও অকনূর।

রাজঘাট : বারাণসীর রাজঘাটে গোবিন্দ্রচন্দ্রের দুটি তাম্রফলক পাওয়া গেছে।

রামদাসপুরা : এটি পাঞ্জাবের অমৃতসর। একজন শিখগুরুর নামে এই শহর। ঐ শিখগুরু একটি প্রাকৃতিক নালার ধারে কুটির বানিয়েছিলেন। স্থানটি গুরু নানকের খুব প্রিয় ছিল।

রামগঙ্গা : আলমোড়ার ওপর দিকে কুমায়ুন পর্বতমালা থেকে নির্গত গঙ্গার একটি উপনদী ফারক্কাবাদ ও হরদেইয়ের মাঝামাঝি গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

রামগাম : অযোধ্যার বস্তি জেলার রামপুর দেওরিয়াতে এটি অবস্থিত। কোলিয়রা এখান বসতি স্থাপন করে। বুদ্ধের সময়কার এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী রয়েছে। মহাবস্তু অনুসারে কোলিয়রা কোলার বংশধর। কুনাল জাতকে বলা হয়েছে এরা কোলা গাছের নিচে বসবাস করত। তাই তাদের নাম হল কোলিয়। বুদ্ধ কোলিয় ও শাক্যদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। রোহিণী নদীর জল নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ হোত। কানিংহাম আধুনিক রোয়াই বা রোহওয়েনি নামে গোরখপুরে মিলিত রাপ্তির এক ছোট উপনদীকে রোহিণী বলে চিহ্নিত করেন।

রাশ (দত্তওয়ার) : অর্শ জেলা (সঃ—উরশ)কে কানিংহাম চিহ্নিত করেছেন। হিউয়েন সাঙ এটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি স্থানটি তক্ষশিলা ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল বলে বলেছেন। এটি চিনা—খু-লা-শি।

রোহিণী : নদীটি শাক্য ও কোলিয়দের রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণ করত।

সহলাটবি : বাতাটবি দেখুন।

শম্ভু : গ্রিকরা বলত সাম্বোস। প্রাচীন গ্রিক লেখকদের মতে সাম্বোরা।

মেউসিকানোসদের সংলগ্ন পাহাড়ী অঞ্চলে রাজত্ব করত। এই দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও শত্রুতা ছাড়া কিছুই আর ছিল না। রাজধানী ছিল সিন্দিমান। সিন্দুনদীর তীরে সেওয়ানকে শম্ভু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্বোসা আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে।

সংকাশ্য (পা—সংকসন) : এটিকে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ফারুকাবাদ জেলার সনকাশিয়া গ্রাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানটি কুদারকোটের ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, আজমগড় পরগণার আলিগঞ্জের ১১ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে, এবং এটওয়ার ৪০ মাইল উত্তর—উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কেউ কেউ আবার স্থানটিকে বর্তমান অত্রানজি ও কনৌজোর মধ্যবর্তী প্রাচীন ইক্ষুমতী—বর্তমান কালিনদীর তীরে, এটওয়া জেলার ফতেগড়ের ২৩ মাইল পশ্চিমে এবং কনৌজের ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বলে মনে করেন। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য অনুসারে এটি গবিধুমঠের থেকে ৪ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। এখানে প্রচুর পুরাতত্ত্ব বিষয়ক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

সপ্তসিন্ধু : পাঞ্জাবের এইস্থানে অভিবাসী আর্যেরা প্রথম বসতি স্থাপন করে। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। সপ্তসিন্ধু হচ্ছে এরকম : ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু, সিন্ধু ও সরস্বতী।

সরভূ (সরযূ) : রামায়ণ বলে, রাজা দশরথ এই নদীর তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ অনেক প্রখ্যাত ঋষিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। রামলক্ষণ গঙ্গা ও সরযূর সংগম পরিদর্শন করেন। মহাভারতে এই নদীকে বলা হয়েছে সরযূ। পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী, বিষ্ণুস্মৃতি এবং যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। কালিকাপুরাণ সরযূকে এক পবিত্র নদী বলে উল্লেখ করেছে। পদ্মপুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশেও এর উল্লেখ রয়েছে। হিমালয় থেকে নির্গত এই ঋগ্বেদীয় নদী পার হয়ে গিয়ে তুর্বসু ও যদুরা চিত্ররথ আর অরণ পরাস্ত করেছিল। এটিই 'গঘরা বা গোগরা—গঙ্গার একটি উপনদী যার তীরে অযোধ্যা নগর অবস্থিত ছিল। এটি টলেমির সরাবোস। বৌদ্ধ সাহিত্যের পঞ্চ বিশাল নদীগুলির অন্যতম। বিহারের ছাপরায় এটি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাহরেইক জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে একটি উপনদী এসে এর সঙ্গে মিশেছে, যুগ্ম ধারার নাম সরযূ। পুরাণে বারবার উল্লেখিত এই নদীর তীরেই ছিল অযোধ্যা। রামায়ণের মতে অযোধ্যা নগরের অর্ধক্রোশ দূরে সরযূ নদী অবস্থিত ছিল। হপকিন মনে করেন, এটা পশ্চিমী কোন নদী।

সরস্বতী : সরস্বতী আর দৃষদ্বতী এই ঐতিহাসিক নদী দুটি সিন্ধুনদী জোটের বাইরে দুটি স্বতন্ত্র ধারা। মনু বলেছেন এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্রহ্মাবর্ত। মিলিন্দ-পঞহোতে সরস্বতীকে হিমালয়জাত নদী বলা হয়েছে। এটি দক্ষিণে সিমলা ও সিরমারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। যেখানে নদীটি অদৃশ্য হয়—সেই স্থানটিকে মনু বিনাশন বলেছেন। তৈত্তরীয় সংহিতা, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ঋগ্বেদ এই নদীর কথা উল্লেখ করেছে। বিষ্ণুস্মৃতি ও পদ্মপুরাণ বলেছে গঙ্গোভেদতীর্থে এই নদীটি গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। কাত্যায়নের শ্রুতসূত্র, লাট্যায়নের শ্রুত সূত্র, অশ্বল্যায়নের শ্রুতসূত্র এবং সাংখ্যায়নের শ্রুতসূত্রে বলা হয়েছে, এই নদীর তীরে যজ্ঞাদি অতি পবিত্র

কর্ম। কালিদাসের রঘুবংশ ও মেঘদূতে, এবং যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে যথার্থ বলা হয়েছে যে সরস্বতীকে এক স্থানে দেখা যায়। আর একস্থানে সেটি অদৃশ্য থাকে। এই নদীটি আজও শতদ্রু ও যমুনার মধ্যস্থল দিয়ে বয়ে যায়। বৈদিক আর্যেরা এই নদীটি অতি শক্তিশালী এবং সাগরে পতিত হয় বলে জানতেন। হিমালয় পর্বতমালার সিরমার বা শিবালিক পর্বতশ্রেণিতে এটি উৎপন্ন হয়ে আম্বালার আদবদ্রিতে সমতলে উপস্থিত হয়। মহাভারত বলেছে, পুর্বপুরুষদের পিণ্ডদান এই নদী তীরে করা হয়। এই নদী তীরে অম্বিকাবন বলে একটি পবিত্র বন ছিল।

সরাবতী : রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। বাহরেইচ এবং গোণ্ডা জেলার শ্রাবস্তীকে এই নামে চিহ্নিত করা হয়।

সরদা (সরদী) : কাশ্মীরের কামরাজের কাছে মধুমতী ও কিষেনগঙ্গার সংগমে, কিষেনগঙ্গার ডান তীরে এই পবিত্র স্থানটি অবস্থিত। ঋষি শাণ্ডিল্য এখানে তপস্যা করেছিলেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করে গৌড়ের এক রাজাকে হত্যা করলে বাঙ্গালীরা এই মন্দির দেখার ছলে কাশ্মীরে প্রবেশ করে পরিহাস কেশবের মূর্তি বলে ভুল করে বিষ্ণু মূর্তি ধ্বংস করে। শঙ্করাচার্যকেও প্রশ্নমালার উত্তর না দেওয়া অবধি এই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

শতদ্রু : আধুনিক সটলেজ—গঙ্গার এক উপনদী। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে এটি পাঞ্জাবের পুর্বপ্রান্তের শেষ নদী। এটি যক্ষ নিরুক্ত, বিষ্ণুস্মৃতি, ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এরিয়ানের সময় নদীটি স্বতন্ত্রভাবে কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়ত। হস্তিনাপুরের রাজা সুবাহুর পুত্র সুধনুর স্ত্রী কিন্নরী মনোহরা কৈলাস পর্বতে যাবার পথে এই নদী অতিক্রম করেছিলেন। টলেমির জারাদ্রোস এবং প্লিনির হেসিদ্রাস নদী হচ্ছে এই শতদ্রু, একটি হিমালয় পর্বতমালা জাত নদী এবং এর অববাহিকা মূলত উত্তর হিমালয় অঞ্চল। এর উৎপত্তি স্থল মানস সরোবরের পশ্চিম হ্রদের পশ্চিম অঞ্চল। কামেত পাহাড়ের কাছে দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁক নেওয়া পর্যন্ত এর পশ্চিমী গতি। অতীতে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল। বিতস্তা ও শতদ্রুর মিলিত ধারার নাম ঘর্ঘর। মহাভারতে শতদ্রুর উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই শতদ্রু তার গতিপথ পালটেছিল।

সৌরীপুরা : জৈনসূত্রে কথিত মথুরার এটি অপর নাম।

সাগল : মদ্রদের রাজদানী সাগল বা শাকল (শে-কি-লো)কে টলেমি বলেছেন, ইউথইডেমিয়া। রাভি নদীর পশ্চিমে সাংগ্লাওয়ালা টিবাকে কাহিংহাম শাকল বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বলেন, মদ্ররাজ শল্যের দুর্গ শিয়ালকোটই সাগল। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, নগরে ১০০ ভিক্ষু সমেত একটি হীনযানী বিহার ছিল। এই বিহারেই বসুবন্ধু লিখেছিলেন 'অভিধর্মকোশ ব্যাখ্যা'। অশোক এখানে ২০০ফুট উঁচু একটি স্তুপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। মিলিন্দপঞ্‌হ অনুসারে এটি বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। মহাভারত ও দিব্যাবদানে এই নগরের উল্লেখ রয়েছে। আলেকজাণ্ডার ৩২৬ খ্রিঃ পূঃ এই নগর জয় করেন। পার্শ্ববর্তী ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যবর্তী এক সামন্তের পরিচালনায় নগরটিকে রেখে যান। ম্যাসিডোনিয়ানরা শাকল ধ্বংস করলেও ব্যাকট্রিয়ান গ্রিক ডেমোট্রিয়স এটিকে পুর্ননির্মাণ করেন এবং পিতার নামে নামকরণ করেন ইউথিডেমোর্স। ৭৮ খ্রিঃ রাজা মিরান্দার

সময়ে প্রজারা সুখে বসবাস করত। মিরান্দার পূর্বেই শাকল বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এসেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে হুণরাজ মিহিরকুলের রাজধানী ছিল শাকল। মদ্র, কলিঙ্গ, বারাণসী মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল।

সাকেত : উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল সাকেত। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি টলেমির সোগেদা, ফাহিয়েনের শাচি। এটি কোশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর হয়ে উঠেছিল। এখান থেকে যমুনার তীরে কৌশাম্বী যাওয়া যেত। এটি কোশলের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের একটি নগর। এটি ভারতের ছটি বৃহৎ নগরের অন্যতম ছিল। বুদ্ধের সময়ের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই এটি কোশলে রাজধানী হয়ে ওঠে। এই নগরেই বিশাখা মৃগমাতার পিতা ধনঞ্জয় বাস করতেন। সারিপুত্র এখানে একবার এসেছিলেন। এক শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীকে নিরাময় করার জন্যে জীবক এই নগরে এসেছিলেন। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী যাবার পথ দস্যু অধ্যুসিত ছিল। সাকেত গুপ্ত অধিকারে ছিল।

শাল্ব : গোপথ ব্রাহ্মণে শাল্বদেশের কথা উল্লেখ রয়েছে। পাণিনীর সূত্রে বলা হয়েছে, আউদুমবর (উদমবর), তিলাখলা, মদ্রকার, যুগন্ধর, ভূলিঙ্গ এবং শরদণ্ড নিয়ে শাল্বরাজ্য গঠিত ছিল। পাণিনী বৈধুমাগনি নামে একটি নগরের কথাও উল্লেখ করেছেন। নগরটি শাল্বদেশের বিধুমাগনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যেও এই দেশের কথা রয়েছে। বর্তমানে অলওয়ার রাজ্যটিই সম্ভবত শাল্বদেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ দেশটিকে পশ্চিমে অবস্থিত বলে বলেছে। মহাভারত অনুযায়ী এটি কুরুক্ষেত্রের নিকট অবস্থিত ছিল। এটিই সাবিত্রীর স্বামী সত্যবানের পিতার রাজ্য ছিল। রাজধানী ছিল শাল্বপুর বা সুভগ নগরী। মহাভারতের যুদ্ধে শাল্বেরা কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিল।

সামগাম : এটি শাক্য রাজ্যে অবস্থিত। বুদ্ধ এখানে একবার বাস করেছিলেন।

সাংগল : ফতগড়ের কাছে গুরুদাসপুর জেলার কোথাও এই দুর্গ নগরটি ছিল। এটি কাথিয়ানদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই কাথিয়ানরা স্বাধীন উপজাতি রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী ছিল।

সারনাথ (সারংগনাথ) : সারনাথের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে প্রাচীন সারনাথের অবস্থান বারাণসী নগর থেকে সাত মাইল দূরে ছিল। এখানে বৌদ্ধদের অনেক ধ্বংস স্তুপ রয়েছে। ধামেক স্তুপের উত্তরে খনন করে সারনাথ শিলালিপি পাওয়া গেছে। সারনাথের প্রাচীন নাম ইসিপতন মিগদাব (ঋষি পতনম মৃগদাব) যেখানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। কানিংহাম দেখেছিলেন, আধামাইল বিস্তৃত এক বনাঞ্চল যা উত্তরে ধামেকের বিশাল স্তুপ থেকে দক্ষিণের চাউকুন্ডি ঢিবি পর্যন্ত প্রসারিত। ইসিপতনে খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচুর বৌদ্ধবাস করতেন। হিউয়েন সাঙের সময় এটি বৌদ্ধ বিহার সংক্রান্ত একটি কেন্দ্র ছিল এবং প্রায় ১৫০০ সম্মিতিয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ এখানে বাস করত। তারা সেখানে হীনযান মতের শিক্ষা নিত। ঋষিপতনমের হরিণ-উদ্যানের উদ্ভব সম্পর্কে নিগ্রোধ মৃগ জাতকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বারাণসী রাজা মৃগদের জন্যে এই অভয়ারণ্য দান করেছিলেন। সারনাথ বিহার বর্না নদীর ১০৭ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল।

সময়ে সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে বসবাস করে গেছেন। নথিভুক্ত আলোচনার মধ্যে সারিপুত্ত ও মহাকোত্থিত এবং মহাকোত্থিত ও চিত্তহাথি-

সারিপুত্রের মধ্যেকার কথাবার্তাই উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ তার শিষ্যদের বলেছিলেন, অন্যান্য চারটি স্থানের মধ্যে ইসিপতন-মৃগদাবও পরিদর্শন করা উচিত। প্রথম ধর্মজ্ঞান দেওয়া থেকে শুরু করে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনাই ইসিপতনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

সাবত্থি (শ্রাবস্তী) : প্রাচীন শ্রাবস্তীর বর্তমান স্থান সাহেত-মাহেত। সমগ্র স্থানটি উঃ পূঃ অযোধ্যা, গোণ্ডা ও বাহরেইচ জেলার সীমান্তে ছড়িয়ে আছে। বলরামপুর রেলস্টেশন থেকে এখানে পাওয়া যায়। দূরত্ব ২৬ মাইল। এটি লুডারের তালিকায় সাবস্তি নামে রয়েছে। বলরামপুর থেকে ১০ মাইল, অযোধ্যা থেকে ৫৬ মাইল উত্তরে এবং রাজগীর থেকে ৭২০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল উত্তর কোশলের এই রাজধানী। এখান থেকে অনেক পুরাতত্ত্বের জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—যার বেশির ভাগটাই বৌদ্ধ, কিছু জৈন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের। বুদ্ধঘোষ অনুযায়ী ঋষি সাবত্থের নাম থেকেই এই নগরীর নাম। প্রথম দিকে একটি ধর্মীয় স্থান হিসাবে নগরীটি গড়ে ওঠে। পরে মানুষের প্রয়োজনে সবকিছু পাওয়া যায় বলে নাম হয় সাবত্থি (সব্বং—অত্থি)। কথিত আছে নগরটি রাজা শ্রাবস্ত বা শ্রাবস্তক নির্মাণ করিয়েছিলেন। মৎস্য ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে যুবনাশ্বের পুত্র ছিলেন রাজা শ্রাবস্ত বা শ্রাবস্তক। মহাভারতে বলা হয়েছে শ্রাবস্ত রাজা শ্রাবের পুত্র এবং যুবনাশ্বের দৌহিত্র। হর্ষচরিতে বলা হয়েছে, একদা শ্রাবস্তীর রাজা ছিলেন শ্রুতবর্মা। কথাসরিৎ সাগর ও দশকুমারচরিত দেবসেনা ও ধর্মবধন নামে দুজন রাজার নাম করেছে। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রাবস্তীকে কোশলের রাজধানী হিসাবে দেখান হয়েছে। রাজগৃহ থেকে অলকা এবং অস্মক পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথে শ্রাবস্তী এবং বনশ্রাবস্তী নামে বিশ্রাম নেবার দুটি স্থানের উল্লেখ রয়েছে। আরও একটি রাজপথ থেকে থাকবে যে পথে কিটাগিরি হয়ে বারাণসী যাওয়া যেত।

অচিরাবতী নদীর তীরে ছিল শ্রাবস্তী। জেতবন ও পুব্বারাম—এই দুটি ছিল প্রভাবশালী বৌদ্ধবিহার। বুদ্ধের জীবনকালেই এই দুটি নির্মিত হয়েছিল। শ্রাবস্তী ব্রাহ্মণ্যবাদেরও একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন জানুসোনী। বোধিসত্ত্বদানকল্পলতা অনুযায়ী স্বস্তিক নামে এক ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্যে কৃষিকাজ গ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজকুমার জেত। তারই নামে জেতবন মহাবিহার। নগরের কাছে প্রসেনজিতের রানী মল্লিকার নামেও একটি বিখ্যাত উদ্যান ছিল। মহাবিহার দান করার জন্যে এবং বিশাখা পূর্বরাম বিহারের জন্যে অমর হয়ে আছেন। শ্রাবস্তীর জাগতিক উন্নতির কারণ হচ্ছে, এটি তিনটি প্রধান রাজপথের সংগম এবং শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার জন্যে। সোহগৌরের তাম্রশাসনে জানা যায় যে জনপথের ধারে উপযুক্ত অঞ্চলে সব গুদাম নির্মাণ করানো হয়। সেই গুদামগুলিতে সার্থবাহদের ব্যবহারের জন্য দড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র থাকত।

শ্রাবস্তী শুধুমাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র ছিল তাই নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতিরও কেন্দ্র ছিল। শম্ভুনাথ ও চন্দ্রপ্রভানাথ নামে দুজন জৈন তীর্থঙ্করের জন্মস্থানকে জৈনরা চন্দ্রপুরী বা চন্দ্রিকাপুরী বলেও অভিহিত করত। বিবিধতীর্থকল্প অনুযায়ী শ্রাবস্তী নগরে শ্রীসম্ভবনাথের মূর্তি সম্বলিত একটি চৈত্য ছিল। সন্ন্যাসী কপিল এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছিলেন। রাজা জিতশত্রুর পুত্র ভদ্র এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিচ্ছেদের পর এই নগরে মহাবীর প্রথম গোশাল-মংখলিপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহাবীর একাধিকবার

এইনগর পরিদর্শন করেন ও একটি বর্ষাঋতু এখানে পার করেন। এই নগরটি ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ যথাক্রমে ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে পরিদর্শন করেন। ফা হিয়েনের সময় এই নগরে লোকসংখ্যা কম ছিল। তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক নির্মিত বিহারের স্থান, অনাথপিণ্ডিকের গৃহের কূয়ো ও প্রাচীব এবং যেস্থানে অঙ্গুলীমাল অর্হৎ অর্জ্জন করেন সেগুলি দর্শন করেন।

হিউয়েন সাঙের মতে—নগরের বেশির ভাগই ছিল ধ্বংসাবশেষ। অধিবাসীর সংখ্যা কম। শত শত বৌদ্ধ বিহারের বেশির ভাগই ধ্বংসস্তুপ। কিছু দেবমন্দির ছিল। অবৌদ্ধদের সংখ্যা অসংখ্য। মহাযান পন্থীদের কিছু স্তুপ চৈত্য—বৌদ্ধবিহারও ছিল।

শ্রাবস্তীর রাজনৈতিক, সম্পদ এবং জনসংখ্যা একেবারে কমে যায়। জেতবন মহাবিহারের নির্মাতা অনাথপিণ্ডিক তাঁর ৫৪ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে শেষ পর্যন্ত কপর্দকহীন হয়ে মারা যান। ব্যবসায় আরও আঠারো কোটি এবং অচিরাবতীর বন্যায় আরও আঠারো কোটি লোকসান হয়েছিল তাঁর। বুদ্ধের দিন থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই নগর এবং তার জেতবন মহাবিহার প্রায় ১৮০০ বছর ধরে ঐ বিশ্বব্যাপী মহান ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়েছিল।

সেতব্য : কোশল দেশের এই নগরটি উক্কথের কাছে অবস্থিত ছিল। উক্কথ থেকে সেতব্য পর্যন্ত একটি রাস্তা ছিল। কুমার কশ্যপ একবার বিশাল ভিক্ষু বাহিনী নিয়ে সেতব্যে যান এবং সেতব্য প্রধান পায়াসিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

সেত মাহেত : সেত বা সাহেত গোণ্ডা ও বাহরেইচ জেলার সীমান্তে রাপ্তি নদীর তীরে অযোধ্যা থেকে ৫৮ মাইল উত্তরে এবং গোণ্ডা থেকে ৪২ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। এখানকার এক বৌদ্ধবিহার থেকে একটি লেখ পাওয়া গেছে যাতে লেখা রয়েছে : জনৈক দাতা বারাণসীর গঙ্গায় স্নান করে বাসুদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে কিছু গ্রাম বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করেন।

শোরকোট : স্থানটি ঝিলাম ও চেনাব সংগমের কিছু ওপরে অবস্থিত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এর আয়তন ৫০০০ লী। এটি একটি বিশাল ধ্বংস স্তুপ। রাজা শোর সম্ভবত এই নগরের পত্তন করেন। এই নগরের পূর্বে ছিল শতদ্রু। উত্তরে টাকি প্রদেশ, দক্ষিণে মুলতান এবং পশ্চিমে সিন্ধু। ধ্বংস স্তুপ থেকে পাওয়া মুদ্রা থেকে এর প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

সিদ্ধাশ্রম : এই স্থানটি রাম ও বিশ্বামিত্র পরিদর্শন করেন। এটি একটি সুন্দর আশ্রম ছিল। আশ্রমের অবস্থান নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। রামায়ণ অনুযায়ী এটি কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি মধ্যে মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, এটি বিহারের বক্সারে। কথিত আছে এখানে বিষ্ণু বামন অবতার রূপে আবির্ভূত হন।

শিহপ্পপাত : কুনাল জাতকে বলা হয়েছে এটি হিমালয়ের একটি হ্রদ।

সিক্কিম : দার্জিলিং জেলার উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে এটি আয়তনে ৩০০০ বর্গমাইল। হিমালয়ের মধ্যেই এর অবস্থান।

সিমসপাবন : এটি সেতব্যের কাছে। এখানে শ্রদ্ধেয় কুমারকশ্যপ বাস করতেন।

সিন্ধু (ইণ্ডাস) : সিন্ধু বা চৈনিক সিন্টু উত্তর ভারতের প্রখ্যাত নদী। সিন্ধু আটক পার হয়ে সোজাসুজি দক্ষিণে—সুলেইমান পর্বতমালার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়। ঋগ্বেদের মতে সিন্ধু সব নদীকেই ছাড়িয়ে গেছে। এটি ঋগ্বেদ, অথর্ববেদে উল্লিখিত। তৈত্তরীয় সংহিতার সিন্ধব শব্দটি সিন্ধুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পতঞ্জলী ও পাণিনী উভয়েই এর উল্লেখ করেছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রতে সিন্ধুর ডান তীরে অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র ও যবনদের মধ্যেকার যুদ্ধের কথা বলে। কালিদাসের মেঘদূতেও এর উল্লেখ রয়েছে।

আলবেরুনীর মতে চেনাব সংগমের ওপরের অংশটুকুই সিন্ধু নামে অভিহিত। এর পর থেকে অরোর পর্যন্ত অংশ পঞ্চনদ বলে পরিচিত। অরোর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এর নাম মিহরান। দারায়ুসের বেহিস্তুন লেখতে একে হিন্দু এবং ভিন্দিদান লেখতে হেন্দু বলা হয়েছে। সিন্ধুর নাম থেকেই দেশের নামটি নেওয়া হয়েছে। জৈন জম্বুদীবপন্নতি ভারতের চারটি নদী—গঙ্গা, রোহিতা (ব্রহ্মপুত্র), সিন্ধু এবং হরিকান্তার উৎস হিসাবে হিমালয় পর্বতমালার ছোট অংশের একটি ও অন্যটি হিমালয় পর্বতমালার বড় অংশের যমজ পদ্ম সরোবরের কথা বলেছে।

সিন্ধু একটি 'ট্রান্স হিমালয়ান' নদী। একাধিক হিমবাহ একে পুষ্ট করে। সম্ভেদ ও সংগম নামেও এটি পরিচিত। প্লিনির কাছে সিন্ধু জোট হচ্ছে, সিন্ধু ও অন্যান্য উনিশটি নদী নিয়ে গঠিত। এর প্রধান উপনদী হাইড্রাওটেস, একেসাইনস, হাইপাসিস, হাইডাস্পেস, কোফেন, পারিনোস, সপারনোস এবং সাওনোস।

সিনেরু : বৌদ্ধ সাহিত্য এবং শাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি মেরু পর্বত ৬৮০০০ লিগ উঁচু। বদরিকাশ্রমের কাছে রুদ্র হিমালয়কে সিনেরু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্ভবত এটি এরিয়ানের মেরোস পর্বত।

সিংহপুরা (সেং-হো-পু-লো) : তক্ষশিলার ১১৭ মাইল দক্ষিণ পূর্বে-স্থানটি অবস্থিত ছিল।

সীর্শ : এটি হরিয়াণার হিসার জেলায়। এখানকার এক ঢিবি থেকে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

শিবিপুর : শোরকোটের একটি লিপি থেকে জানা যায়, শিবি রাজ্যের রাজধানী ছিল শিবিপুর বা শিবপুর। পাণিনী বলেছেন শিবদের দেশ উত্তরে ছিল। পাঞ্জাবের ঝং এর শোরকোট অঞ্চল যা ধরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী ছিল—সেইখানেই বাস ছিল শিবিদের এবং তাদের উত্তরাপথ বা উত্তর ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরা সম্ভবত খুব প্রাচীন জাত এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। কারণ, গ্রিক ভৌগোলিকরা বা আলেকজাণ্ডারের ঐতিহাসিকরা এমন কি পাণিনী পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই এর নাম উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে শিবিরা সম্ভবত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে অভিবাসন করেছে। মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তারে শিবিরাজ্যকে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বলা হয়েছে। অরিট্রপুরা ছিল শিবিরাজ্যের রাজধানী। অরিট্রপুরা সম্ভবত টলেমির অ্যারিসটো-বোথরা যা পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং এটি দ্বারাবতীও হতে পারে। ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্ববদানকল্পলতায় শিববতী বলে একটি নগরের কথা বলেছেন। এই নগরটি শিবি দেশের রাজধানীর মতোই। ঐ নগরে রাজা ছিলেন শিবি। প্রাচীন গ্রিক লেখকরা পাঞ্জাবের

সিবোইকে শিবিদেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

শোণ (শোণা) : এটি গঙ্গার নিম্নভাগে সবচেয়ে বড় উপনদী। আধুনিক শোণই হচ্ছে এরিয়ানের শোন। নদীটি জব্বলপুর জেলার মইকাল পর্বতমালায় উৎপন্ন হয় উত্তর পূর্বে বাঘেলখণ্ড, সাহাবাদ ও মির্জাপুর জেলার ভেতর দিয়ে পাটনার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। রামায়ণে বলা হয়েছে, এই সুন্দর নদীটি গিরিব্রজকে ঘিরে থাকা পাঁচটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এবং মগধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হোত—তাই এর নাম মাগধী। পদ্মপুরাণে এর কথা আছে। পুরাণগুলি বলে, ঋক্ষপর্বতমালায় উৎপন্ন নদীগুলির মধ্যে এটি একটি। এই নদী অতিক্রম করে দধিচী তাঁর পিতার নির্জনবাসে গিয়ে পৌছোন। রঘুবংশে এই নদীটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মগধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অংশটি সুমাগর বা সুমাগধী নামে পরিচিত।

সোরোন : এর প্রাচীন নাম সুকরক্ষেত্র বা সৎকর্ম স্থান। বড় নগরটি গঙ্গার পশ্চিম তীরে এটহয়া জেলায় বেরিলী ও মথুরার রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল।

শৃঙ্গবেরপুরা : কথিত আছে রাম এখানে গঙ্গা পার হন। কানিংহাম এলাহাবাদের ২২ মাইল উত্তর পশ্চিমে সিংরোরকে শৃঙ্গবেরপুরা বলে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রুঘ্ন : এটি থানেশ্বর থেকে ৩৮/৪০ মাইল দূরে। হিউয়েন সাঙ একে বলেছেন সু-হু-ক'ইন—না। আয়তন ১০০০ লী। পূর্বে গঙ্গা, উত্তরে একটি উঁচু পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝ দিয়ে বয়ে যেত যমুনা। কানিংহামের মতে এটি সিরমোরের ও গারোয়ালের পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল এবং তা ছিল গিরি নদী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আম্বালা ও সাহারানপুর জেলা নিয়ে গঠিত।

স্থানেশ্বর : ভারতের অন্যতম প্রাচীন স্থান। নামটি সম্ভবত স্থানু বা মহাদেব থেকে নেওয়া অথবা স্থানু ও ঈশ্বর যুক্ত করে গঠিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ বলেছেন সা-তা-নি-শি-ফা-লো যা আয়তনে ১১০০ মাইল ছিল। বাণের হর্ষচরিত মতে এটি শ্রীকণ্ঠজনপদের রাজধানী ছিল। বিখ্যাত কুরুক্ষেত্র থানেশ্বরের দক্ষিণ দিকে—আম্বালার ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং পানিপথের ৪০ মাইল উত্তরে। এই নগরে মাথার দিকে ১২০০ বর্গ ফুট আয়তনের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এস. এন. মজুমদার এটিকে বিনয় মহাভগ্ন ও দিব্যাবদান বর্ণিত থুনা (স্থুনা) বলে চিহ্নিত করেছেন। থুনা একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম যা মধ্যদেশের পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারণ করত।

শুক্তিমতী : রাজা বৈশ্রবণের কোসাম (১০৭ খ্রিঃ) লিপিতে এই অঞ্চলের কথা আছে। সম্ভবত স্থানটি কৌশাম্বীর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল। চেতিয় জাতকে স্থানটিকে সোত্থিবতী নগর বলা হয়েছে। এটি চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর রাজধানী ছিল। একই নামে নদীর তীরে নগরটি অবস্থিত ছিল। মহাভারতে নদীটিকে ভারতবর্ষের অন্যতম নদী বলা হয়েছে।

সুমেরু : পদ্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। সিনেরু বা মেরুপর্বতই সুমেরু।

সুমসুমারগিরি (শিশুমার পাহাড়) : এটি ভর্গদের দেশ। এটি ভেসকলাবনে একটি মৃগ উদ্যানে অবস্থিত ছিল। এটি একটি নগর এবং তার রাজধানীকে এমনভাবে ডাকা হোত, কারণ, নির্মাণের সময় কাছের এক হ্রদ থেকে একটি কুমির শব্দ করেছিল। বৎসের

রাজা উদয়নেরও রানী বাসবদত্তার পুত্র রাজকুমার বোধি এই পাহাড়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতেন। প্রাসাদটির নাম ছিল কোকনদ। বৌদ্ধমতে এটি ভর্গরাজ্যের রাজধানী ও দুর্গ। কেউ কেউ এটিকে বর্তমান চুনার দুর্গ বলে চিহ্নিত করেন। এই পাহাড়ে বসবাসকারী এক ধনী তার কন্যার সঙ্গে অনাথপিণ্ডকের পুত্রের বিবাহ দেন।

সুন্দরিকা : প্রাচীন ভারতের সাতটি পবিত্র নদীর অন্যতম। এটি কোশলের একটি নদী এবং খুব সম্ভবত শ্রাবস্তীর অদূরে অচিরাবতী বা রাপ্তির উপনদী ছিল।

সুনেত : লুধিয়ানা শহরের ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি ধ্বংসস্তুপ।

সুসারতু : এটি ঋগ্বেদ বর্ণিত একটি নদী, সিন্ধুর উপনদী।

সুবর্ণগুহা : হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত চিত্রকূট পর্বত।

সুবাস্তু : ঋগ্বেদ বর্ণিত নদীটির আধুনিক নাম সোয়াত।

শ্বেতপর্বত : তিব্বতের পূর্বে হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত।

শ্বেত্যা : ঋগ্বেদ বর্ণিত এই নদীটি সম্ভবত সিন্ধুর একটি উপনদী ছিল।

তক্ষশিলা (শি-শি-চেং) : গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। পাণিনী ও পতঞ্জলী এর উল্লেখ করেছেন। কলিঙ্গ শিলালিপি-১এ এর উল্লেখ রয়েছে। অশোকের যুগে একজন রাজকুমারকে প্রশাসক করে পাঠান হোত। এটি সব সময়ে বিদ্রোহক্ষুব্ধ থাকত। কিন্তু অশোকের সময় তা ছিল না। এরিয়ান বলেছেন নগরটি বিশাল, সম্পদশালী এবং জনবহুল। স্ট্রাবো বলেছেন, তক্ষশিলার ভূমি উর্বর। প্লিনি বলেছেন, এই বিখ্যাত নগরটি ও রাজ্যটি পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী বিখ্যাত ছিল।

প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্যায়নার অ্যাপেলোনিয়াস এবং তাঁর সঙ্গী দামিস এই নগর পরিদর্শন করে লিখেছিলেন, নগরটি নিনেভের মতো বড়। সরু সরু রাস্তাওলা গ্রিকপ্রাচীর বেষ্টিত নগরীর মতোই।

হিউয়েন সাঙ ৭ম শতাব্দীতে যখন এই নগরী পরিদর্শন করেন তখন এটি কাশ্মীরের করদরাজ্য। তাঁর মতে নগরীটি আয়তনে ১০ লী এবং রাজ্যটি ২০০০ লী। যদিও অনেক বিহার ছিল তবু বেশির ভাগ ছিল খালি। কয়েকটিতে মহাযানপন্থী ভিক্ষুরা থাকতেন।

বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে তক্ষশিলা উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের এটি একটি সুবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ভারতের নানান অংশ থেকে ছাত্ররা এসে কলা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা নিত। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ এবং মগধের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। জাতকের একটি কাহিনীতে সেই সময়কার তক্ষশিলার শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

রঘুবংশ অনুসারে তক্ষক তক্ষশিলার পত্তন করেন। এটি পূর্ব পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার তক্ষশিলা নগরটিকে তক্ষশিলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কথিত আছে এই নগরীর আগের নাম ছিল ভদ্রশীলা। পরবর্তীকালে রাজা চন্দ্রপ্রভার মস্তক এক ভিখারী ব্রাহ্মণ কেটে ফেলার পর নগরের নাম হয় তক্ষশিলা।

ভদ্রশিলা নামে নগরটি সম্পদশালী, জনবহুল ছিল। নগরীর চারটি তোরণ ছিল। নগরটি হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত ছিল। রাজা ছিলেন চন্দ্রপ্রভা। একটি রাজকীয় উদ্যানও ছিল। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা অনুসারে তক্ষশিলার রাজা ছিলেন কুঞ্জকর্ণ। কুনালকে পাঠান

হয় তক্ষশিলা অধিকার করার জন্য। দিব্যাবদানে দেখা যায়, নগরটি অশোকের পিতা বিন্দুসারের অধিকারে ছিল।

গান্ধারের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী তক্ষশিলা সিন্ধুনদীর পূর্বে অবস্থিত ছিল। কানিংহামের মতে নগরটির অবস্থান ছিল শাহধেরীর কাছে কাল কা-সরাইয়ের এক মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে পাওয়া গেছে দুর্গ সম্বলিত নগরের ধ্বংসাবশেষ—নগরের চারধারে কম করে পঞ্চাশটি স্তুপ, ২৮টি বিহার এবং ৯টি মন্দিরের অবশেষও রয়েছে। শাহ-ধেরী থেকে ওহিন্দরের দূরত্ব ৩৬ মাইল। ওহিন্দ থেকে হস্তনগর আরও ৩৮ মাইল। মোট ৭৪ মাইল। এটি প্লিনি বর্ণিত তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতীর মধ্যেকার দূরত্বের চেয়েও ১৯ মাইল বেশি। কানিংহাম বলেন, প্লিনির ৬০ মাইলকে ৮০ মাইল বা ইংরাজি ৭৩$\frac{১}{২}$ মাইল বলে ধরা উচিত।

ভাণ্ডারকারের মতে অশোকের সময় তক্ষশিলা গান্ধারের রাজধানী ছিল না—কারণ ১৩ নং শিলালিপি পড়ে মনে হয়, গান্ধার তাঁর প্রত্যক্ষ রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল না। আবার কলিঙ্গ শিলালিপি ১এ দেখা যায় এটি তার রাজ্যসীমার মধ্যেই ছিল। তাঁর এক পুত্র ওখানকার প্রশাসক ছিলেন। তক্ষশিলা যে ঐ সময়ে গান্ধারের রাজধানী ছিল না তা সমর্থিত হয় প্লিনির বক্তব্য থেকে : গান্ধারাই দেশ সিন্ধুর পশ্চিমে, রাজধানী পুষ্করাবতী।

তমসা : মহারাজ সর্বনাথের খোহ তাম্রলিপিতে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমান তামস বা টোনস নদী। এটি নাগাউধের দক্ষিণে মহিয়ার রাজ্যে উৎপন্ন হয়ে রেওয়ার উত্তরাংশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এবং এলাহাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই নদীটির নাম রয়েছে। পার্জিটারের মতে এটি এলাহাবাদের নিচে গঙ্গার ডানতীরে—গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে তামসী নদী। অনেকের মতে তমসা বা পূর্ব টোনসের উৎস ফৈজাবাদ। আজমগড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বালিয়ার পশ্চিমে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি রামায়ণ বর্ণিত বিখ্যাত নদী। রাম প্রথমে গঙ্গার অদূরে এই নদীতীরে বিশ্রাম নেন। তারপর নদী পেরিয়ে পায়ে হেঁটে কিছুদূর গিয়ে শ্রীমতী নদীর তীরে পৌছান। রাম কর্দমহীন নদীটির প্রশংসা করে স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রঘুবংশ বলে, দশরথ নদীর তীরটি সুসজ্জিত করান। সাধু সন্ন্যাসীতে ভরা ছিল এই নদী। দক্ষিণ টোনস ঋক্ষপর্বত থেকে উত্তর পূর্বে প্রবাহিত হয়ে এলাহাবাদের নিচে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, নদীটি বাম দিকে দুটি এবং ডানদিকে দুটি উপনদীর ধারায় পুষ্ট।

তমসাবন বিহার : (তো-মো-সু-ফা-না) হিউয়েন সাঙ সর্বাস্তবাদীদের এই মঠ পরিদর্শন করেন। ৩০০ ভিক্ষু এখানে থাকতেন।

তামসবন : কানিংহাম পাঞ্জাবের সুলতানপুরকে চিহ্নিত করেছেন। এটি রঘুনাথপুর বলেই পরিচিত।

থুনা (স্থুনা) : থানেশ্বর দেখুন।

ত্রিগর্ত : রাভি ও শতদ্রুর মধ্যেকার এবং জলন্ধরকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চল—সেটিকেই মহাভারত বর্ণিত ত্রিগর্তদেশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এটি কাংড়া

বলেও পরিচিত ছিল। দশকুমার চরিতে ত্রিগর্তে তিন ধনী ভাইয়ের একটি উপাখ্যান রয়েছে।

ত্রিকূট : সম্ভবত পাঞ্জাবের একটি পাহাড়।

টোকেরোই দেশ : টলেমি টোকেরাই দেশের লোকজনদের কথা বলেছেন। এদের সঙ্গে ব্যাকট্রিয়ান লোকজনদের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা তুখারসাসদের মিল রয়েছে।

ত্রিকাকুদ (ত্রিকাকুভ) : এটি তিনটি শৃঙ্গ সম্বলিত হিমালয়ের আধুনিক ত্রিকোটা পর্বত।

তৃণবিন্দু আশ্রম : প্রজাপতির পুত্র পুলোস্ত এখানে ধ্যান করবার জন্যে এসেছিলেন। মেরু পর্বতের ধারে এটি অবস্থিত ছিল। তিনি যখন বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন সেই সময় ঋষি তৃণবিন্দুর কন্যা তাঁর সামনে আসে। প্রথমে অভিশাপ দিলেও পরে পুলস্ত তাঁকে বিবাহ করেন।

ত্রিপলক্ষ : যমুনার কাছে যেস্থানে দৃষদ্বতী অন্তর্হিত হয়েছে সেই স্থানটির নাম ত্রিপলক্ষ।

তুলাম্ব : মূলতানের ৫২ মাইল উত্তর পূর্বে রাভি নদীর বাম তীরে নগরটি অবস্থিত। প্রাচীন নাম কুলম্ব।

তুরঘ্ন : তৈত্তরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের উত্তর অংশ।

তুসাম : হরিয়াণার হিসার জেলার মুখ্য শহর ভিওয়ানীর ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তুসাম শিলালিপিতে গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে।

উচ্চশৃঙ্গবিষয় : উঃ প্রঃ বেরিলী জেলার হরপাণ্ডকি তালুকে উচ্চনগিদুর্গা গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উদ্যান : আধুনিক সোয়াত, এরিয়ানের সুয়াসটাস, সংস্কৃত—সুবাস্তু নদীর ধারে অবস্থিত ছিল স্থানটি। বর্তমান প্যাংগকোরা, বিজাওয়ার, সোয়াত এবং বুনির জেলা নিয়ে গঠিত ছিল উদ্যান দেশ। ৫ম শতাব্দীতে ফাহিয়েন একে বলেছেন, য়ু-চ্যাং-এবং এটি উত্তর ভারতের অংশ। উদ্যানটি পাঞ্জাবের উত্তরের সুবাস্তু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রসার লাভ করছিল। এখানে ৫০০টি বিহার ছিল। হীনযানী ভিক্ষুরা এখানে বসবাস করতেন। বুদ্ধ দেশটি পরিদর্শন করে তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন। হিউয়েন সাঙের সময়তেও এখানে বৌদ্ধ ধর্মের ভাল অবস্থা ছিল। মহাযানী হলেও তারা হীনযানের বিনয় অনুসরণ করতেন। সোয়াত নদীর উভয়তীরে বহু বিহারের ধ্বংসাবশেষ ছিল এবং মহাযানী ভিক্ষুদের সংখ্যা কমে আসছিল। ১০টিরও অধিক দেবমন্দির ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও ছিল।

উগ্গনগর : শ্রাবস্তীর অদূরেই ছিল নগরটি। উগ্গন নামে এক শ্রেষ্ঠী উগ্গনগর থেকে শ্রাবস্তীতে ব্যবসা করতে এসেছিল।

য়ুহা : হিমবন্ত অঞ্চলে নদীটি ছিল।

উপবত্তনশালবন : এটি মল্লদের রাজ্যে ছিল। বুদ্ধ এখানে মহা পরিনির্বাণ লাভ করেন।

উরনাবতী : ঋগ্বেদ বর্ণিত সিন্ধুর এক উপনদী।

উষীনর : পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী ও পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে দেশটির উল্লেখ রয়েছে। কুরুদেশের উত্তরে ছিল দেশটি। গোপথ ব্রাহ্মণে উষীনরদের উত্তরবাসী বলেছে। ঋগ্বেদেও এর উল্লেখ রয়েছে। জিমার মনে করেন পূর্বে উষীনরেরা আরও উত্তর পশ্চিমে বসবাস করত। বৈদিক ইনডেক্সের লেখকরা তাঁর এই মত গ্রহণ করেন নি। পারজিটার মনে করেন, তাদের অধিকারে ছিল পাঞ্জাব। জাতকে প্রায়ই রাজা উষীনরের নাম পাওয়া যায়।

উষীনারা : উষীরধ্বজ দেখুন।

উষীরধ্বজ : কংখলের উত্তবে এক পর্বত উষীরগিরির সঙ্গে এর মিল রয়েছে। গঙ্গা যে শিবালিক পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে সমতলে এসেছে—তাকেই উষীরগিরি বলে চিহ্নিত করা যায়।

পালি সাহিত্যের উষীনারা ও কথাসরিৎসাগরের উষীনরগিরি নিঃসন্দেহে দিব্যাবদানের উষীরগিরি এবং বিনয় শাস্ত্রের উষীরধ্বজ।

উত্তরকোশল : অযোধ্যা বলে স্থানটি চিহ্নিত হয়েছে। রামায়ণে অযোধ্যাকে কোশলের প্রাচীন রাজধানী বলা হয়েছে এবং শ্রাবস্তী পরবর্তী রাজধানী। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কোশল থেকে আলাদা করার জন্যে উত্তর কোশল শ্রাবস্তী নামে পরিচিত হয়। হিউয়েন সাঙ উত্তর কোশলকে শ্রাবস্তী বলেছেন এবং আয়তন ছিল ৬০০ লী। অনেক ধ্বংস প্রাপ্ত বিহার ছিল। উত্তর কোশল রাজা রঘুর ও তাঁর বংশধরদের রাজ্য ছিল। রঘুবংশে কালিদাস একে কোশলও বলেছেন। উত্তর কোশলের সীমান্ত নিশ্চয় পাহাড়ি অঞ্চলে ছিল—এবং বর্তমানে যা নেপাল। দক্ষিণ সীমান্তে গঙ্গা, পূর্বে শাক্য রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত। রাজধানী শ্রাবস্তী সম্বলিত কোশলের শাসক ছিল কোশলীয়রা।

উত্তরকুরু : বৈদিক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণীয় সাহিত্যে বলা হয়েছে, দেশটি কাশ্মীরের উত্তরে কোথাও ছিল। ভাগবতপুরাণ বলেছে, দেশটি হচ্ছে উত্তরকুরুদের। দ্বীপবংশে উল্লিখিত কুরুদ্বীপকে উত্তরকুরু বলেই ধরে নেওয়া যায়। 'বিনয়' অনুসারে তিদসপুরা ছিল উত্তরকুরুর নগর। ললিতবিস্তারে উত্তরকুরুকে এক প্রত্যন্ত দ্বীপ বলা হয়েছে।

বমকা : হিমালয়ের একটি পাহাড়। কেউ কেউ বলেন, এটি বেপুল্ল পর্বতের প্রাচীন নাম।

বরণাবতী : লুডিগের মতে অথর্ব বেদের এই নদীটি হচ্ছে গঙ্গা।

বাহ্লিক : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। চন্দ্রের মেরহৌলি লৌহস্তম্ভলিপি অনুযায়ী এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে দেশটি সিন্ধুর পেছনে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি অনুযায়ী চন্দ্রকে চন্দ্রবর্মণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ একই নামে শুশুনিয়া শিলালিপিতে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ঐ রাজা বঙ্গদেশে যুদ্ধ করতে এসে ফিরে যান। বর্তমান বলখপ্রদেশ কে বাহ্লিক বলে সনাক্ত করা যায়। টলেমির সময়ে ব্যাকট্রিওআইরা যারা আরাকোসিয়া অধিকার করেছিল তাদের বাহ্লিক বলা যায়। রামায়ণে দেখা যায়, বাহ্লিকরা উত্তর ভারতের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করত। যাই হোক পাঞ্জাবের পেছন দিকে কোনও একটি স্থান ছিল বাহ্লিক দেশ।

বাল্মিকী আশ্রম : কানপুর থেকে ১৪ মাইল দূরে বিঠুরে বাল্মিকীর আশ্রম ছিল।

এখানে সীতার লব আর কুশ জন্মগ্রহণ করে। চিত্রকূট পাহাড়ের ধারে এক মনোরম স্থানে ছিল এই আশ্রম। শত্রুঘ্ন অযোধ্যা থেকে যে পথে মধুপগ্নে দৈত্য লবণকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন—কালিদাস অনুসারে সেই পথের কোন স্থানে ছিল বাল্মিকীর আশ্রম। স্থানটি আধুনিক মুত্রার ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। ঋষি ভরদ্বাজ রামকে গঙ্গা যমুনার সংগমে যেতে বলেছিলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যমুনা পার হয়ে দক্ষিণ তীরে পৌছোন। এর থেকে ২ মাইল দূরে যমুনার তীরে একটি অরণ্যাঞ্চল ছিল। সন্ধ্যার সময় তারা জঙ্গলে পৌছে রাত্রি যাপন করেন। প্রভাতে যাত্রা শুরু করে চিত্রকূট পাহাড়ের কাছে আসেন, এবং বাল্মিকীর আশ্রম দেখতে পান। রামায়ণ অনুযায়ী আশ্রমটির গঙ্গা ও তমোসা (দক্ষিণ টোনস) সংগমে ছিল। পারজিটার বলেন, পূর্ব টোনস বা তমোসার তীরে এটি অবস্থিত ছিল। রামায়ণ বলেছে সীতাকে নির্বাসন দেবার সময় লক্ষণ গঙ্গা পার হয়েছিলেন। তাই তমোসা হবে পূর্ব টোনস যার তীরে ছিল আশ্রম। ভরত মধুরা থেকে এসেও এই আশ্রম পরিদর্শন করেছিলেন। রামায়ণ বাল্মিকীর সম্মানে আশ্রমে নির্মিত একটি মন্দিরেরও কথা বলেছে।

বেণুগ্রাম : ভারহুত গাত্রে ভোটিভ লেবেল নং ২২-এ বেণুগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। কানিংহাম বলেন, এটি কোশমের উত্তর পূর্বে আধুনিক বেনপূর্বাগ্রাম।

বেরঞ্জ : বেরঞ্জ মধুরার (মথুরা) কাছে একটি জায়গা যেখানে বুদ্ধ বেরঞ্জ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। এক দুর্ভিক্ষের সময় বেরঞ্জতে অবস্থান করেছিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কেন বয়স্ক ব্রাহ্মণদের সম্মান জানাননি? বুদ্ধ উচিত জবাব দিলে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধ বর্ষাকাল সেখানে কাটিয়ে বারাণসী যাত্রা করেন।

বেত্রবতী : গঙ্গার একটি ছোট উপনদী হিসাবে বেতয়াকে বেত্রবতী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পারিপাত্র পর্বত থেকে এর উৎপত্তি। কালিদাস মেঘদূতে এই নদীটির উল্লেখ করেছেন।

বেত্তাবতী : জাতক অনুযায়ী এই নগরটি একই নামের নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বেতলতার সাহায্যে চারুদত্ত নদীটি পার হয়েছিলেন।

বেয্যধ্বগিরি : গন্ধমাদনের কাছে একটি পাহাড়।

বিভ্রট : হিমালয়ের কাছে একটি বড় পর্বত।

বিন্ধ্যাচল : এটি মির্জাপুরের কাছে অবস্থিত। এই পাহাড়টির মাথায় রয়েছে বিন্দুবাসিনীর মন্দির। বিন্ধ্যাচল নগরটি পম্পাপুর বলেও পরিচিত এবং তা মির্জাপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

বিন্দুসরোবর : মহাভারত ও যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গোত্রীর ২ মাইল দক্ষিণে রুদ্র হিমালয়ের বুকে এটি অবস্থিত। কথিত আছে ভগীরথ এখানে গঙ্গাকে মর্তে আনবার জন্যে তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলে হ্রদটি কৈলাস পর্বতমালার উত্তরে অবস্থিত।

বিপাশা (বি-পাশ—শৃঙ্খলহীন) : এটি ঋগ্বেদ কথিত নদী। নিরুক্ত অনুযায়ী এই নদীর পূর্ব নাম উরুঞ্জিরা। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে নদীটি নাম উল্লেখ রয়েছে। এটি

গ্রিক বিপাশিম, বা হাইপাসিস বা হাইফাসিস এর সমার্থ। এটি শতদ্রু বা সটলেজের এক উপনদী। প্রাচীনকালে সম্ভবত এটি স্বাধীন নদী ছিল। মহাভারতে এই নদীটির উৎস কথিত আছে। বিশ্বামিত্রের হাতে পুত্র নিহত হওয়ার দুঃখে ভগ্নহৃদয় বশিষ্ঠ নিজের হাত পা বেঁধে আত্মহত্যার জন্য এই নদীতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তীব্র স্রোত তাকে বন্ধনমুক্ত করে তীরে ঠেলে দেয়। মার্কন্ডেয় পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। রোটাং গিরিপথের রাঙির উৎপত্তি স্থলের কাছে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালা এর উৎস, অনেকগুলি হিমবাহের জলে এটি পুষ্ট। ছাম্বা থেকে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে এটি শতদ্রুর সঙ্গে মেশে। এই নদী প্রাচীনকালের গতিপথ পরিবর্তন করেছে।

বিতস্তা : ঋগ্বেদ বর্ণিত এই নদীটি পাঞ্জাবের সবচেয়ে পশ্চিমে। এটিই আলেকজাণ্ডারের ঐতিহাসিকেরা হাইদাসপেস এবং টলেমির বাইদাসপেস। এটি সিন্ধুর এক উপনদী। এটি কাশ্মীরের পীরপাঞ্জাল পর্বতমালায় উৎপন্ন হয়েছে। কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে এটি নানান নামে প্রবাহিত—বীরনাগ, অ্যাডপল, সামদ্রান ইত্যাদি।

বৃন্দাবন : মথুরা ৬ মাইল উত্তরে হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। ভাগবতপুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। হরিবংশ বলেছে, এই চমৎকার বনটি যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। কাছেই যমুনার ধারে গোবর্দ্ধন।

বৃষপর্ব আশ্রম : রুদ্র হিমালয়ের অংশ গন্ধমাদন পর্বতের কাছে বৃষপর্ব আশ্রম অবস্থিত ছিল। কিন্তু মহাকাব্য বলে গন্ধমাদন কৈলাস পর্বতমালার অংশ।

ব্যাস আশ্রম : মহাভারতকার এবং পুরাণকারের মতে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল হিমালয়ের গারোয়াল জেলার বদ্রিনাথের কাছে মানাল বলে একটি গ্রামে।

যমুনা : এই নদীটি ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রঘুবংশ প্রভৃতিতে উল্লিখিত রয়েছে। কালিন্দগিরি পর্বত থেকে উৎপন্ন বলে এর নাম কালিন্দ কন্যা। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ত্রিতসুস ও সুদাস এই নদীর তীরে তাঁদের শত্রুদের পরাজিত করেন। চিতসুখের রাজ্য যমুনা ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী স্থানে এবং সরস্বতীর উভয় পাড়েই বিস্তৃত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ভরতবংশীয়েরা এই যমুনার তীরেই বিজয়ী বলে খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে, সাংখ্যয়ন শ্রৌতসূত্র, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, নাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, যোগিনীতন্ত্র, কালিকপুরাণ ইত্যাদিতে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। ভাগবতপুরাণ ও মহাবাস্তুতে এই নদীকে কালিনী বলা হয়েছে। বাণের কাদম্বরীও কালো জলের জন্যে একে কালিন্দী বলেছে। এই নদী শূরসেন—কোশল, কোশল—বংশ, মাদুরা (মথুরা) ও কোশাম্বী ইত্যাদির সীমা রেখা রচনা করেছিল। কারসোলী থেকে ৮ মাইল দূরে যমুনোত্রীকে এর উৎস বলে মনে করা হয়। গ্রিক ইরান্নবোয়াস। (হিরন্যাভ বা হিরণ্যবাহু) আর যমুনা একই নদী। স্কন্দপুরাণ বালুবাহিনী নামে যমুনার একটি উপনদীর নাম করেছে।

যন্নুগন্ধর : দিল্লীর কাছাকাছি তদানিন্তন পাঞ্জাবের ঝিন্দ রাজ্যকে চিহ্নিত করা যায়। অষ্টাধ্যয়ী ও মহাভারতে এর উল্লেখ রয়েছে। একে কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলা হোত।

যবন দেশ : যোনস বা যবনেরা ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গ্রিকরা। বিদেশীদের

মধ্যে এরাই সবচেয়ে সম্মানিত ছিল। কিন্তু মনে করা হোত, যবনেরা শুদ্রমাতা ও ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান। রামায়ণে হিন্দুদের সঙ্গে শক ও যবনদের এক মিশ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। কিষ্কিন্ধা কান্ডে সুগ্রীব বলেছে, যবনদের দেশ ও শকদের নগরগুলি কুরু ও মদ্র এবং হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত। পাণিনী অষ্টাধ্যয়ীতেও এই কথা বলেছেন। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় বলেছেন, ঐ স্থান ম্লেচ্ছজাতি অধ্যুসিত। বুদ্ধ এবং অশ্বলায়নের যুগের যবন রাজ্য মঝ্ঝিম নিকায়তে উল্লিখিত আছে। মিলিন্দপঞহোতে বলেছে, যবনদের দেশ নির্বাণ লাভের উপযুক্তস্থান। মহাবস্তু বলেছে, যবনদের একটি সংহতি ছিল, সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত তাদের সকলের পক্ষে মানা বাধ্যতামূলক ছিল। যবন দেশগুলির অবস্থান নির্ণয় করা এক অসুবিধাজনক ব্যাপার। আলেকজাণ্ডারপূর্ব গ্রিকদের (আইওনিয়ান) উপনিবেশ সম্পর্কে এথেন্সের প্রাচীন মুদ্রার মতো মুদ্রা উত্তর পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত হওয়া থেকে সমর্থন পাওয়া যায়। এই যবনদের উত্তরাপথের অধিবাসী বলে গণ্য করা হোত যেমন গণ্য করা হোত, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত, এবং বর্বরদের। ভাগবত পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। অশোকের ৫নং শিলালিপি, নাগার্জুন কোণ্ডার বীরপুরুষ দত্তের উৎকীর্ণ লিপিতেও যবনদের নাম রয়েছে। ৫নং শিলালিপি ও ১৩নং শিলালিপিতে কাম্বোজদের সঙ্গে যবনদের দেখান হয়েছে। বশিষ্ঠিপুত্র পুলুমায়ীর নাসিক গুহালিপিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে শক, যবন ও পহ্লবদের ধ্বংসকর্তা বলা হয়েছে। সাতবাহন রাজা ক্ষরাত রাজত্বকে উচ্ছেদ করেন। দরায়ুসের নাকশ-ই-রুস্তমের লিপিতে আইওনিয়ান দেশ আর যবন দেশ একই। অশোকের শিলালিপিতে শুধুমাত্র যবনদের নাম উল্লেখ নেই। অশোকের আমলে এক যবন রাজ সামন্ত রূপে সৌরাষ্ট্রের (কাথিয়াওয়াড়ের) শাসনকর্তা ছিল, রাজধানী ছিল গিরিনগর বা গির্নার। এই তথ্যটি সমর্থিত হয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমনের (১৫০ খ্রিঃ) জুনাগড় শিলালিপিতে। ভাণ্ডারকারের মতে খুব সম্ভবত আলেকাজাণ্ডারের আগেই যবনেরা এসে ভারতের উত্তর পশ্চিমে কোথাও বসতি স্থাপন করেছিল।

পতঞ্জলীর মহাকাব্য অনুযায়ী, সাকেত বা অযোধ্যা এবং মধ্যমিকা (চিতোরের কাছে) একদল যবন বা গ্রিক অবরোধ করে। সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে শুঙ্গ রাজকুমার বসুমিত্রের সঙ্গে যবনদের সংঘাত হয়। ভারতের অভ্যন্তরে প্রসারিত যবন শক্তিকে শুঙ্গরাই প্রথম পর্যদুস্ত করে। পশ্চিম ভারতে যবনদের শেষ শক্তি উৎখাত করে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বা সাতবাহনদের উত্থান। ভারতের উত্তর পশ্চিমে যবনেরা শেষ পর্যন্ত পার্থিয়ানদের দ্বারা নির্মূল হয়।

জামদগ্নি আশ্রম : উত্তর প্রদেশের গাজিপুর জেলার জামানিয়াতে অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, উঃ প্রদেশের বালিয়া জেলার ৩৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে খৈরাজিতে ছিল।

যুগন্ধর : মহাভারত বর্ণিত যুগন্ধর যমুনার পশ্চিম তীরে এবং কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

জেদা : উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উন্দের (সিন্ধ) কাছে একটি গ্রাম।

দক্ষিণ ভারত

অচ্যুতপুরম : এটি ওড়িশার গঞ্জাম জেলার মুখলিঙ্গমের কাছে অবস্থিত। এখানে ইন্দ্রবর্মনের একটি তাম্রফলক পাওয়া গিয়েছিল। কলিঙ্কের গঙ্গরাজবংশের এক রাজা কর্তৃক জমিদানের কথা এই ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে।

অধিরাজেন্দ্রবলনাডু : এটি একটি জেলার নাম। এটি জয়নকোন্ডা-সোর-মন্ডলম-এ অবস্থিত।

অগৈয়ারু : এটি গ্রাম মানদোত্তমের দিয়ে যাওয়া একটি নদীর নাম।

অগস্ত-মালাই : ত্রিবাংকুরের অধুনা কেরালার একটি পাহাড়ের নাম। এই পাহাড় তাম্রপর্ণী নদীর উৎস।

আইমবুন্দি : এটি আধুনিক আম্মুন্দি গ্রামের প্রাচীন নাম। এদের দেবতা শিবকে অধিবাসীরা এক খণ্ড জমি দান করেছিল।

ঐরাবট্ট : এটি কটক জেলার বাংকি পুলিশ থানার রতনগড় বলে চিহ্নিত।

ঐবরমালাই : মাদুরাই জেলার পালনি তালুকের ঐয়ামপালাইয়ম গ্রামের একটি পাহড়।

অজন্তা : অজন্তার দুটি গুহা ঔরঙ্গাবাদ ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিম এবং ভূসয়ালের ২৫ মাইল দক্ষিণে। পশ্চিম ঘাটের পাদদেশে একটি ছোট শহর ফরদাপুর হয়ে অজন্তা গুহায় যেতে হয়। ঔরঙ্গাবাদ থেকে ফরদাপুরে যাওয়ার গাড়ির ভাল রাস্তা আছে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে অজন্তার বেশির ভাগ ছবিগুলি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর। চৈত্য এবং বিহার—এই দু ধরনের গুহা অজন্তায় দেখা যায়। ৯নং ও ১০ নং গুহা দুটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং তা ১ম ও ২য় খ্রিঃ পূর্বাব্দের। বুদ্ধের জ্ঞানদানের ভঙ্গির মূর্তি বিহারগুলির ভেতরে রয়েছে। সাজানোর জন্যে চিত্র এবং ছাদ সাজানোর অলংকরণ ভারতীয় দৃশ্যকলার প্রাচীনতম নিদর্শন। পশু, পাখি, বাঁদর, বন্য জাতের মানুষ ইত্যাদি সবই ঐ সব গুহায় চিত্রিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অপূর্ব সমাহার এই অজন্তা।

অলনাডু : এটি অরুমোরিদেব বলনাডুর একটি সাব ডিভিশন। এখানে ছিলেন রাজা চূড়ামণিচতুর্বেদিমঙ্গলম।

অমরকন্টক : মলয়বতের মাথায় একটি পবিত্র পাহাড়। এখানে কলিঙ্গের অংশ হিসাবে বিশল্যকরণী নদী প্রবাহিত হয়।

অমরকুণ্ড : এটি অন্ধ্রের একটি শহর। কাছেই একটি পাহাড়ের মাথায় রয়েছে ঋষভ ও শান্তিনাথের একটি সুন্দর মন্দির।

অমরাবতী (পালি—অমরাবতী) : এই শহরে রয়েছে অমরেশ্বরের মন্দির। প্রাচীন নাম ধান্যঘাট বা ধান্যঘটক যার সঙ্গে মিল রয়েছে ধান্যকট বা ধান্যকটকের। স্তূপের জন্য স্থানটি বিখ্যাত। এটি অংধাপতিয়র রাজধানী ছিল। বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে এই নগরে সুমেধ নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক হয়ে জন্মেছিলেন। এই নগরটি ধরণীকোট্টা নদীর তীরে আধুনিক অমরাবতী বলে চিহ্নিত। স্থানটি কৃষ্ণা নদীর তীরে প্রাচীন অমরাবতীর এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভগ্নস্তূপের জন্য স্থানটি বিখ্যাত। অমরাবতী স্তূপ বিজয়ওয়াড়ার

১৮ মাইল পশ্চিমে, কৃষ্ণার ডান তীরে ধরণীকোটার দক্ষিণে। অমরাবতীস্তূপ নির্মাণ করেছিলেন অন্ধ্রভৃত্য বৌদ্ধ রাজারা। অমরাবতী চৈত্য হচ্ছে হিউয়েন সাঙের পূর্বশৈল বিহার।

অম্বাত্তুরনাড়ু : এটি তদানিন্তন চিংলেপুট জেলার সাইদাপেট তালুকের একটি গ্রামের নাম।

অম্বাসমুদ্রম : তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে এটি অবস্থিত। এটি তিরুনেলভেলী জেলার ঐ নামের তালুকের সদর দপ্তর। ইলানগোয়কুড্ডি ছিল অম্বাসমুদ্রম এর প্রাচীন নাম।

অমধাপতিয় : পল্লবরাজ শিবস্কন্দবর্মণের মৈদাভোলু তাম্রশাসনে এই নামটি রয়েছে। অনুরূপ সংস্কৃত নাম হবে অমধাবতী। অমধাপতিয় বা অন্ধ্রপথ হচ্ছে গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যেকার অন্ধ্রদেশ। এটি পূর্ব অন্ধ্রদেশ—পশ্চিম ভারতের অন্ধ্র রাজ্য থেকে একে এইনামে পৃথক করা হয়েছে। অন্ধ্রকদের নাম মুণ্ডকর কোলক ও চিনাদের সঙ্গেই করা হয়েছে। পঞ্চ দ্রাবিড়রা হচ্ছে এরকম : আসল দ্রাবিড় (তামিল), অন্ধ্র (তেলেগু), কর্ণাট (কানাড়ীয়), মহারাষ্ট্র এবং গুর্জর। ধনকন্টক বা ধান্য কন্টক বা কৃষ্ণার মুখে অমরাবতী ছিল এর রাজধানী। হারায়া লিপিতে বলা আছে জনৈক অন্ধ্ররাজা মৌখারী রাজ কুমারগুপ্ত ৩য় (৫৫৬ খ্রিঃ)-কে যুদ্ধে হাতি বাহিনীর দ্বারা খুব বিপদে ফেলেছিলেন। এইচ. সি. রায়চৌধুরী বলেন, অন্ধ্ররাজটি ছিলেন মাধববর্মণ প্রথম—বিষ্ণুকুনডিন পরিবারের, পালামুরু তাম্রশাসন অন্ততঃ তাই বলে। পল্লবরাজ শিবস্কন্দ বর্মণের সময় সম্ভবত অন্ধ্র পল্লবদের অধিকারে এসেছিল। এদের প্রধান কার্যালয় ছিল ধম্নকড় (ধান্যকটক)

অন্ধ্র অঞ্চলে পুলিন্দেরা সম্ভবত বিন্ধ্য থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত সমগ্র ভূমিতেই বাস করত। বাশিষ্ট পুত্র পুলমায়ীই প্রথম অন্ধ্রের ওপর সাতবাহন আধিপত্য বিস্তার করেন। অশোকের সময় এটি মৌর্য শাসনের অন্তর্গত ছিল।

অম্মলপুন্দি : তাড়িকোন্ডাব ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অনমারলপুন্দিয়াগ্রহারমকে অম্মলপুন্দি বলে চিহ্নিত করা যায়।

আমুদালপাড়ু : এটি আলমপুর তালুকে অবস্থিত যেখানে প্রথম বিক্রমাদিত্যের তাম্রশাসন পাওয়া যায়।

অনদুতপালাচল : এটি একটি পাহাড়।

অনামালাই পাহাড় : এগুলি ত্রিবাংকুর (কেরালা) পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে।

অনন্তপুর : এটি ত্রিবাংকুরের (কেরালা) রাজধানী তিরুবনন্তপুরম অবস্থিত। এখানে রয়েছে পদ্মনাথের মন্দির। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মন্দিরটিকে পরিদর্শন করেছিলেন।

অন্ডাভরম : এটি অন্ডনাট্টুভেলানের সংক্ষিপ্তরূপ। পেরুমানালুরচেলুর, তিরুমান্ডভানুর কুবলইয়া সিংগনালুর এবং পেরুমুর সমস্তই এর ভেতর রয়েছে।

অন্ধক : যাদবগোষ্ঠীর একটি শাখা।

অন্ধভরম : অন্ধ্র রাজ্যের শ্রীকাকুলাম জেলার একটি গ্রাম। এখানে ইন্দ্রবর্মণের তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

অন্ধ্রমণ্ডল বা অন্ধ্রবিষয় : তেলেগু দেশ। পল্লবদের প্রথম দিককার রাজা শিবস্কন্দ বর্মণের মাইডাভোলু তাম্রলিপি প্রমাণ করে যে অন্ধ্রপথ বা অন্ধ্রদের অঞ্চল ছিল কৃষ্ণ

জেলায়—রাজধানী ধান্যকভব বা বিজয়ওয়াড়া। অন্ধ্রদের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রয়েছে। ভি.এ. স্মিথ মনে করেন, এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক এবং আধুনিক তেলেগু ভাষীদের পূর্বজ। এরা গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপ জুড়ে ছিল। কেউ কেউ বলেন, এরা আদিতে বিন্ধ্যের এক উপজাতি। রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা পশ্চিম থেকে পূর্বে গোদাবরী ও কৃষ্ণার উপত্যকায় নেমে এসেছে। মহাভারত বলেছে, এরা দাক্ষিণাত্যে বসতি স্থাপন করে। রামায়ণ এদের গোদাবরীর সঙ্গে জুড়েছে। পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারও প্রমাণ করে যে তারা গোদাবরী, কৃষ্ণা উপত্যকা জুড়ে ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্ধ্রদের দক্ষিণের অধিবাসী বলেছে। অশোকের ১৩নং শিলালিপি বলেছে অন্ধ্র অশোকের এক করদ রাজ্য ছিল। প্লিনির মতে অন্ধ্রদের অজস্র গ্রাম ছিল। প্রাচীর ও রক্ষীস্তম্ভে সুরক্ষিত ৩০টি নগর ছিল এবং রাজার বিশাল পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী ছিল। পুরাণ বলে সাতবাহনেরা অন্ধ্র বা অন্ধ্রভর্ত ছিল। এরা সমগ্র অন্ধ্রদেশ ও আশপাশ অঞ্চল শাসন করত।

চৈনিকরা এই দেশটিকে আন-তা-লো বলে জানতেন এবং আয়তনে ৩০০০ লী। কিছু সঙ্ঘারাম এবং দেবমন্দির ছিল। ৩০০০ ভিক্ষু অধ্যুসিত ২০টি বৌদ্ধ বিহার ছিল। রাজধানীর কাছে একটি বড় অলংকৃত বৌদ্ধ বিহার ছিল। সেখানে ছিল এক বুদ্ধ মূর্তি।

অন্ধ্রদেশের রাজধানী সম্ভবত ধনকটক ছিল। হিউয়েন সাঙ নগরটি পরিদর্শন করেন। অন্ধ্রের আদি রাজধানী তেলবাহ নদীর তীরে ছিল। এটি তেল বা তেলিনগিরি নদী। অন্ধ্রেরা দক্ষিণের লোক। এরা ৩০০ বছর রাজত্ব করেছে। ভরতের হাতে অন্ধ্রেরা পরাজিত হয়।

অঙ্গরায়নকুপ্পম : এটি আধুনিক গ্রাম অঙ্গরান কুপ্পম—বিরিঞ্চিপুরম এর ৬ মাইল উত্তরে।

অঙ্গার : ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত একটি দক্ষিণী দেশ।

অন্নদেববরম : গ্রামটি ব্রাহ্মণদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়। কথিত আছে পিন্নাসানি এবং গঙ্গা (গোদাবরী) সংগমে বিশারিনাণড়ুতে অবস্থিত ছিল।

অন্নবরম : পূর্ব গোদাবরী জেলার টুনির কাছে যেখানে রাজমন্দ্রি মিউজিয়ামের তেলেগু চোড় অন্নদেব ফলকটি পাওয়া গিয়েছিল।

অন্তরভেদী : গোদাবরী কূলে সাতটি পবিত্র স্থানের একটি।

অরাগিয়সোরাপুরম : এটি রাজরাজ বলনাড়ুর একটি সাব ডিভিশন। এটি পোয়িরকুরম্ম এর একটি গ্রাম।

আরাইসুর : এটি পেন্নারের তীরে একটি গ্রামের নাম।

অরকাতপুর : এটি সম্ভবত আধুনিক আর্কট। হস্তিগুম্ফালিপি থেকে জানা যায় যে রাজা খারবেল এটিকে জয় করেছিলেন।

আরাশিল : এটি একটি নদীর নাম। এটি অরিসিল বা অরাসিলেইয়ারু নামে পরিচিত।

অরিকামেড়ু : করমণ্ডল উপকূলের পণ্ডিচেরীর ২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৪৫ সালে এখানকার কিছু কিছু জায়গা খনন করা হয়।

অরুগুর : এটি বর্তমানে বেলুরের কাছে আরিয়ুর।

অরুমাডল : এটি আধুনিক অরুমাডল গ্রাম। এটি ছিল পাণ্ডকুলা শনিবলনাড়ুর অস্মক একটি সাব ডিভিশন কিরসেনগিলিনাড়ুতে।

অস্সক : মনে করা হয় গোদাবরীর তীরে এরাই অস্সক।

অস্মক বা অস্মক দেশ : সুত্তনিপাতে বলা হয়েছে, অস্সক বা অস্মার দেশ পাতিত্থানের ঠিক দক্ষিণে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত ছিল। রিজ ডেভিস বলেন, অস্মক দেশ অবন্তীর ঠিক উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। অসঙ্গ তার সূত্রালংকারে বলেছেন, সিন্ধু অববাহিকায় ছিল অস্মক দেশ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে, অস্মকদের সাধারণ ভাবে গোদাবরীর তীরে অস্মক বলে চিহ্নিত করা যায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্মকেরা পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। পাণিনী একটি সূত্রে অস্মকদের উল্লেখ করেছেন। ঈক্ষ্বাকু ও অস্মকদের মধ্যে এক সম্পর্ক ছিল।

অস্মকদের রাজধানী ছিল পোতানা বা পোতালি বা মহাভারতের পাউদন্য। কোন এক সময় পোতালি কাশী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অস্মক জাতকে বলা হয়েছে, অস্মক নামে এক রাজা পোতালিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং নগরটি ছিল কাশী রাজ্যের অন্তর্গত।

গ্রিকরা যাদের আসপাসিয়ান বলত তারা হয়ত বিখ্যাত অশ্বক বা অস্মক উপজাতিদের এক পশ্চিমী শাখা। ইরাণীয় নাম অসপার সঙ্গে সংস্কৃতের অশ্ব বা অস্মকদের মিল রয়েছে।

অত্রি আশ্রম : রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমটি পরিদর্শন করেন।

অত্তিলি : পশ্চিম গোদাবরী জেলার তানুকু তালুকের দক্ষিণ পশ্চিমে এই শহরটি অবস্থিত। চোড় রাজা অন্নদেব এই অত্তিলির সীমান্তে তার বিরুদ্ধ পক্ষীয় দক্ষিণী রাজাদের পরাজিত করেছিলেন এবং শত্রু পক্ষের ১০,০০০ সেনা যারা নগরে আশ্রয় নেয় তাদের অভয় দেন।

অযোধ্যা : এটি একটি দেশের নাম। ৫৯ জন সম্রাট এখানকার সিংহাসনে বসেন। বিজয়াদিত্য নামে এখানকার এক রাজা দাক্ষিণাত্য জয় করতে এসেছিলেন।

আয্যাম পালায়ম : সোনানুর রেল স্টেশন থেকে ৪½ মাইল উত্তর পূর্বে কোয়েমবাটুর জেলায় পাল্লাদাম তালুকের একটা গ্রাম। এখানে একটি ছোট মন্দির আছে।

অধিরাজমঙ্গল্লিয়পুরম : কুড্ডালোর তালুকের তিরুবাদি। পানরুটি স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে এবং কুড্ডালোরের ১৪ মাইল পশ্চিম এবং উত্তরে অবস্থিত। এটিকে আদিগইমানগরও বলা হয়। এটি গেডিলং এর উত্তর তীরে।

আদিপুর : এটি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পাঞ্চাপির সাবডিভিশনের একটি গ্রাম।

আহির দেশ : এটি দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল। বীরস্বামী এটি পরিদর্শন করেন।

আলামপুন্ডি : দক্ষিণ আর্কট জেলার তিনডিভনম তালুকের সেঞ্জি ডিভিশনের একটি গ্রাম।

আলপ্পক্কম : দক্ষিণ আর্কট জেলার কুড্যালোর তালুকের একটি গ্রাম।

আলূর : গ্রামটি পণ্ডিনাড়ুতে। মহীশূর জেলার কামরাজনগর তালুকের আলূরই সম্ভবত এই গ্রামটি।

আমুর (আমবুর) : তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার বেলুর তালুকের একটি নগর।

আনাইমালাই : তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার একটি পবিত্র পাহাড়। এটি হাতি পাহাড় বলেও পরিচিত। এটি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দুরা-মেলুর প্রায় সমান্তরাল।

আনানদুরু : শিলাহর ইন্দরসের আক্কালকোট উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে, এটি আষান দুরু জেলার প্রধান কার্যালয়। অন্ধ্রের উসনানাবাদ জেলার একই তালুকের প্রধান আধুনিক নগর আনাদুরুকে চিহ্নিত করা যায়। এটি অক্কালকোটের ২০ মাইল উত্তরে।

আনানগুর : এটি বিল্লুপুরমের ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। এটি নিশ্চয় আনানগুরুনাড়ুর প্রধান স্থান ছিল।

আন্ধ্র : বর্তমান তেলেগু দেশ।

অন্নদেববরম : এটি পেল্লুরী—শৈলবরং এব পশ্চিমে গঙ্গার তীরে একটি গ্রাম। রাজা অন্নদেব ব্রাহ্মণদের এই গ্রামটি দান করেছিলেন।

আরাম : শোনপুরের অদূরে। এখানে প্রায়ই রাজকীয় তাঁবু স্থাপন করা হত। এক সমৃদ্ধ নগরী বলে একে বর্ণনা করা হয়েছে।

আসুবুলপাররু : বিজয়ওয়াড়ার কৃষ্ণার তীরে গ্রামটি অবস্থিত।

বদখিমেডি : এটি গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত একটি গ্রামটি গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের একটি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গেছে।

বাঙ্গবাদী : কর্ণাটকের কোলারে অবস্থিত।

বসিনিকোণ্ডা : মদনপাল্লের কাছে একটি গ্রাম।

বভাজী পাহাড় : তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার ভেলোরের শহরতলি ভোলপাড়ির কাছে অবস্থিত। এই পাহাড়ের চূড়ার নীচে কন্নরদেবের এক শিলালিপি পাওয়া গেছে।

বাদামী : এটি একটি গ্রাম। এটিকে বাতাপীও বলা হয়। ৬৫০ খ্রিঃ পূর্বে সিরুত্তোনদর এখানে অভিযান চালিয়েছিলেন। ৬৪০ খ্রিঃ নাগাদ এটি চালুক্যদের রাজধানী ছিল। নরসিংহবর্মণ বাদামী ধ্বংস করেন।

বাহুর : এটি আধুনিক গ্রাম অরাগিয়সোরচতুর্বেদিমঙ্গলম বা অতীতের বাহু গ্রামও। এটি পণ্ডিচেরীর কাছে। অরুবানাড়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এটি ফরাসিদের একটি কমিউনের সদর দপ্তর ছিল। এখানে ১৭৫২ খ্রিঃ ফরাসি-ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এটি ফরাসিদের অধীনে ছিল।

বেলুগুলা : কর্ণাটক রাজ্যের শ্রাবণ বেলগোলাকে কেলদি সদাশিব নায়কের ক্যাপের তাম্রশাসনে বেলুগুলা বলা হয়েছে।

ভঞ্জভূমি : এটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা। আবার মেদিনীপুরের একই নামে এক পরগণা। এর অতীত ধূসর।

ভারানি পাডু : এই শহরের কাছে কামরাজ নামে এক চোড় রাজা রাজাসিংঘকে পরাজিত করেন।

ভাগিরথী : গঙ্গানদী।

ভাস্করক্ষেত্র · বেরিলী জেলার হাম্পি—বিজয়নগরের রাজাদের রাজধানী।

ভেথিশৃঙ্গ : ভারতীয় যাদুঘরে গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের তাম্রশাসনে উল্লিখিত। এটিকে ব্রাহ্মণী নদীর ধারে বরসিঙ্গ বলে সম্ভবত চিহ্নিত করা যায়।

ভীমারথী (ভীমরথ) : পশ্চিম চালুক্যরাজ জয়সিংহ দ্বিতীয়-এর দৌলতাবাদ তাম্রশাসনে বর্ণিত ভীমারথী নদীকে আধুনিক ভীমা বলে চিহ্নিত করা যায়। এটি কৃষ্ণার প্রধান উপনদী। এর উত্তর তীরে পুলকেশী, আপপায়িক ও গোবিন্দের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়েছিল। বায়ুপুরাণে এই নদীটির কথা রয়েছে। পুরাণে এটিকে নির্দিষ্ট ভাবে এক সহ্য নদী বলা হয়েছে—যা পুণা জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ থেকে উদ্ভুত—তারপর দক্ষিণ পূর্বের পথ ধরে রায়চুর জেলার উত্তরে কৃষ্ণার সঙ্গে মিশেছে।

ভোগবধন : পুরাণ অনুযায়ী এটি দক্ষিণাত্যের একটি দেশ। মনে হয় গোদাবরী অঞ্চলে এটি অবস্থিত ছিল। যদিও সঠিক অবস্থান জানা যায় না। ভোগবধনকে দক্ষিণে মৌলিক, অস্মক, কুন্তল ইত্যাদির সঙ্গে দেখানো হয়েছে।

ভোজকট (ভোজকটপুরা) : অরুলালা-পেরুমল এবং রবিবর্মণের রঙ্গনাথ শিলালিপিতে দক্ষিণ ভারতের কেরালার যদুবংশীয় এক ভোজ রাজার উল্লেখ করা হয়েছে। গৌড়ের ধর্মপালদেবের (৮০০ খ্রিঃ) খলিমপুর দানপত্র মৎস, কুরু, যদু এবং যবনদের সঙ্গে এক ভোজরাজের কথা উল্লেখ করেছে—যাঁরা কান্যকুঞ্জের রাজার অভিষেকে উপস্থিত ছিলেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রয়েছে চেট রাজা খারবেলের হস্তিগুম্ফার লিপিতে যেখানে বলা হয়েছে কলিঙ্গরাজ খারবেল (১ম খ্রিঃ পূঃ) রাথিকদের এবং ভোজদের পরাজিত করে তাকে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। রাথিক এবং ভোজরা নিঃসন্দেহে অশোকের শিলালিপির রাষ্ট্রিক এবং ভোজ। ১৩নং শিলালিপি ভোজদের এবং পিটিনিকদের উল্লেখ করেছে। এরা যথাক্রমে তদানিন্তন বোম্বাই-প্রেসিডেন্সির থানা এবং কোলাবা অঞ্চলে বসবাস করত। মহাভারতে সহদেব বিজিত ভোজকট এবং ভোজকটপুর এই দুটি স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী যদি ভোজ এবং ভোজ্য একই হয় তাহলে এটি বিন্ধ্যাঞ্চলেরই একটি দেশ। দণ্ডক্যভোজ শব্দটি ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই ভোজকট হয় দণ্ডকের মধ্যে বা কাছাকাছি কোথাও ছিল। মহাভারতের তালিকায় ভোজকট, ভোজকটপুরা এবং ভোজপুরা থেকে পৃথক এবং এটি বিদর্ভের দ্বিতীয় রাজধানী। অমরাবতী জেলার ইলিচপুরের ৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বে আধুনিক বেরার বা প্রাচীন বিদর্ভ অথবা চম্মক-এর সঙ্গে ভোজ মিলে যায়। খিল হরিবংশে ভোজকটকে বিদর্ভের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ভারহুতের 'ভোটিভ লেবেল' নং ৪৫ এ ভোজকট রয়েছে। অশোকের ১৩ নং শিলালিপি ভোজ, পারিন্দ ও পালদদের কথা বলে। ঋগ্বেদ ও ঐতেরীয় ব্রাহ্মণে ভোজের উল্লেখ রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সাত্বতরা গঙ্গা-যমুনার কাছেই ছিল। ঐ অঞ্চলটি ছিল ভরতদের অধিকারে। অতি প্রাচীন কালেই ভোজরা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরাণ অনুযায়ী ভোজ এবং সাত্বতরা মৈত্রীবদ্ধ উপজাতি এবং দুজনই যদুবংশের অন্তর্গত। সাতবাতের উত্তরসূরী মহাভোজের পুত্রেরা ভোজ নামে পরিচিত। ভোজরা হৈহয়দের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং যাদবদের বংশের লোক। জৈনদের

ধর্মগ্রন্থ ভোজদের ক্ষত্রিয় বলেছে। ভোজ, কুকুর ও অন্ধকরা কুরুদের মহাযুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এরা সৃঞ্জয় ও চেদিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জৈনদের উত্তরাধ্যায়নচূর্ণী বলেছে, উজ্জয়িনীর এক শাসক সন্ন্যাসী হয়ে ভোজকডে এসেছিলেন।

ভুবনেশ্বর : ওড়িশার খুরদা রোড ডিভিশনের একটি গ্রাম· কটকের ১৮ মাইল দক্ষিণে, পুরীর ৩০ মাইল উত্তরে। বলিয়াস্তি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দিরের মধ্যে লিঙ্গরাজের মন্দির স্থাপত্য ও কারুকার্যের দিকে অপূর্ব। সম্ভবত এটি ৫৮৮ শকে (৬৬৬-৬৭ খ্রিঃ) নির্মিত হয়েছিল। 'যযাতি কেশরী' মন্দিরটি নির্মাণ শুরু করেন। ললিত কেশরী শেষ করেন। এটি ৪½ একর জমির ওপর তৈরি। ল্যাটেরাইট পাথরের উঁচু মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ভেতরের উঠোন পাথরে বাঁধান এবং ৬০/৭০টি পার্শ্বমন্দির রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে শিবের স্ত্রী ভগবতীর মন্দিরটি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত পরশুরামেশ্বরের মন্দির রয়েছে ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরের প্রস্তরলিপিতে দেখা যায় একটি বিষ্ণু মন্দিরের কথা সেটি একামরা বা আধুনিক ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ছিল।

বিরজাক্ষেত্র : ব্রহ্মপুরাণ অনুযায়ী এখানে দেবী বিরজার মূর্তি ছিল। এটি ছিল পবিত্র বৈতরণী নদীর তীরে। বিরজার মন্দির ওড়িশার জাজপুরে। এইক্ষেত্রে আটটি পবিত্র স্থান রয়েছে। যেমন, কপিল, গোগরাহা, সোমা, মৃত্যুঞ্জয়, সিদ্ধেশ্বর ইত্যাদি। যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

বব্বিলী : অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত।

বোম্মেহালু : অনন্তপুরের সাতমাইল দূরে বোম্মেপারতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মগিরি : অশোকের কিছু ক্ষুদ্র শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। স্থানটি নাসিকের কাছে।

বুগুডা : এটি গঞ্জামের গুমসুর তালুকে অবস্থিত।

চন্দক : এটি মহিমশক রাজ্যের কাছে একটি পর্বত। কন্নপেন্না- নদীর বাঁকের কাছে বোধিসত্ত্ব একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করেছিলেন। এটিই মলয়গিরি বা মালাবার ঘাট।

চন্দনাপুরী : আধুনিক চন্দনপুরী। ইলোরা ৪৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে বা মালেগাউমের ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গিরনা নদীর তীরে ছোট একটি আধুনিক শহর চন্দনপুরী।

চন্দাউরা : এই রাজধানীটি আধুনিক চন্দাবর বলে চিহ্নিত। উত্তর কানারা জেলার কুমতার ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে হোনাবর তালুকে অবস্থিত।

চন্দ্রগিরি : এটি কর্নাটকের শ্রাবণবেনগোলার কাছের একটি পাহাড়। এটি শ্রীরঙ্গ পত্তনের কাছেই। প্রাচীনেরা একে দেয়া দুর্গা বলে জানত।

চন্দ্রবল্লী : এটি কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরির ৪৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

কন্যাকুমারী : এর তামিল নাম কান্নিকুমারী বা কন্যিয়া কুমারী।

চাউদুয়ার : কটকের ৪ মাইল উত্তরে মহানদীর এক শাখা নদীর উত্তর তীরে বিস্তৃত অঞ্চল ধরে ছড়িয়ে আছে চাউদুয়ারের ধ্বংসাবশেষ। কেশরী বংশের ২৫তম রাজা জয়কেশরী চারতোরণওলা এই নগরকে নিজেরে রাজধানী করেছিলেন। প্রথমে এটি একটি শৈবকেন্দ্র ছিল। পরে শৈবধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মও গড়ে ওঠে। প্রজ্ঞাপারমিতার একটি

বসে থাকা সহাস্যমূর্তি এখানে আবিষ্কার করা হয়েছে। এখানে দুহাত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিও উদ্ধার করা হয়েছে। উড়িষ্যার মধ্যযুগের স্থাপত্যের পূর্বসূরী হিসাবে ঐ মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে।

চারাল : অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পাংগানুর তালুকে এটি অবস্থিত।

চেব্রোলু : এটি অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার বাপটলা তালুকে অবস্থিত।

চেল্লুর : অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার কোকনাদ তালুকের একটি গ্রাম। বিষ্ণুবর্দ্ধনবীর চোড়-এর একটি তাম্রশাসন দানপত্র পাওয়া গেছে। এইপত্রে পূর্ব চালুক্য ও চোলদের সম্পর্কের কথা জানা যায়।

চেল্লুরু : এটি আধুনিক চেল্লুর গ্রাম।

চেনদালুর : এটি অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার ওঙ্গোল তালুকে অবস্থিত। এখানে সর্বলোকাশ্রয়ের (৬৭৩ খ্রিঃ) কিছু তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

চের : এই দেশটি বর্তমানের মালাবার, কোচিন এবং ত্রিবাংকুর নিয়ে গঠিত ছিল। কের কেরালার অপভ্রংশ। কেরালার লোকজনেরা কৈরালক বলে পরিচিত। প্রথমে রাজধানী ছিল বঞ্জি। এখন তিরুকারুর— পেরিয়ার নদীর তীরে। চোড়দের পর চেররা দক্ষিণের শক্তিশালী দেশ হয়ে ওঠে। অশোকের শিলালিপিতে কেরলপুত্রের উল্লেখ রয়েছে।

চেরাম : অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পুংগানুর তালুকের পলিনাডুর কারালা গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়।

চেরুপুরু : বিশাখাপত্তনমের আধুনিক চিপুরপল্লীকে চিহ্নিত করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, এটি চেরুপুরু।

চেবুরু : অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার কাইকালুর তালুকের একটি গ্রাম। এখানে কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

চিদাম্বরম : উত্তরে ভেলোর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, কোলেরুন দক্ষিণে, এবং পশ্চিমে বীরনাম পুষ্করিণী। এটি তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার একটি শহর—মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এটি চোলদেয় একটি পরিবর্ত রাজধানী ছিল। অনেকেই শিবমন্দিরের সভাগৃহে অভিষিক্ত হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে শিবের পাঁচটি প্রতিরূপ আছে। রয়েছে আকাশ (ব্যোম) মূর্তি — চিদাম্বরমে।

চিদিভালসা : ওড়িশার গঞ্জাম জেলার নরসন্নপেটার কাছে—এর কাছেই কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়।

চিকমাগালুর : কর্ণাটকের কাদুর ও চিকমাগালুর জেলার সদর দপ্তর।

চিনগ্লেপুট : একদা এটি একটি জেলা। সেখানে চিনগ্লেপুট হচ্ছে সদর দপ্তর।

চিরাপল্লী : এটি তিরুচিরাপল্লীর প্রাচীন নাম।

চিত্তামুর : এটি তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার গিনগী তালুক। এখানে দুটি জৈন মন্দির আছে।

চোড় (চোল) : চোড়দেশ (শোরামণ্ডলম) তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনোপল্লী জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। এটি কাবেরীর অববাহিকায়। চোড়দেশ পূর্বঘাট বরাবর পেন্নার নদী থেকে ভেল্লার এবং পশ্চিমে কুর্গের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রাজধানী ছিল উরাইয়ুর

(পুরোন ত্রিচিনোপল্লী)—(সংস্কৃত উরাগপুরা)। চোড় নামের উৎস জানা যায় না। কথিত আছে এরা তিরাইয়ার উপজাতি বা সমুদ্রের লোক। টলেমি আরকাটোস্ প্রশাসিত সোর (চোড়) এবং এবং বসসারোনাগদের দ্বারা শাসিত মলংগা দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ী ও অশোকের শিলালিপি নং ২ এবং ১৩ চোড়দের কথা উল্লেখ করেছে। রামায়ণ, মার্কণ্ডেয়, বায়ু এবং মৎস্য পুরাণে চোড় দেশের উল্লেখ রয়েছে। চোড়দের আদি ইতিহাস জানা যায়নি।

মহাবংশে কথিত আছে, দমিলাস নামে এক চোড় রাজা লংকা আক্রমণ করেছিলেন। কাত্যায়নের বার্তিকে চোড়দের কথা আছে। চোড় হচ্ছে তামিল সোয়া এবং সম্ভবত তা টলেমির 'সোরা'। চোড়দের রাজধানী উরাইয়ুর (উরগপুরা) এবং প্রধান বন্দর কাবিরীপত্তনথ বা পুগার—কাবেরীর উত্তর তীরে।

চোলেরুন : এটি একটি নদী নাম। এটি সেত্তিমঙ্গলম গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে।

কাঞ্চিভরম : এটি গ্রাম কাচ্চি বা কাঞ্চি বা কাঞ্চিপুরের আধুনিক নাম। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। একদা দক্ষিণ ভারতে এটি এক বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এই প্রাচীন স্থানটি দুটি ভাগে বিভক্ত : শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি। কাঞ্চিতে শৈব, বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাব ছিল। কাঞ্চির কামাক্ষি নাথের মন্দির কাঞ্চিভরমে গুরুত্বপূর্ণ। কৈলাসনাথের মন্দিরে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি রয়েছে।

ক্রানগানোর : এটি কোড়ুনগোলুরের আধুনিক নাম। প্রাচীন চেরসদের রাজধানী।

দদ্দর : জৈন ন্যায়ধম্মকাহাও অনুসারে এই দেশটি চন্দনকাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল।

দদ্দিগমণ্ডল : ফ্লিট তাঞ্জোরকে চিহ্নিত করেছেন।

দদ্দিগাভাদি : কর্ণাটকের মহীশূর জেলার তাডিগাইপাডির অনুরূপ একটি প্রাচীন জেলা।

দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড : নরসিংহদেব দ্বিতীয়-র কেন্দুপাটনা তাম্রশাসন অনুদান পত্রে দক্ষিণ ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। গঞ্জাম এজেন্সির উত্তরাঞ্চল জুড়ে এইস্থান। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে একে মহাকান্তার বলা হয়েছে। মহাকান্তারক ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়।

দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণাবহ : জৈনধর্মের এক বড় কেন্দ্র ছিল। বীরসামী এটি পরিদর্শন করেন। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে গোদাবরীর উত্তর পর্যন্ত অঞ্চল দক্ষিণাপথ বলে পরিচিত।

দামিল : শাসনবংশে লেখা রয়েছে এই রাজ্যে থের কশ্যপ বাস করতেন।

দামিলরা একটি দাক্ষিণাত্যের একটি শক্তিশালী উপজাতি ছিল। তারা বৌদ্ধ স্তুপকে অশ্রদ্ধা করত। সিংহলের রাজাদের সঙ্গে তাদের সংঘাত হয়।

দন্ডপল্লী : অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার পালামনের তালুকে অবস্থিত ছিল। এখানে বিজয়ভূপতির তাম্রলেখ পাওয়া গেছে।

দন্তপুরা : এটি কলিঙ্গের রাজধানী। গঙ্গা ইন্দ্রবর্মণের জিরজিনগি তাম্রশাসনে দন্তপুরার উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতে এটি দন্তপুর বা দন্তপুরা এবং নাগার্জুন-কোণ্ডার লিপির পালুরা। এটি শ্রীকাকুলের কাছে। পালি মহাগোবিন্দ সুত্তনতেও এটিকে কলিঙ্গের প্রাচীন রাজধানী বলা হয়েছে। কথিত আছে বুদ্ধের পবিত্র দাঁত এখান থেকেই সিংহলে নিয়ে

যাওয়া হয়েছিল। জৈন আবশ্যক নিরুক্তিতে দন্তভক্ককে দন্তপুরার শাসক বলা হয়েছে।

দর্দুর (দুর্দর) : এটি বেলুবন ও মলয় পর্বতশ্রেণির মধ্যেকার একটি পাহাড়। এটি সম্ভবত নিলগিরি। উচ্চতম শৃঙ্গ দোদাবত্ত। মহাভারত অনুযায়ী চোড় ও পাণ্ড্যরাজারা এই পর্বতের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

দর্শী : অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলায় অবস্থিত। এখানে পল্লবদের একটি তাম্রশাসন দানপত্র পাওয়া গেছে।

দেউলি : ধর্মশালা পুলিশ চৌকীর ২ মাইল পশ্চিমে ওড়িশার জাজপুর সাব ডিভিশনে গ্রামটি ছিল। ব্রাহ্মণী নদীব বাঁকে একটি মন্দির রয়েছে। স্তম্ভওলা সভাগৃহের ছাদপড়ে গেছে। মন্দিরের সামনে একটি বটগাছ রয়েছে। তার তলায় রয়েছে পাথরের একটি বিষ্ণু মূর্তি।

দেবপুরা : শ্রুঙ্গবরপুকোটা তালুকের দেবাড় বা শ্রীকাকুল তালুকের দেবাদি—এই দুটি গ্রামের যেকোনও একটি গ্রামকে চিহ্নিত করা যায়।

দেবরাষ্ট্র : এটি বিশাখাপত্তনম জেলার ইল্লামাঞ্চিলি তালুকে অবস্থিত।

ধরণীকোটা (ধন্নকড়) : জৈন আবশ্যক নিরুক্তি'তে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি গুন্টুর জেলার যেখানে ধর্মচক্র সম্বলিত স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে অবস্থিত। টলেমির ভাষায় এটি মাইসোলিয়ার রাজধানী পিতুনদ্রা। কৃষ্ণার তীরে বিজয়ওয়াড়ার ২০ মাইল ওপরে অবস্থিত ছিল। রেড্ডি রাজারা ধরনীকোটায় বাহমনী আক্রমণ প্রতিহত করে।

ধাউলি : ভুবনেশ্বরের ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দয়ানদীর দক্ষিণতীরে এই গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামের কাছে সমান্তরালভাবে দুটি অল্পউচ্চতার পাহাড় শ্রেণি রয়েছে। দক্ষিণ পাহাড়ের উত্তর মুখ কেটে পালিশ করা হয়েছে। এখানে অশোকের কিছু শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হয়। লিপিগুলি পাথরে গভীর করে খোদাই করা হয় এবং চারটি ভাগে বিভক্ত।

ধবলাপেটা : এটি বিশাখাপত্তনম জেলার শ্রীকাকুলের ১২ মাইল দূরে একটি গ্রাম। এখান থেকে মহারাজা উমাবর্মণের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

দিব্বিদ অগ্রহারম : বিশাখাপত্তনম জেলার বীরাবিল্লি তালুকের একটি গ্রাম।

দিনকাড়ু : এই গ্রামটির কথা লেখা আছে দিনকাড়ুর উৎকীর্ণ লিপিতে। এই গ্রামের কিছু জমি বিজয়াদিত্য মাধবকে দান করেন।

দীরঘাসি : ওড়িশার গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গপত্তনমের ৪ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম। এখানে (শক ৯৯৭) বনস্পতির একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

দোম্মর-নন্দ্যাল : নন্দীগাম ও পসিমদিকুরু—এই দুটি গ্রামের মধ্যে একটিকে চিহ্নিত করা যায়।

দ্রাকশারাম : এই গ্রামটিকে অন্ধ্রের শিরোমণি বলা হয়। পূর্ব গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুরমের ইঞ্জেরাম খালের উত্তর তীরে অবস্থিত। ভীমেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিশাল মন্দির গোদাবরী জেলার সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। চোড় রাজা অন্নদেব মন্দিরের চূড়াটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের জন্য দুটি সত্র খোলেন।

দ্রাবিড় : এটি একটি দেশের নাম। (সং : তামিল দেশ)। এটি মহাভারত, ভাগবত,

পুরাণ, বৃহৎসংহিতা এবং জৈন বৃহৎকল্পভাষ্যে উল্লিখিত। হিউয়েন সাঙের মতে দ্রাবিড় দেশের আয়তন ৬০০০ লী। রাজধানী কান-ছি-পু-লো।—আয়তনে ৩০ লী। ওখানে ১০০র বেশি বৌদ্ধবিহার এবং স্থবীরপন্থী ১০,০০০ এরও বেশি ভিক্ষু বাস করত।

দুম্নিবিধ্ধি : কলিঙ্গের এক ব্রাহ্মণ গ্রাম।

এডেদোর : দেশটি উত্তরে কৃষ্ণা—দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থলে অবস্থিত। রায়চুর জেলার বড় একটি অংশ এর মধ্যে ছিল।

এডেরু : বিজয়ওয়াড়ার ১৫ মাইল উত্তর পূর্বে কৃষ্ণা জেলার আকিরিপল্লীর একটি গ্রাম। এটি ইদার নুজভিদ তালুক বলেও পরিচিত।

একাধিরচতুর্বেদি মঙ্গলম : তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার তিরুনাম-নান্নুরের কাছাকাছি কোথাও এই গ্রামটি ছিল।

ইলাপুর : দন্তিদুর্গ-এর ইলোরা তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি ইলোরা যেখানে দন্তিদুর্গ দশ অবতারের গুহামন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ নির্মাণ করেছিলেন কৈলাস মন্দির।

ইল্লোর : এটি ইল্লুরা বা ইলবালাপুরা বলেও পরিচিত। এটি সম্ভবত তেলেগুতে কমলাকরপুরা বা কোলনু। গোদাবরী জেলার কোলেরু হ্রদের তীরে এটি অবস্থিত। কৈলাসনাথ মন্দিরের জন্য এটি বিখ্যাত। ইল্লোর বা ইলোরার গুহাগুলি অন্ধ্রের উত্তর পশ্চিমে। আওরঙ্গবাদ থেকে ১৬ মাইল দূরে। এগুলি ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধ গুহাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধগুহা ছাড়াও জৈন ও ব্রাহ্মণ গুহাও রয়েছে। বৌদ্ধগুহাগুলির গায়ে পরবর্তীকালের মহাযানপন্থীদের ছাপ। ২ নং গুহায় পদ্মের ওপর বসে থাকা পদ্মপাণি বুদ্ধের পূর্ণ একটি মূর্তি রয়েছে।

রাষ্ট্রকূট সম্রাট দন্তিদুর্গের কয়েকটি তাম্রশাসন ইলোরা থেকে পাওয়া গেছে।

এলুম্বুর : চেন্নাই-এর এগমোর।

এলুর : একটি গ্রামের নাম।

এলুরু : অন্ধ্রপ্রদেশের বেনগিবিষয়ে গোদাবরী জেলার পশ্চিমে একটি গ্রাম।

এনাদপাডি : একটি গ্রামের নাম।

এরনদপল্ল : ফ্লিট এটিকে খান্দেশের এরামডোল বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ বলেছেন এটি বিশাখাপত্তনমের য়েনডি পল্লী।

এইল : দক্ষিণ আর্কট জেলার টিনডিবনম তালুকের একটি গ্রাম। মনে হয় এই গ্রামের নাম থেকে ইয়িরকোট্টম নামটি নেওয়া।

ইয়িরকোট্টম : এই জেলাটিকে সম্ভবত ইয়িল (দুর্গ) এর নামেই ডাকা হোত। দক্ষিণ আর্কট জেলার টিনডিবনম তালুকের একটি গ্রাম। এটি জয়নকোণ্ডাসোলমণ্ডলমের একটি জেলা, কাঞ্চিভরম সম্ভবত এর ভেতরে ছিল।

***গড়বিষয়** : জয়ভঞ্জদেবের অমটিরিগম তাম্রশাসনের খিঞ্জলীয়গড়বিষয়ের অনুরূপ।*

গঙ্গাবাদি : প্রথম যুগে দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠা জৈন রাজ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নামটি গংগরাজাদের নাম থেকে নেওয়া। ওদের রাজ্য ছিল তদানিন্তন মহীশূরের *বেশির ভাগ অংশ। এর প্রথম রাজধানী কুবলাল।* পরে পরিবর্তিত হয়ে হয় কোকসাল

এবং আরও পরে কোলাল। এটিই বর্তমানে কর্ণাটকের পূর্বাংশের কোলার এবং পালার নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। কাভেরী গঙ্গাবাদির প্রধান নদী।

গংগা : এটি একটি নদীর নাম। এটা মন্দাকিনি নামেও পরিচিত। রামচন্দ্রের পুরুষোত্তমপুরার তাম্রশাসনে নদীটিকে গোদাবরী বলা হয়েছে।

গংগাপাদি : বর্তমানে কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত।

গংগাপুরা : উত্তর কানারা জেলার হাভেরীর দক্ষিণ পশ্চিমে সিরসি পর্যন্ত রাস্তার ধারে সাংগুর অবস্থিত ছিল। এটি গোবেয়রাজ্যের চন্দ্রগুট্টিনাড়ুর অন্তর্গত ছিল।

গৌতমী : এটি গোদাবরীর আর একটি নাম। এটিকে অখণ্ড-গৌতমী বা গৌতমী বলে চিহ্নিত করা যায়। গৌতমী সাতটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সপ্তগোদাবরী নাম নেবার আগেই এই নাম। গঞ্জাম জেলায় বড়খিমেদিতে এই নামে একটি গ্রাম আছে। ওখান থেকে তিনটি তাম্রফলক পাওয়া গেছে।

গংগানুর : বেলুরের কাছে একটি গ্রামের নাম।

গাংগেয়-নল্লুর : পড়ুভুরকট্টম ডিভিশনের করাইভরিতে আদিনাড়ু নামে একটি গ্রাম—আধুনিক গঙ্গানুর।

গেডিলম : মনাবলপ্পেরুমলের সেন্দমঙ্গলমের লিপিতে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। এইটি দক্ষিণ আরকটের কল্লাকুরচি তালুকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদীর তীরে তিরুবাডী ও তিরুমাটিকুলি অবস্থিত।

ঘনসেলা পাহাড় : দক্ষিণ ভারতের অবন্তীর একটি পাহাড়।

ঘন্টসাল : অন্ধ্রপ্রদেশের মসলিপতনমের ১৩ মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণা জেলার একটি ছোট গ্রাম। ইক্ষসিরিবধমান এর প্রাচীন নাম। পাঁচটি প্রাকৃতলিপি এখানে পাওয়া গেছে।

ধাটিকাচল : এটি একটি পাহাড়ের নাম। এটি উত্তর আর্কট জেলার শোলিংগুরে অবস্থিত।

গিংগু : দক্ষিণ আর্কট জেলায়। এখানে কয়েকটি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

গোদাবরী : সহ্য পাহাড়ে উৎপন্ন একটি নদী। গোবর্দ্ধন নগর এর তীরে নির্মিত হয়েছিল। রামায়ণে বলা হয়েছে, নদীটি পদ্মপূর্ণ ছিল। চক্রবাক চক্রবাকীরা খেলা করত। নদীর দুই তীরে গাছ ছিল। লক্ষণ এই নদীতে স্নান করে পদ্ম আর নানান ফলমূল নিয়ে কুটির ফিরে যেত। রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। সীতাকে রাবণ এখান থেকেই হরণ করে। পঞ্চবটীবন এই নদীর তীরেই ছিল। অনেক পবিত্র স্থানও এই নদীর তীরে ছিল।—কুশবর্ততীর্থ, দশাশ্বমেধিকা তীর্থ, গোবর্দ্ধন তীর্থ, সাবিত্রী তীর্থ, বিদর্ভ, মার্কণ্ডেয় তীর্থ এবং কিষ্কিন্ধাতীর্থ। সুত্তনিপাতে এর কথা বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এটিই সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘতম নদী। দক্ষিণ-ভারতের এই পবিত্রতম নদীটির বাস্তব উৎস নাসিকের ২০ মাইল দূরে গ্রাম ত্রয়ম্বকর-এর পাশে ব্রহ্মগিরি। জৈন সাহিত্যে একে গোয়াভরী বলা হয়েছে। মহাভারতের রয়েছে সপ্ত গোদাবরীর কথা।

গোকর্ণ : উত্তর কানারার গোকর্ণ গ্রামের কথা সদাশিব নায়কের কেলাডি ক্যাপ, তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি রেবা নদী থেকে দূর নয়। কদম্ব কামদেবের (শক ১১৭৭) তাম্রশাসন গোকর্ণ থেকে পাওয়া গেছে। রামায়ণে কথিত আছে, ঋষি

ভগীরথ সন্তান কামনায় এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। মহাভারত, পদ্মপুরাণ, কুর্মপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। সৌরপুরাণ দক্ষিণ গোকর্ণের কথা বলে যা সিন্ধুর তীরে অবস্থিত ছিল। বলরাম এই গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন। শঙ্করাচার্য একে পবিত্র স্থান করতেন। কাছেই তাম্রপর্ণী নদী। কালিদাস গোকর্ণকে দক্ষিণের এক তীর্থস্থান বলে বর্ণনা করেছেন।

গোকর্ণেশ্বর : ধর্মশালা পুলিশ চৌকির ২ মাইল পশ্চিমে কটক জেলার জাজপুর সাবডিভিশনের দেউলিতে এই গ্রাম। এই গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীর বাঁকে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গোকর্ণেশ্বরের মন্দির। এটি উড়িষ্যার অন্যতম প্রাচীন মন্দির। এক পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি একটি বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে।

গোমুখগিরি : এটি একটি পাহাড়ের নাম। রাজা অন্নদেবের উৎসর্গীকৃত গোমুখগিরিশ্বরের মন্দির এই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে।

গোনটুরু : এটি একটি গ্রামের নাম। কৃষ্ণা জেলার গুন্টুরের সঙ্গে সম্ভবত এর মিল রয়েছে।

গোল্লাপুণ্ডি : কৃষ্ণা জেলার বিজয়ওয়াড়ায় কৃষ্ণার উত্তর-তীরে গোল্লাপুড়ি গ্রামটি চিহ্নিত।

গোত্তেইকেলা : সোনপুর শহরের ৩ মাইল দূরের এই গ্রামটি গোটরকেলা বলে পরিচিত।

গোবিন্দবাদী ও দামল : উত্তর আর্কট জেলার কাঞ্চিভরম তালুকের দুটি গ্রাম।

গুড্ডবাটিবিষয় : গোদ্দাবাদিবিষয়ের অনুরূপ।

গুডলা-কুনদেরুবাটি : এটি একটি প্রাচীন দেশের নাম যা কৃষ্ণার দক্ষিণ তীরে অমরাবতী ঘিরে অবস্থিত ছিল। দেশটি তার সুন্দর অমরবটেশ্বর ও বুদ্ধ মন্দির ও চৈত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গুডলা শব্দের অর্থ মন্দির।

গুদ্রবারবিষয় : এটিকে মসলিপতনমের কাছে গুডুরু বলে এবং কৃষ্ণা জেলার গুডিবাদ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

গুদ্রু : মসলিপতনমের কাছে একটি শহর। এটি টলেমির কোড্ডোউরা।

গুহেশ্বরপাটক : ভৌমকর রাজাদের রাজধানী। খুব সম্ভবত এটি আধুনিক জইপুর।

গুনড়ুগোলানু : কল্লুরুর অধিবাসী এক ব্রাহ্মণকে বেনগিনান্দুবিষয়ের এই গ্রামটি দান করা হয়েছিল।

গুত্তি : অনন্তপুর জেলার সদর দপ্তর। আধুনিক গুটি।

হাদুবক : এটি সুদব বলে একটি গ্রাম—গঞ্জাম জেলার পূর্ব ডিভিশনে অবস্থিত।

হাগারি : নদীটি কদম্ব দেশ ও নালবাদির মধ্যেকার সীমারেখা রচনা করেছিল।

হালামপুরা : গুরজলের ব্রাহ্মীলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন এটি কৃষ্ণা জেলার নন্দীগ্রাম তালুকের আল্লুরু। আবার কেউ বলেন এটি প্রাক্তন নিজাম রাজ্যের আলমপুর।

হংসপ্রপতন : এটি ভাগিরথীর পূর্বে এবং প্রতিস্থানের উত্তরে অবস্থিত একটি তীর্থ।

হানুমকোন্ডা (অন্মকোন্ডা) : অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ারঙ্গল জেলায়। এখানে প্রোল-র লিপি

পাওয়া গেছে। এখানে ছোট একটি পাহাড়ের মাথায় পদ্মাক্ষীর একটি মন্দির ছিল।

হেমাবতী : এটি একটি গ্রাম। প্রাচীন নুলামব্বাপাডি বা নিগরিলি সোরাপাডি রাজ্যের রাজধানী। সম্ভবত এটি অনন্তপুর জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।

ইডাইতুরাইনাডু : মহীশূর জেলার একটি তালুকের সদরদপ্তর ইডাটোর।

ইলানগয়কুড্ডি : এটি প্রাচীন অম্বাসমুদ্রমের নাম।

ইরামণ্ডলম : রাজরাজের উপাধী মুমমুডিচোড় অনুসারে ইরাকে বলা হোত মুম্মুডিসোরমণ্ডলম।

ইরত্তাপাডি : এটি পশ্চিম চালুক্য সাম্রাজ্য। চোড় রাজার অভিযান ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দের তাঞ্জোরলিপিতে বলা আছে।

ইসিলা : এটি জনৈক মৌর্য মহামাত্রের সদরদপ্তর। এখান থেকে তিনি দক্ষিণ ভারত শাসন করতেন। এটি চিত্রদুর্গ জেলার সিদ্দাপুরের প্রাচীন নামও হতে পারে।

জগন্নাথনগরী : এটি কোকনদের এক অংশ জগন্নাথপুরম বলে চিহ্নিত।

জম্বুগ্রাম : রাজা মহাভাবগুপ্ত প্রথম জন্মজয় কালিভনা তাম্রশাসনে এর উল্লেখ করেছেন। এটি আধুনিক কালিভনার কাছে জামগাও বলে চিহ্নিত।

জগ্নভাগ : নগরটি চোড় রাজা অন্নদেব জয় করেন।

জম্বুকেশ্বর : এটি শ্রীরঙ্গম। ত্রিচিনোপল্লির ২ মাইল উত্তরে। এখানে জললিঙ্গের একটি মন্দির রয়েছে। সর্বক্ষণ জলের ভিতর থাকার জন্য এই নাম। চোড় কিংবা আগের পাণ্ড্য রাজা এটি নির্মাণ করেছিলেন ১২৫০ খ্রিঃ। ডানদিকে ব্রহ্মা, মধ্যে শিব ও বামে বিষ্ণু রয়েছে এই মন্দিরে।

জটিঙ্গ-রামেশ্বর : মহীশূরের চিত্রদুর্গ জেলার মোডাকালমুরু তালুকে সিদ্দাপুরের কাছে একটি পাহাড়।

জয়নকোণ্ডাচোড়মণ্ডলম : এটি একটি চোড় দেশ।

জয়পূর্ববিষয় : কটক যাদুঘরে মাধববর্মণের তাম্রশাসনে উল্লিখিত। এটি (শুভাকরদেবের ধরকোটা তাম্রশাসনে বর্ণিত) কোংগোডামণ্ডলের জয়কটকবিষয় একই। বর্তমান গঞ্জাম জেলার জইপুরকে চিহ্নিত করা যায়।

জাজপুর : এটি ওড়িশার জাজপুর জেলার প্রাচীন প্রত্নবস্তুর স্থান। মহাভারতে একে বিরজা ক্ষেত্র বলা হয়েছে। দ্বিতীয় / তৃতীয় শতাব্দীতে এটি একটি পবিত্র স্থান ছিল। এখানে সতীর একটি মূর্তি হয়েছে। মন্দিরটি ১৪ শতকের আগে নয়। জাজপুর কটক জেলার বৈতরণীর তীরে বিরজা ক্ষেত্র বলেও পরিচিত। এখানে ১৬ ফুট উঁচু ক্ষয়িষ্ণু খণ্ডলাইট পাথরের বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। অন্য তিনটি হচ্ছে, বারাহী, চামুণ্ডা এবং ইন্দ্রানীর মূর্তি। এদের মধ্যে ইন্দ্রানী ও চামুণ্ডার মূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। বারাহীর বিশাল মূর্তির দুটি হাতই ভেঙ্গে গেছে। হিউয়েন সাঙের সময় জাজপুর উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। প্রাচীন ভাস্কর্যের জন্য জাজপুর বিখ্যাত।

জইপুর : ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত।

জিজ্জিকা : গঞ্জাম জেলার টেক্কালীর গ্রাম জিরসিংগি। এখানে গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের কিছু তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

জুরাদা : গঞ্জাম জেলার কোডলার গ্রাম জরাডা।

কচ্চি : তামিলনাড়ুর আধুনিক কাঞ্চিভরম।

কচ্চিপেড়ু : আধুনিক কাঞ্চিভরম।

কডব : এটি কর্ণাটকের তুমকুর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রভূতবর্ষ (শক ৭৩৫) -এর অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কোডভ্র : একটি দেশের নাম।

দাইক্লোট্রুর : এটি একটি গ্রাম। অরিষ্টনেমী আচার্য এখানে বাস করতেন।

কডালাডি : উত্তর আর্কট জেলায় অবস্থিত।

কডপা : এটি টলেমির কারিজ। এটি উত্তর পেন্নার নদীর ডান তীরে অবস্থিত।

কডারম : মাদুরাই জেলার রামনদ তালুকের সদরদপ্তর। কাডারাম থেকে জাহাজ ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং চিনে যেত। তাই তামিলরা এই নামটির সঙ্গে পরিচিত ছিল। ছোট লেডের তাম্রশাসনে (১০৯০ খৃঃ) চোড় রাজ আয়িরট্রলির সভায় কোডারম এর দূত, প্রেরণের কথা রয়েছে।

কল্যাণজিয়ম : একটি গ্রামের নাম।

কলবলিনাডু : জটাবর্মণ কুলশেখর (প্রথম) এর তিরুপ্পুবনম তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি উত্তর-দক্ষিণ দুটি খন্ডে বিভক্ত ছিল।

কলিঙ্গ : একটি দেশের নাম।

কলিঙ্গনগর (কা-লেং-কা) : হস্তিবর্মণের নরসিংহ তাম্রশাসন এবং ইন্দ্রবর্মণের শান্তবোম্মলী-তাম্রশাসনের কলিঙ্গনগরকে শ্রীকাকুলের কাছে—বংশধারা বা মুখলিঙ্গম নদীর কাছে আধুনিক কলিঙ্গপত্তনম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে কলিঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ব উপকূলের মহানদী ও গোদাবরী নদীর মধ্যেকার এই দেশটি বহু পরিচিত। কালিদাস উড়িষ্যা ও কলিঙ্গকে আলাদা রাজ্য বলে মনে করতেন। উড়িষ্যার পূর্ব সীমান্ত কপিলা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মেকল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অশোকের ১নং শিলালিপি বলে, একজন কুমার কলিঙ্গ শাসন করতেন তোসালী বা সমাপা থেকে। রাজা খাববেল নিজের শিলালিপিতে নিজেকে কলিঙ্গাধিপতি বলেছেন—রানী তাঁর শিলালিপিতে বলেছেন কলিঙ্গ চক্রবর্তী। হস্তিগুম্ফার লিপি থেকে জানা যায়, খারবেলের সময়—কলিঙ্গনগর কলিঙ্গের রাজধানী ছিল।

প্রাচীন কলিঙ্গ দেশ সম্ভবত আধুনিক উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল। বৈতরণী নদী থেকে সমুদ্র উপকূল বরাবর বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত। অমরকন্টক পর্বতমালা পশ্চিম অংশ নির্দেশ করত। কলিঙ্গদেশ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যেকার অংশে ছিল। সুদবের দুটি পূর্বগঙ্গা তাম্রশাসনে কলিঙ্গ নগরের কথা বলা হয়েছে যা কলিঙ্গপত্তনম বা মুখলিঙ্গমে অবস্থিত ছিল। হস্তিবর্মণ, ইন্দ্রবর্মণ, দেবেন্দ্রবর্মণ প্রভৃতি আদি গঙ্গ রাজারা যাঁরা নিজেদের কলিঙ্গের অধীশ্বর বলেছেন এবং কলিঙ্গনগরের বিজয় শিবির থেকে বিভিন্ন দানপত্র দান করেছেন।

কলিঙ্গপত্তনম : গোদাবরীর মুখে একটি উন্নতিশীল নৌবন্দর।

কলিঙ্গারণ্য : মিলিন্দপঞ্হে এর উল্লেখ রয়েছে। গোদাবরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ইন্দ্রবতী নদীর শাখার গাওলিয়র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। র‍্যাপসনের মতে এটি

মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যে ছিল।

কল্লুরু : এটি পালঘাটে। এখানে একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে।

কলপত্তি : পালঘাটে এখানে একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গেছে।

কলুবারিগা : এটি কর্ণাটকের আধুনিক গুলবর্গা জেলা।

কালুচেরুভুলু : একটি গ্রামের নাম।

কল্যাণ : চোড়রাজ কামরাজ নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এটি অন্ধ্রদেশের শিরোমণি কামপুরী নামে বিখ্যাত হয়।

কামকপল্লী : এটি করভন্নাড়গ জেলার গিরিগড় গ্রামে অবস্থিত।

কমলপাদশ : একটি গ্রামের নাম।

কমলাপুরম : এটি চুড্ডাপা জেলায়। ইন্দ্র তৃতীয়ের শিলালিপি পাওয়া গেছে এখানে।

কামপিলি : বেরিলী জেলার হসপেট তালুকে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীরে আধুনিক কামপ্লি। দন্তিবর্মণের দানপত্রে দেখা যায় যে কামপৈল্য এক বৌদ্ধ বিহারকে তিনি একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

কনড় (কন্নড়) : এটি কর্ণাটক দেশ। একে কুন্তক দেশও বলা হয়। মহীশূর রাজ্যকেও কর্ণাটক বলা হত। বিজয়নগর রাজ্যকেও কর্ণাট বলা হত।

কনকাবল্লী : জয়নকোন্ডা-চোড়মণ্ডলমের পাডুভুর কৌট্রম ডিভিশনের পঙ্গলানাড়ুর একটি গ্রাম।

কন্ডরাড : পূর্ব গোদাবরী জেলার পিথাপুরমের কাছে একটি গ্রাম। এখানে প্রলয়নায়কের ভিলাস দানপত্র পাওয়া যায়।

কন্ডরাদিত্যম : তিরুচিরাপল্লী জেলার কাবেরীর উত্তর তীরে একটি গ্রাম। এই নামের একজন সর্দারের নাম উৎকীর্ণ লিপিতে রয়েছে।

কনডেরুবাদি : এটি কানডেরুবাটিবিষয় জেলায়। চালুক্যরাজ ভীম দ্বিতীয় এখানকার অধিবাসীদের প্রতি এক নির্দেশজারী করেছিলেন। কনডেরুবাটিবিষয় ৩/৪টি জেলায় বিভক্ত হয়। সম্ভবত এটি সমস্ত গুন্টুর তালুক, সত্তেনপল্লীর পূর্বাংশ এবং টেনালী তালুকের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সত্তেনপল্লীর দক্ষিণ পূর্বাংশ সমেত গুন্টুরের মধ্য অংশকে উত্তর কনডেরুবাটিবিষয় বলা হত।

কন্নমঙ্গলম : এই গ্রামটি আরণী ও ভেলোরের মধ্যবর্তী আরণী জাগিরে অবস্থিত ছিল।

কন্নি : প্রাচীনকালে কন্যাকুমারীর কাছ দিয়ে এই নদী প্রবাহিত হত।

কনতেরু : সালংকায়ন বিজয়স্কন্দবর্মণের কনতেরু তাম্রশাসন গুন্টুর জেলার গুন্টুর তালুকের এই গ্রামটির কথা উল্লেখ করেছে।

কন্যা : এটি কন্যাকুমারী। এটিকে গঙ্গাইকোণ্ডাচোলপুরমও বলা হয়। এখানে কুলোত্তুঙ্গ চোল (প্রথম)-এর একটি লিপি পাওয়া গেছে। এটি অতি প্রাচীন দেশ। গ্রিক লেখকরা একে কোমারিয়া অ্যকরোন বলত। কন্যাকুমারীর মন্দির ভারত মহাসাগরের ধারে। এখানে বীররাজেন্দ্রদেবেরও লিপি পাওয়া গেছে।

করাইবরি-আন্দি-নাডু : এটি একটি জেলার নাম।

করমাদাই : কোয়েম্বাটুর ঐ মেট্রাপলায়ম রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী এক শহর। এখানে শ্রীরঙ্গনাথ পেরুমলের মন্দির আছে।

করণিপাক্কাম : উত্তর আর্কট জেলার ভেলোর তালুকের একটি গ্রাম।

করঞ্জাডু : কামানন্দ বা করডা গ্রামটি এই নামে চিহ্নিত।

করবন্দপুরম : তেন্নেভেলী তালুকের কলক্কুডিনাড়ুর উক্কিরণ—কোট্রাই গ্রামটি চিহ্নিত। পাণ্ড্যদের আদি যুগে স্থানটির সামরিক গুরুত্ব ছিল।

করকাত্তুর : চিত্তুর জেলার পাল মানের কাছে কলকাত্তুর চিহ্নিত।

কারকুডি : এটি উহ্যকোনদন তিরুমালাই এর প্রাচীন নাম।

কর্ণাট দেশ : ভাগবত পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। কর্ণাটের রাজা বিজয়নগরের রাজার ওপর নামমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন।

কর্ণিকা : কাবেরী নদীর একটি শাখা।

কারুর বা কারুবুর : তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলার একটি গ্রাম। এটিকে বঞ্জিও বলা হয়। এটি পুরনো চেররাজ্যের রাজধানী। টলেমি একে কারুর—কেরালার রাজপুত্রের রাজধানী বলেছেন, বর্তমান ত্রিচি জেলার একটি শহর। টলেমির মতে কারোউরা ছিল কেরোবোত্রোসের বা কেরলপুত্রের রাজধানী। কারুর অর্থ কালোশহর।

করুবুর : কোয়েম্বাটুরের একটি গ্রাম।

কাউরলক : ফ্লিট সংশোধন করে একে কেইরলক এবং কেরালা করেছেন।

কাউরাল : কেউ কেউ এটিকে কোলেইর হ্রদ বলে চিহ্নিত করেন।

কবাটপুর : কোরকাই শহরটি এই নামে চিহ্নিত। এটি শ্রেষ্ঠ মুক্তার জন্য বিখ্যাত।

কালহস্তি : উত্তর আর্কট জেলার সুবর্ণমুখারী নদীর তীরে একটি তীর্থস্থান।

কালিভনা : মহাভারগুপ্ত প্রথম জন্মেজয়-এর কালিভনা তাম্রশাসনে এই গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে।

কালিদুর্গা : এটি আধুনিক কালিকট।

কালিউরকোট্টম : এটি একটি প্রাচীন জেলার নাম।

কামগিরি : এটি একটি পর্বত। এটি কামাক্ষীশিলা বলেও পরিচিত।

কামপুরি : এটি অন্ধ্রের শিরোমণি কল্যাণ বলেও পরিচিত। অন্ধ্ররাজ অন্নদেব এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

কামকরপরতি : গৌতমীর (গোদাবরী) তীরে অবস্থিত। গোদাবরীর পশ্চিম তীরে কাকরপররু বলে চিহ্নিত।

কাণ-নাডু : এটি পান্ডিমন্ডলমের একটি ডিভিশন।

কানপ্পের : পান্ড্যদেশের একটি গ্রাম। মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

কাঞ্চিপুর (কাঞ্চি) : প্রাচীনকাল থেকেই এটি তীর্থস্থান। ভাগবত পুরাণ, অষ্টাধ্যয়ী যোগিনীতন্ত্র ও মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। শিবস্কন্দবর্মণের মইদাভোলু তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি প্রাচীন চোড় এবং পরবর্তী পল্লবদের অন্যতম রাজধানী ছিল। টলেমি, মলঙ্গা রাজ্যের কথা, বলেছেন। কেউ কেউ বলেন, ঐটিই কাঞ্চী। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাঞ্চিতে কৈলাসনাথস্বামীনের মন্দির তৈরি হয় পল্লব স্থাপত্য অনুসারে। রাজসিংহবর্মেশ্বর

নামে আরও একটি মন্দির রয়েছে।

রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ ও তাঁর পিতা কাঞ্চী আক্রমণ করেন। রাজা কৃষ্ণ কাঞ্চি ও তাঞ্জোর জয় করেছিলাম।

কান্দলুর : এটি একটি গ্রাম। চিদামবরমকে চিহ্নত করা যায়।

কাপ : দক্ষিণ কানারা জেলার একটি গ্রাম। এখানে একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কারাইককাল (করিকাল) : এটি একটি সমুদ্রবন্দর শহর।

কারুবগ্রাম : এটি কৃষ্ণার তীরে কোরেগাঁও বা কারবা।

কাট্টুপ্পাডি : ভেলোরের কাছে একটি গ্রাম।

কাট্টুত্তুমবুর : উত্তর আর্কট জেলার ভেলোর তালুকের একটি গ্রাম।

কাবনুর : উঃ আর্কট জেলার একটি গ্রাম।

কাবেরী : এটি একটি নদীর নাম। কুর্গ থেকে কোয়েটাম্বুর, ত্রিচিনোপল্লী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। এই নদীটিকে বলা হয়, পল্লবদের প্রিয়। এক পল্লব বাজার রাজত্ব ছিল কাবেরীর দুই তীব জুড়ে। রামায়ণ ও যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ বয়েছে। অগস্ত্যমুনির কাছে পবিত্র মলয় পর্বত এই নদীর উৎস। রঘু এই নদী অতিক্রম করেছিলেন। কালিকা পুরাণ অনুযায়ী এই নদীর উৎস মহাকাল হ্রদ। এই নদীর জল অতি পবিত্র বলে কথিত। প্রধান চোড় বন্দর ছিল কাবেরীপত্তনম বা পুগার—কাবেরীর উত্তর তীরে এবং চোড়দের প্রাচীন রাজধানী উরগপুর ছিল কাবেরীর দক্ষিণতীরে।

কাবিরীপত্তনম : কারিকল নামে এক দুর্দান্ত রাজা কাবেরীর পাশে তার রাজধানী স্থাপন করেন।

কাবিরীপ্পুমবত্তনম : কাবেরীর মোহনায় কাবেরীপত্তনম হচ্ছে তামিল নাম। এটি নিশ্চয় কাবেরীপ্পুমপট্টিনম নামে প্রাচীন চোড়দের সমুদ্রবন্দর যা সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল।

কেন্দ্রাপারা : কটক জেলার কেন্দ্রাপারা সাব ডিভিশনের সদর দপ্তর।

করকেরা : খিচিং এর ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে আদিপুর পরগণার ঘোসদাপির গ্রামের নাম যা নরেন্দ্রভঞ্জদেবের আদিপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেরালা দেশ : তামিল চেলড় শব্দের কানাড়ী রূপ। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী রঘুবংশে ও ভগবত পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে একে চেরলন বা চেলড়নাড়ু বলা হত। চেরলন অর্থে পর্বতমালা। রাজেন্দ্র চোড় এই দেশ জয় করেছিলেন। বর্তমান মালাবার, কোচিন এবং ত্রিবাংকুর নিয়ে কেরালা গঠিত।

কেরলপুত্র : এটি দাক্ষিণাত্যের কেরালা দেশ। পতঞ্জলী মহাভাষ্যে কেরলের (মালাবার) উল্লেখ করেছেন। কেরলপুত্র কুপাক (সত্য)-এর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। প্রসারিত ছিল মধ্য ত্রিবাংকুরের কন্নতি পর্যন্ত। এর দক্ষিণে ছিল মুষিকরা। পেরিয়ার নদীর তীরে ছিল রাজধানী বঞ্জি—কোচিনের কাছে। পেরিয়ারের মোহনায় ছিল মুদিচির সমুদ্রবন্দর। ত্রিবাংকুর, কোচিন ও মালাবার জেলা নিয়ে চের বা কেরালা গঠিত ছিল। কুংগুদেশ (কোয়েম্বাটুর জেলা) এবং সালেম জেলার দক্ষিণ ভাগ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পেরিয়ার নদী তীরে কোচিনের কাছে বঞ্জি হয়েছে আধুনিক তিরুকারুর। কিন্তু পরবর্তী রাজধানী পেরিয়ারের মোহনায় তিরু-বঞ্জিক্কালম।

দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোক কেরলপুত্রের কথা বলেছিলেন যারা তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল।

মহাভারত অনুযায়ী কেরলবাসীরা হচ্ছে এক অবণ্য উপজাতি। বায়ু পুরাণ, মৎস এবং মার্কেন্ডয় পুরাণ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী হিসাবে চোড়, পাণ্ড্য এবং কেরলদের কথা বলেছে।

সেনগুত্তবপ চের ছিলেন প্রথম উল্লেখযোগ রাজা। দাক্ষিণাত্যের চোড়দের অধিকার একবার চেররা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু শিঘ্রই তা পাণ্ড্যদের হাতে এবং পরবর্তী সময়ে পল্লবদের হাতে চলে যায়।

কেরলসিংগ বলনাডু : জটাবর্মণ কুলশেখর (প্রথম) এর তিরুপ্পুবনম তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। রামনাদপুরম জেলার তিরুপ্পটুর তালুকের একটি বড় অংশ পুড়ুবেকাত্তাই রাজ্যের একটি অংশ নিয়ে শিবগংগা জমিদারী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কেশবপুরী : এটি আধুনিক কেসপুরী।

খন্ডিপাডা : ওড়িশার ভদ্রকের ২৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বে একটি মহকুমা শহর। জয়পুরের ৮ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানে শুভাকরের একটি মূর্তিলিপি পাওয়া গেছে।

খণ্ডদীপ : বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিঙ্গ রাজ দেশটি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি : হস্তিগুম্ফার শিলালিপি লেখক এই দুই যমজ পাহাড়কে কুমার ও কুমারী পাহাড় বলে জানতেন। খুরদা সাব-ডিভিশনের উত্তর পশ্চিমে খণ্ডগিরি পাহাড়, ভুবনেশ্বর থেকে ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

খণ্ডগিরির তিনটি চূড়ার নাম উদয়গিরি ১১০ ফুট। উদয়গিরিতে ৪৪টি, খণ্ডগিরিতে ১৯টি এবং নীলগিরিতে তিনটি গুহা রয়েছে। উদয়গিরির রানীগুম্ফা সবচেয়ে বড় গুহা। খণ্ডগিরির মাথাটি সমান করা হয়েছে। সেখানে একটি জৈন মন্দির রয়েছে। মার্শালের মতে উদয়গিরির হস্তিগুম্ফার গুহা সবচেয়ে প্রাচীন। অন্যান্য গুহাগুলি খ্রিঃ পূঃ ১ম শতকের মাঝামাঝি হবে।

খেদ্রপুর : মিরাজের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির রয়েছে।

কিলমুট্টুগুর : উত্তর আর্কট জেলার গুডিয়াট্টম তালুকের একটি গ্রাম। এখানে তিনটি তামিল লিপি পাওয়া গেছে।

কীলুর : দক্ষিণ আর্কটের ত্রিরুক্কোরিলুর তালুকে অবস্থিত।

কীল-বেম্বনাডু : এটি পাণ্ড্যদেশের এক সাব-ডিভিশন—যেখানে তিন্নেভেলী অবস্থিত।

কিনডেপ্পা : তেল্লাবল্লিবিষয়-এর একটি গ্রাম।

কিসানপুরা : কটক জেলার পদ্মপুর পরগণার একটি গ্রাম। শিবচেতশ্বর মন্দিরে একটি পাথরের খণ্ডের ওপর লেখা একটি লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপি থেকে গঙ্গরাজাদের বংশধারা চোড়গঙ্গ থেকে অনন্তভীমা পর্যন্ত জানা যায়।

কিসরকেল্লা : সম্বলপুর জেলার বলাঙ্গীরের ৬ মাইল পূর্বে কেসরকেলা গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

কিষ্কিন্ধ্যা : ধুলেব-এর ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আধুনিক গ্রাম কল্যাণপুরের কাছে

এক নগরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ রয়েছে—এটিই কিষ্কিন্ধ্যা। বাল্মিকী কিষ্কিন্ধার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছিলেন।

কোড়ুরু : কৃষ্ণা জেলার গুড়িবাড তালুকে অবস্থিত। এখানে পাঁচটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে।

কোলারু : এটি একটি গ্রাম। এলিয়ট বলেন, কলেরু। গুড়িবাড তালুকের কোলার বা কোল্লেরুর সঙ্গে সম্ভবত এর কোন একটি মিল রয়েছে।

কোলাউলপুরা : রাইসের মতে মহীশূরের পূর্বে আধুনিক কোলার।

কোলুবরতনা : আধুনিক শ্রীকাকুলাম জেলা।

কোল্লেরু : গোদাবরী জেলার একটি হ্রদ। বেনগিমণ্ডলে এটি একটি বিশাল হ্রদ।

কোড্ডিপ্পাক্কাই : কিল্লিপ্পাক গ্রামটি চিহ্নিত। গুন্টুর জেলায় কিল্লিপ্পাগা বলেও একটি গ্রাম রয়েছে।

কোমান্ড : উড়িষ্যার নয়াগড়ের একটি গ্রাম। এখানে তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কোমারটি : গঞ্জাম জেলার নরসন্নপেটার ২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে কলিঙ্গের চন্দ্রবর্মণের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কোমারমঙ্গল : এটি তামিলনাড়ুর সালেম জেলায় অবস্থিত।

কোণামণ্ডল : এটি গোদাবরীর বদ্বীপের একটি দেশ যেটি হৈহয়দের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোণামণ্ডলের প্রধানেরা নিজেদের মনে করেন, তাঁরা যদুবংশীয়। হৈহয়, কৃতবীর্য এবং কার্তবীর্যের বংশধর।

কোনাড়ু : তামিল দেশের একটি প্রাচীন প্রদেশ।

কোনারক : কোনারকের সূর্যমন্দির পুরীর ২১ মাইল উত্তর পূর্বে। সমুদ্র এখান থেকে প্রায় ১½ মাইল দূরে। ১৩ শতাব্দীতে খুরদার নরসিংদেব মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি কালো প্যাগোডা বলে বিখ্যাত। এটি স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন।

কোনগোডা : কিয়েলহর্ন স্থানটিকে হিউয়েন বর্ণিত কুং-যু-তো বলে চিহ্নিত করেছেন। কানিংহাম বলেন এটি গঞ্জাম। ফার্গুসন স্থানটিকে গঞ্জাম জেলার আসকা আর কটকের মধ্যবর্তী কোনও স্থান বলে মনে করেন। কোনগোডামন্ডল শিলালিপি অনুযায়ী স্থানটি শশাঙ্কের অধীনে ছিল এবং এর অধিবাসীরা কনৌজের হর্ষবর্দ্ধনকে অস্বীকার করত।

কোংগু : এটি আধুনিক সালেম ও কোয়েমবাটুর জেলা।

কোংকন : (চিনা-কুং-কান-না-পু-লো) : মার্কেণ্ডয় পুরাণ অনুযায়ী এটি বেন্বা নদীর তীরে। দক্ষিণ কোংকন জয় করেছিলেন বিজয়নগরের সেনাপতি মাধব। প্রভু কাশীবিলাসের অনুকম্পায় তিনি শৈব বলে পরিচিত লাভ করেন। ধর্ম সম্পর্কে তার প্রগাঢ়তা মঞ্চলপুরার তাম্রশাসনে দেখা যায়। হিউয়েন সাঙের মতে এখানে ১০০ বৌদ্ধবিহার এবং ১০,০০০ হীনযানী ও মহাযানী ছাত্র ছিল।

কোনকুড়ুরু : গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুরমের ৫ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম।

কোপান : কেলাড়ি সদাশিব নায়কের ক্যাপ তাম্রশাসন অনুসারে কোপন বা কোপাল একটি প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থ। স্থানটি বর্তমান অন্ধ্রে।

কোপ্পম (কুপ্পম) : পেরারু (পলারু) নদীর তীরে একটি গ্রাম। এখানে রাজেন্দ্র

চোল আহবমল্লকে পরাজিত করেছিলেন।

কোপ্পারম : এটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার নরসরাওপেট তালুকে অবস্থিত। এখানে পুলকেশী (দ্বিতীয়)-এর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কোরকাই : এটি তিরুনেলভেলি জেলার কোরগার-র সংস্কৃত রূপ। এটি পান্ড্যদের প্রাচীন রাজধানী। সাধারণত তামিল সাহিত্যে এটিকে কারকাই বলা হয়। এটি একটি উন্নতিশীল সমুদ্রবন্দর ছিল।

কোরি বা কোলি : এটি তিরুচিরাপল্লী শহতলী উরাইয়ূর। রেচাড্‌দের প্রাচীন রাজধানী।

কোরসন্ড : গঞ্জাম জেলার পারলকিমেডির ৬ মাইল দক্ষিণে কোরসন্ড বা কোরসোন্ডা অবস্থিত।

কোরুসন্ডা : রাজমন্দ্রীর ৯ মাইল উত্তরে গোদাবরী উপত্যকায় একটি পাহাড়ি দুর্গ।

কোশল-নাড়ু : এটি দক্ষিণ কোশল। কানিংহামের মতে এটি ছিল গোদাবরীর ওপর দিককার উপত্যকা ও উপনদীর উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে। সোমেশ্বরদেবের কুরুসপাল প্রস্তরলিপি অনুযায়ী মহাকোশল বা দক্ষিণ কোশল বেরার থেকে উড়িষ্যা এবং অমরকন্টক থেকে বস্তার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাজল্যদেবের রত্নপুর লিপিতে আমরা পাই, কলিঙ্গ রাজ দক্ষিণ কোশল অধিকার করে রাজধানী স্থাপন করেন তুম্মানে। বিলহরিলিপি অনুসারে লক্ষণরাজা দক্ষিণ কোশলের রাজাকে পরাস্ত করেন এবং এটি ছিল আধুনিক ছত্রিশগড় এবং তুম্মামকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিলাসপুর জেলার আধুনিক তুমান গ্রামকে।

জৈন জম্বুদীবপন্নত্তি অনুসারে কুশাবতী ছিল দক্ষিণ কোশলের রাজধানী।

কোট্টারু : কন্যাকুমারীর কাছে একটি অতি পরিচিত শহর। এই প্রাচীন শহরটি ত্রিবাংকুর রাজ্যে ছিল এবং কন্যাকুমারীর ১০ মাইল উত্তরে।

কোট্টুর : গঞ্জামের মহেন্দ্রগিরির ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে কোত্থুর। বিশাখাপত্তনম জেলাতেও কোট্টুর বলে একটি স্থান রয়েছে।

কোট্টাশ্রম : ওড়িশার বারিপদার ৩২ মাইল দূরে কুটিং বলে স্থানটি বশিষ্ঠেব আশ্রম বলে চিহ্নিত হয়েছে।

কৌঞ্চালয় : দক্ষিণ ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন।

ক্রোষ্টুকবরত্তনীবিষয় : প্রাচীন ও তৎপরবর্তীকালে গঙ্গ দলিলে এই জেলাটির নাম পাওয়া যায়। এটি আধুনিক শ্রীকাকুল বলে চিহ্নিত। দেবেন্দ্রবর্মণের শ্রীকাকুল তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ আর গঞ্জাম জেলার বংশধারা নদীর উত্তরে এই প্রদেশটি অবস্থিত বলে বলেছেন।

কৃষ্ণগিরি : এটি কারাকোরাম বা কৃষ্ণপর্বত। পশ্চিমে এটি হিন্দুকুশ বলে প্রসারিত। বর্তমান ভূগোলবিদেরা বলেন, এটি হিমালয়ের চেয়েও প্রাচীন।

কৃষ্ণবেরনা আধুনিক কৃষ্ণা নদী। পুরাণের কৃষ্ণচেন্বা, জাতকের কানহপেন্না ও খারবেলের হস্তিগুম্ফার লিপিতে কালহপেন্না দক্ষিণ ভারতের এক প্রখ্যাত নদী। রামায়ণে এটি কৃষ্ণবেনী বা কৃষ্ণবেনা। পশ্চিমঘাট এর উৎস। পূর্বে বঙ্গোপাসাগরে পড়েছে। পারজিটারের মতে এটি আসলে কৃষ্ণা ও কাবেরীর মধ্যবর্তী পেন্নের নদী।

কৃষ্ণা : এটি পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণবেনা বা যোগিনীতন্ত্রে কৃষ্ণবেনী। ভাগবতপুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক নাম কৃষ্ণা।

কৃষ্ণাপুর : বিজয়নগরে পশ্চিমে সীমান্তে একটি পরিত্যক্ত গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের ১৪৫ শকের একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। এই নামেই তিন্নেভেলির দক্ষিণ-পূর্বে একটি গ্রাম রয়েছে যেখান থেকে সদাশিব রায়ের তাম্রশাসনগুলি পাওয়া গেছে।

কৃতমালা : এটি বৈগাই নদী বলে চিহ্নিত। এটি পান্ড্যরাজ্যের রাজধানী মধুরার পাশ দিয়ে বয়ে যায়।

কুন্ডমালাইনাড়ু : এটি কুর্গ মতান্তরে মালাবার।

কুম্ভমুক্কিল : এটি কুম্ভকোনম।

কুডিয়ানতন্ডল : উত্তর আর্কট জেলার একটি গ্রাম।

কুদ্রাহার : জয়বর্মণের তাম্রশাসন অনুযায়ী এটি কোন্ডামুডীর কুড়ুরহার।

কুড়মবনদল : উত্তর আর্কট জেলার চেয্যার তালুকে।

কুমারমংগলম : এটি কোররামঙ্গলম এর পূর্বে, এবং পালারু নদীর দক্ষিণে এই গ্রামটি অবস্থিত।

কুমারপুরা : নেত্তভঞ্জদেবের জুরদা দানপত্রের কুমারপুরা গ্রামটি গঞ্জাম জেলার বেহরমপুরের একই নামে একটি গ্রাম।

কুমারভল্লি : আধুনিক নাম কুমার বল্লিচতুরবেদিমঙ্গলম।

কুমারী : কন্যাকুমারীর পবিত্র নদী।

কুম্ভকোনম : তিরুক্কুডমুক্কু একটি বিখ্যাত নাম। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন নগরীর এক বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে অনেক প্রসিদ্ধমন্দির রয়েছে। দেবতা কুম্ভেশ্বরের নামে নগরটির নাম কুম্ভকোনম।

কুম্মট : এটি গেয়রাবদিনাড়ুতে অবস্থিত।

কুনীয়ূর : এটি তিন্নেভেলী জেলার অম্বাসমুদ্রমের একটি গ্রাম। এখানে ভেঙ্কট (দ্বিতীয়) এর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কুন্তল : এটি কর্নাটক রাজ্যের প্রাচীন একটি জেলা। মহীশূর লিপি অনুযায়ী, কুন্তল অঞ্চল বোম্বে প্রেসিডেন্সি, এবং মহীশূরের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ইউলের মত অনুযায়ী গোন্দালোই আরকুন্তল একই। নন্দরাজারা এক সময়ে এখানে রাজত্ব করতেন। দাক্ষিণাত্যের কুন্তলেরা সেই সময়ে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ১১/১২ শতকের শিলালেখগুলিতে কুন্তলের নাম বারবার উল্লিখিত হয়েছে—তখন রাজ্যটি দক্ষিণ মারাঠাদেশ ও পার্শ্ববর্তী কর্নাটীয় জেলাগুলি নিয়ে গঠিত ছিল। সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বে দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যে সাতকর্ণীদের অনেক পরিবার বসবাস করত। এদেরই কোনও একটি বা একাধিক পরিবার কদম্বদের আগে কুন্তল ও কর্নাটীয় জেলা গুলিতে রাজত্ব করতেন। অজন্তা লিপিতে দেখা যায় যে বাকাটক রাজা পৃথ্বীসেন (প্রথম) একজন কুন্তলেশ্বরকে জয় করেন। বাকাটক রাজা হরিসেন কুন্তল জয় করেন। কর্ণের রেওয়ার প্রস্তর লিপি বলে, কুন্তল চালুক্যদের দেশ ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, কুন্তল ভীমা ও বেদবতীর মধ্যে ছিল। কর্নাটীয় জেলাগুলি, বোম্বে, চেন্নাই, মহীশূর

এবং সম্ভবত মহারাষ্ট্রের বিদর্ভসহ অঞ্চল নিয়ে ছিল কুন্তল। রাজধানী ছিল গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান। তালগুন্ডার এক স্তম্ভলিপি অনুযায়ী, কুন্তলে বিজয়ন্তীর এক কদম্ব রাজা গুপ্ত ও অন্য রাজাদের সঙ্গে তাঁর মেয়েদের বিবাহ দেন। মধ্যযুগের কিছু কুন্তল রাজা চন্দ্রগুপ্তের বংশধর বলে দাবী করেন।

কুর : ১০৮টি পরিবার সমৃদ্ধ বেদপাঠ নিরত একটি গ্রাম।

কূরং : এটি কাঞ্চীপুরম জেলার একটি গ্রাম। একটি লেখতে দেখা যায়, কূরংসভা একখন্ড ভূমি বিক্রয় করছে।

কুবলয়সিংগমাল্লুর : চেন্নাই জেলার উপকণ্ঠে অন্ডানাড়ু সাবডিভিশনে এটি অবস্থিত।

কুবলাপুর : এই শহরটির আধুনিক নাম কোলার।

লালগুডি : তিরুচিরাপল্লী জেলায় অবস্থিত। এখানে তিনটি তামিল লিপি পাওয়া গেছে।

লামু : এটি গুন্টুর জেলায় অবস্থিত।

লাঙ্গুলীয় : নদীটি নাগাবতী বলেও পরিচিত। গোদাবরী ও মহানদীর বদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। মহাভারতে উল্লিখিত লাঙ্গলী নদীকে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছে লাঙ্গুলিনী।

লেকুমারী : এটি কাইকালুর তালুকের লোকমুডি।

লোহিতগিরি : এটি তদানিন্দন উড়িষ্যার একটি পাহাড়।

লোকালোক পর্বত : একটি পর্বতের নাম।

লুপটুরা : এটি তদানিন্তন-ওড়িশার পাটনা স্টেটের তাম্রশাসন অনুযায়ী লিপটুংগা।

মধ্যম-কলিঙ্গ : আধুনিক বিশাখাপত্তনমের অনুরূপ একটি অঞ্চল। কেউ কেউ বলেন এটি মেগাস্থিনিসের মোডোকলিঙ্গ।

মাদুরাই : পান্ড্যদের রাজধানী মাদুরা।

মাদুরমন্ডলম : একটি দেশের নাম। প্রাচীন পান্ড্যদেশ, রাজধানী মাদুরা। এটি টলেমির মোদোউরা। বৈগাই নদীর তীরে অবস্থিত।

মাদুরা : রামায়ণ অনুযায়ী এই সুন্দর নগরটি দীর্ঘকাল রাক্ষস পরিপূর্ণ ছিল। বৈগাই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নগরটি মন্দিরে পূর্ণ। এর মধ্যে মীনাক্ষী মন্দির সবচেয়ে বড়। মন্দিরটির একটি ভাগ মীনাক্ষী লক্ষ্মী এবং আর একটি ভাগ শিবকে উৎসর্গীকৃত। পান্ড্য রাজাদের রাজধানী ছিল মাদুরা। এটি ১৩ শতাব্দীর রাজা জটাবর্মণের রাজধানী ছিল। ইনি কর্নাটকের হোয়সল রাজাকে জয় করেছিলেন।

মাদুরোদায়বলনাড়ু : পান্ড্যদেশের একটি জেলা।

মহাবলিপুরম : মমল্যপুরম বা মহাবলীপুরম পল্লবযুগে সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। পল্লবরাজ মহামল্ল নরসিংহবর্মণের নাম অনুযায়ী এই নগরের নাম। ইনি সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চির এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। সমুদ্রে ধারে নগরটি অবস্থিত। চেন্নাই থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে। বৈষ্ণবমতে শিব ও বিষ্ণু এখানে বাস করতেন। তাই দুই দেবতার মন্দিরই কাছাকাছি রয়েছে। ভাস্কর্য্য দিয়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী এখানে মূর্তিময় করা হয়েছে।

মহাগৌরী : মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণিত ব্রাহ্মণী নদী। এটি ওড়িশায়।

মহাকান্তার : অনেকের মতে মহানদীর তীরে সম্বলপুর এর রাজধানী ছিল। এটি পূর্ব গন্ধবন বা দক্ষিণ ঝাড়খন্ড বলে চিহ্নিত।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রদেশ বা মো-হা-লা-ছা। এটি গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী একটি দেশ। আইহল লিপি অনুযায়ী এই দেশ তিনটি অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটিই ৭ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রক বলে কথিত।

হিউয়েন সাঙের মতে এই দেশের আয়তন ৫০০০ লী। এটি সম্ভবত টলেমির এরিয়েক। দেশটি আয়তনে ৬০০০ লী। রাজধানী ৩০ লী, রাজধানীর ভেতর ও বাইরে পাঁচটি অশোক স্তুপ ছিল। প্রাচীন রাজধানী গুলি ১) প্রতিষ্ঠান বা পইথান—গোদাবরীর তীরে। ২) বোম্বে বন্দরের পূর্ব তটভূমি কল্যাণ। ৩) আগেকার চালুক্যদের বাতাপি। ৪) হিউয়েন সাঙের আমলে বাদামী। সোপারা ও মাস্কি লিপি অনুযায়ী মহারাষ্ট্রদেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। অশোক ধম্মরক্ষিতকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন।

মহাবিন্দ্যায়ক পাহাড় : ওড়িশার জাজপুরের একটি পাহাড়। শৈবরা এই পাহাড়টিকে পূজা করে।

মন্দ্রেবাদি : এটি শোলিনঘুব রেল স্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে। এখানে আর্কেইক পল্লব অক্ষরে লেখা গুণভরের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

মহেন্দ্রাচল : যোগিনীতন্ত্র ও গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের গৌতমী তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে মহেন্দ্র পর্বতের। সম্ভবত এটি গঞ্জাম জেলার এই নামের এক পর্বতশ্রেণি যা পান্ড্যদেশ বা সমস্ত পূর্বঘাট পর্বতমালা জুড়ে প্রসারিত। মহেন্দ্রাদ্রি বা মহেন্দ্র পর্বত গঙ্গাসাগর সংগম ও সপ্তগোদাবরীর মধ্যবর্তী কোনও স্থানে। পূর্বঘাটের একটি অংশকে গঞ্জামে এখনও মহেন্দ্র পাহাড় বলা হয়। পারজিটার বলেন, মহানদী, গোদাবরী ও ওয়েনগঙ্গার মধ্যবর্তী পাহাড়গুলির এই নাম হবে এবং গোদাবরীর উত্তরে পূর্বঘাটের একটি অংশকে এর মধ্যে ধরা যেতে পারে। বাণের হর্ষচরিত অনুযায়ী, মহেন্দ্রপর্বত মলয় পর্বতকে যুক্ত করে। চৈতন্য চরিতামৃতেও এই কথা বলা হয়েছে। রঘুবংশে এটিকে কলিঙ্গে অবস্থিত বলা হয়েছে। বাস্তবে এই নামটি গঞ্জামকে মহানদীর উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্নকারী পর্বতশ্রেণিগুলির নাম। কালিদাস বলেছেন, কলিঙ্গরাজ মহেন্দ্ররও অধিপতি। মহেন্দ্র পর্বতমালার সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট পাহাড়গুলি হচ্ছে শ্রীপর্বত, পুষ্পগিরি, বেনকটাদ্রি, অরুণাচল ও ঋষভ। উড়িষ্যা থেকে মাদুরাই জেলা পর্যন্ত প্রসারিত পর্বতমালাকে মহেন্দ্রপর্বত বলা হোত। পূর্বঘাট এর সঙ্গে যুক্ত। রামচন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়ে পরশুরাম এখানে বিশ্রাম নেন।

প্রাচীন ভূগোলবিদেরা পূর্বঘাটকে মহেন্দ্রগিরি বলতেন, কারণ আজও এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মহেন্দ্রগিরি।

মহিমসক : রাজধানী সকুল সম্বলিত একটি রাজ্য।

মহিশা : রাইসের মতে এটি মহীশূর। কেউ বলেন মাহিষ্যতি। আবার কেউ বলেন মহাশ্বর—নর্মদার উত্তর তীরে।

মহোদয়পুর : এটি নদী অলওয়ের তীরে আধুনিক তিরুবঞ্চিক্কুলম।

মৈনাক পর্বত : রামায়ণ বলে এটি দক্ষিণ ভারতে। এটিকে মলয়গিরিও বলে।

মালাবার : এটি কেরালা দেশ।

মলাইক্কুরম : কাবেরীর বদ্বীপে হিউয়েন সাঙ বর্ণিত মালাকুটা (মা-লো-কু-টা) জেলা।

মালাইনাডু : এটি মালয়লম বা মালাবার। পান্ড্য ও চের রাজাদের ভূখন্ড নিয়ে এই দেশ। রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে এর উল্লেখ আছে।

মালাইয়ূর : এটি একটি পাহাড়ের ওপরকার দুর্গ।

মালকেটক : কর্ণাটক রাজ্যের গুলবর্গা জেলার মালখেড়।

মলয়গিরি : এটি একটি পাহাড়ের নাম। বৃহৎসংহিতা ও রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। একজন পান্ড্যরাজা দেশ ছেড়ে এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পারজিটারের মতে এটি পশ্চিঘাটের নীলগিরি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অংশ। অগস্তের আশ্রম মলয়কূটের ওপর ছিল। এটি শ্রীখন্ডাদ্রী বা চন্দ্রনাদ্রী বলেও পরিচিত ছিল। বলরাম এখানে এসেছিলেন। মনু এখানে তপস্যা করেছিলেন। কাবেরীর নীচে পশ্চিমঘাটের দক্ষিণের বিস্তার এখন ত্রিবাংকুর পর্বতমালা বলে পরিচিত। এটি সত্যই মলয়গিরির পশ্চিম অংশ। কেউ কেউ বলেন জাতক বর্ণিত চন্দক পর্বতই মলয়গিরি বা মালাবার রাজ্য।

মলয়াচল : মহাকাব্যে এটি দক্ষিণ দেশ, জীমূতবাহন তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রচার করে এই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্মপুরাণ মলয়াচলে কল্যাণ তীর্থের কথা বলেছে। দন্ডিণের কাবাদর্শের দক্ষিণাদ্রীই মলয়াচল।

মালখেড় : কৃষ্ণ (তৃতীয়) এর সালোগি লিপিতে বলা হয়েছে এই রাজধানীটি রাষ্ট্রকূটদের স্থিরিভূত কটক অর্থাৎ সৈন্যাবাস।

মল্লাই : চিংলেপুট জেলার আধুনিক মহাবলীপুর।

মনগোলী : কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম।

মানালুর : তুঙ্গভদ্রার তীরে একটি গ্রাম। পান্ড্য রাজ্যে মানালুর বলেও একটি গ্রাম আছে।

মনয়িরকোট্টম : তামিলনাড়ুর এটি একটি প্রাচীন জেলা।

মনদারথি : কর্ণাটকের কানারা জেলার উদিপি তালুকের একটি গ্রাম। এখানে দুর্গা পরমেশ্বরীর মন্দির রয়েছে।

মনেইকাল্লু : অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় একটি প্রাচীন প্রত্নস্থান। এখানে এক পূর্বতন ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গেছে।

মণিমঙ্গলম : এটি বন্যাসুর স্টেশনের ৬ মাইল দূরে একটি গ্রাম। সংস্কৃতে এর নাম রত্নাগ্রহার। নরসিংহপুরম (চিংলেপুট) লিপিতে পরিচিত হয় 'কিডারমগোন্ডা-শোলপুরম' নামে। এখানে এক যুদ্ধে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণ চালুক্যরাজ পুলকেশীকে পরাস্ত করেন।

রাজরাজের রাজত্বের সময় শিলালিপিতে মণিমঙ্গলকে বলা হয়েছে, লোকমহাদেবী-চর্তুবেদিমঙ্গলম—রানী লোকমহাদেবীর নামে। কিন্তু তাঁর ১৫ বছর পরে উত্তরাধিকারদের রাজত্বের সময়—কুলতুঙ্গের (প্রথম সময় পর্যন্ত গ্রামটিকে বলা হোত রাজচূড়ামণি-

চতুর্বেদিমঙ্গলম।

মঞ্জিরা : বালাঘাট পর্বতমালায় উৎপন্ন গোদাবরীর একটি উপনদী। এর আর একটি নাম বঞ্জুলা।

মান্নেরু : অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার একটি নদী।

মারুদুর : তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার একটি গ্রাম।

মট্টেপাদ : গুন্টুর জেলার একটি গ্রাম। এখানে দামোদর বর্মণের পাঁচটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

মাহিশক (মাহিশিক) : এটি দক্ষিণে। এখানে বসবাসকারীদের পুরাণ দক্ষিণের লোক বলে।

মাডক্কুলম : মাদুরার পশ্চিমে অবস্থিত।

মহিশক (মাহিশীকা) : এর দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিল।

মাহিশমতী (পালি—মাহিষ্যতি) : মহাভারতের সভাপর্বে এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি ইন্দোরের ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মনে হয় এটি নর্মদার দক্ষিণ তীরে বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত—আধুনিক মান্ধাতা অঞ্চল—যেখানে রামায়ণবর্ণিত মাহিশিকা নদীটি ছিল। হরিবংশ অনুযায়ী মাহিষ্যতির প্রতিষ্ঠাতা মুচুকন্দ। কেউ বলেন মাহিশমত এর প্রতিষ্ঠতা। পুরাণ অনুযায়ী যদুবংশীয় এক রাজকুমার এই নগরের পত্তন করেন। ভাগবতপুরাণ বলে, এটি হৈহয়দের রাজ্য। পদ্মপুরাণ বলে এটি নর্মদার তীরে অবস্থিত। দশকুমারচরিত বলে, রানী বসুধরা ও রাজপুরীর শিশুদের এখানে এনে মিত্রবর্মাকে উপহার দেওয়া হয়। ভান্ডারকার বলেন, অবন্তী-মাহিষ্যতির রাজধানী ছিল মাহিষ্যতি। মহাভারত অবন্তী ও মাহিষ্যতিকে পৃথক করেছে। পতঞ্জলী তাঁর মহাভাষ্যে মাহিষ্যতিকে বিদর্ভ ও কাঞ্চীপুরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

মামল্লপুরম : সমুদ্রতীরে সাতটি মন্দির শোভিত গ্রাম। পল্লবদের স্থাপত্য কীর্তির অবশেষ এবং অতীতের এক পল্লব বন্দর।

মারমঙ্গলম : এটি তিন্নেভেলী জেলার মারনেরী ও মারমঙ্গলমকে অতীতে মারমঙ্গলম বলা হোত।

মাবিনুরু : সম্ভবত এটিই কন্নুর লিপির মাবিনুরু। কিলহর্ন কোন্নুরের আটমাইল দক্ষিণে মান্নুরকে চিহ্নিত করেছেন। অমোঘবর্ষের (শক ৮২৮) ভেঙ্কটপুর লিপিতে লেখা আছে যে জনৈক চন্দ্রতেজভট্টারকে এক বাজার সমেত একটি উদ্যান দান করা হয়েছে।

মায়িরুডিংগম : এটি একটি দ্বীপ। পরিখার মতো সমুদ্র বেষ্টন করে আছে।

মেলপট্টি : উত্তর আর্কট জেলার গুডিয়াত্তম তালুকে অবস্থিত। এখানে বিজয়কম্পা—বিক্রমবর্মণ-এর লিপি পাওয়া গেছে।

মেলপাডি : তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার একটি গ্রাম। এটি নীভানদীর পশ্চিম তীরে। সোরানরলাইকোন্ডা বীরপান্ড্য-এর অম্বাসমুদ্রম লিপি অনুযায়ী এটি চিত্তুর জেলায়। রাষ্ট্রকূট রাজা গোবিন্দ (তৃতীয়) যখন এখানে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন তখন কৃষ্ণ (তৃতীয়)-এর কারহাড তাম্রশাসন প্রচারিত হয়েছিল।

মেলুর : মাদুরার ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমের একটি গ্রাম।

মেরু : এটি একটি পাহাড়—যার মাথায় স্বর্ণখনি আছে বলে কথিত। এটি জম্বুদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। চিদাম্বরমকে দক্ষিণের মেরু বলা হয়। কারণ, এটির হলঘরের ছাদটি স্বর্ণমণ্ডিত।

মিনডিগল : এটি কর্ণাটকের কোলার জেলার চিন্তামণি তালুকে।

মিয়ারুনাড়ু : এটি উত্তর আর্কট জেলার তিরুভল্লং জেলা ও আশপাশের অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

মোরোউন্ডা : টলেমি বলেছেন, এটি আইওআইয়ের দ্বীপ শহর। সঠিক ভাবে চিহ্নিত না হলেও সম্ভবত এটি কেরালার দক্ষিণে কোথাও ছিল। সম্ভবত এটি মুরুন্দদের নগর এবং সুদূর দক্ষিণে মুরুন্দইদের আর একটি উপনিবেশ ছিল।

মৃশিক (মুশিক বা মুশক) : মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী মৃশিকদের দেশ ছিল দক্ষিণপূর্বে। পারজিটার বলেন, মৃশিক সম্ভবত মুসি নদীর তীরে অবস্থিত যেখানে আজ আধুনিক হায়দ্রাবাদ। মহাভারত ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে মৃসিকদের দক্ষিণের লোক বলা হয়েছে।

মুডুমড়ুবু : মহারাজা গন্ডত্রিনেত্রর বৈদুম্ব লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি সম্ভবত অনন্তপুর জেলার মুদিমড়ুগু।

মুগাইনাড়ু : জয়নকোন্ডাচোলমন্ডলমের একটি জেলা।

মূলক : বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় মূলকদের মৌলিক বলা হয়েছে। মূলক একটি ছোট উপজাতি এবং দক্ষিণের অস্মকদের কনিষ্ঠ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টিকাকার ভট্টস্বামী বলেছেন এটি আসলে মহারাষ্ট্র। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে, মূলক এবং অস্মকেরা ইক্ষবাকু পরিবারের অংশ। গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে, মূলক উপজাতির জনক এবং ভগীরথের বংশধর এক অস্মক রাজার পুত্র। গোদাবরী অস্মক এবং অড়ক বা মূলকদের রাজ্যের সীমারেখা। বিষ্ণুধর্মোত্তর-এ বলা হয়েছে, এরা দুটি পৃথক জাতি। সোনানন্দ জাতক অনুযায়ী অস্মক অবন্তীর অন্তর্গত। সোনানন্দ জাতকের পরিপ্রেক্ষিতে ভান্ডারকারের ভাষায় বলা যায়, পরবর্তীকালে মূলকরা অস্মকদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। এই তাই এটিকে অবন্তীর অন্তর্গত দেখানো হয়েছে। গৌতমীর নাসিক শিলালিপিতে দেখি, দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক পরবর্তী সময়ে মূলকেরা অস্মকদের চেয়ে পৃথক ছিল।

মুন্ডারাষ্ট্র : সিংহবর্মণের উরুভুপল্লী এবং পিকিরা দানপত্রে এটির উল্লেখ করা হয়েছে। নেলোরলিপি অনুযায়ী এটি মুন্ডা-নাড়ু বা মুন্ডাইনাড়ু।

মুরলা : এটি কেরালার একটি নদী।

মুরুপ্পুনাড়ু : তিন্নেভেলী জেলার শ্রীবৈকুণ্ঠম তালুকের একটি গ্রাম। তাম্রপর্ণী নদীর ডান তীরে অবস্থিত।

মুরাসীমন : মহারাজা ভবগুপ্ত (প্রথম) জন্মেজয়ের কালিভনা তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। চিহ্নিত হয়েছে উড়িড্যার জরসিংহ জমিদারীর মুরসিং।

মুরুর : উত্তর কর্ণাটকের কানারা জেলার মুরুর গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

মুসিকনগর : খারবেলের হস্তিগুম্ফার লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে মুসিকনগরের অধিবাসীদের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করেছিলেন।

মুসুনিক : দেবেন্দ্র বর্মণের (তৃতীয়) (গুঙ্গ-৩০৬) মুসুনিক দানপত্রে এই গ্রামটি দান

করা হয়েছে। মুসুনুরু গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

মুটগি : কর্ণাটকের বিজাপুর জেলার বাগেওয়াড়ি তালুকের একটি গ্রাম। এর প্রাচীন নাম মুরিটেজ। এখানে দুটি লিপি পাওয়া গেছে।

মুটিব : এটি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। অধিবাসীরা মুটিবা বলে পরিচিত ছিল। এটিই সম্ভবত প্লিনির মোড়ুবা।

নন্দগাম : এটি ওড়িশার গঞ্জাম জেলার নরসন্নপেটা তালুকের একটি গ্রাম।

নক্কবারম : নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তামিল নাম।

নলটিগিরি বা নল্টিগিরি বা ললিতগিরি : বিপুরা নদীর তীরের বালিচন্দ্রপুরার দক্ষিণপূর্বে স্থানটি অবস্থিত। কাছেই ধানমন্ডল রেলস্টেশন। এটি একটি বড় গ্রাম— তিনটি পাহাড় রয়েছে। বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির একটি দাঁড়ানো ও দুই হস্তবিশিষ্ট পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ও চতুর্ভূজা তারার মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে।

নন্দগিরি : ভারতীয় যাদুঘরে গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের তাম্রশাসনে স্থানটির উল্লেখ রয়েছে। নন্দিদুর্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি কোলার জেলার একটি দুর্গ সম্বলিত পাহাড়।

নন্দীপুরম : তামিলনাড়ুর কুম্বকোনমের কাছে নাথমকোবিল গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

নন্দিভেলুগু : এটি অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায়। এখানকার একটি শিবমন্দিরের ছাদে একটি খোদিত লিপি পাওয়া গেছে।

নরসপটম : এটি বিশাখাপত্তনম জেলায়।

নরসিংহপল্লী : এটি গঞ্জাম জেলার শ্রীকাকুল তালুকে। এখানে কলিঙ্গের (৭৯ খ্রিঃ) হস্তিবর্মণের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

নরবন : বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয়, শক ৬৬৪) নরবন তাম্র শাসনে রাষ্ট্রকূট রাজ গোবিন্দরাজের অনুরোধে একজন চালুক্যরাজ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম দান করেন। গ্রামটি মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার গুহাগরপেটার সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।

নবগ্রাম : বজ্রহস্ত (তৃতীয়)-এর গঞ্জাম তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। গঞ্জাম জেলার আধুনিক নওগামকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নবখন্ডবাড় : ১৬৮৬ খৃঃ পিথাপুরম লিপি অনুযায়ী—পিথাপুরমের কাছে অবস্থিত এই গ্রামটি কুন্তিমহাদেবকে উৎসর্গ করা হয়।

নভতুল বা নভতুলা : গুণার্নভের পুত্র দেবেন্দ্রবর্মণের ত্রিলিঙ্গ লিপি অনুযায়ী গ্রামটি কোরাসোডকপাঞ্চালিবিষয়ে অবস্থিত ছিল। পারলাকিমেডির ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নন্তলা গ্রামটি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশাখবর্মণের কোরোসন্ডা তাম্রশাসন এবং ইন্দ্রবর্মণের শ্রীকাকুল তাম্রশাসন কোরাসন্তাপাঞ্চালির উল্লেখ করেছে এবং গঞ্জাম জেলার আধুনিক কোরাসন্ডাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নয়নপল্লী : অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলার বাপাটলা তালুকের মোটুপল্লে থেকে ৩ মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে গণপতিদেবের একটি প্রস্তর লিপি পাওয়া গেছে।

নাগার্জুনকোন্ডা : গুন্টুর জেলার পলনাড তালুকে রয়েছে এই পাহাড়টি। কৃষ্ণা নদীর ডান তীরের দিকে এটি ঝুঁকে আছে। এই উল্লেখযোগ্য স্থানটি ১৯২৬এ আবিষ্কৃত হয়। অনেকগুলি ইঁটের ঢিবি এবং মর্মর পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু স্তম্ভের

গায়ে ২য় ও ৩য় শতাব্দীর প্রাকৃত ও ব্রাহ্মী অক্ষরের লিপি পাওয়া গেছে। অনেকগুলি বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির, স্তূপ, লিপি, মুদ্রা, স্মৃতিচিহ্ন, মৃৎশিল্প, মূর্তি এবং ৪০০র বেশি অমরাবতীর মতো 'বাস রিলিফ' পাওয়া গেছে। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে প্রাপ্ত লিপিগুলি থেকে জানা যায়; ২য় ও ৩য় শতকে প্রাচীন বিজয়পুরীনগর দাক্ষিণাত্যের অন্যতম বিশাল এক বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। বিহার, স্তূপ ইত্যাদি বড় বড় ইঁট দিয়ে তৈরি—এক কাদার মশলা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। তারও পরে প্রলেপ লাগানো হয়েছিল। নাগার্জুনকোন্ডায় প্রতিটি বিহার স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বিহারের চৌকো উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, মধ্যভাগে পাথর বাঁধানো এই সভাকক্ষ। পাথরের স্তম্ভ ছাদের ভার বহন করত। চারদিক ঘিরে বারান্দাসহ ভিক্ষুদের ঘর ছিল। ৬টি এই রকম বিহার খুঁড়ে বার করা হয়েছে।

নাগপটম তালুক : বর্তমানে তামিলনাড়ুর তাঞ্জোভুর জেলার সমুদ্র বন্দরটি এককালে বৌদ্ধ মূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

নান্দিকডা : বাকাটক রাজা বিন্ধ্যশক্তির বাসিন তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। তদানিন্তন নিজামরাজ্যের ননদেদ জেলার একই নামের শহরটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নেলকুন্ডা : এটি চিত্রদুর্গ জেলার নেলকুন্ডাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে চালুক্য অভিনবগুপ্তর একটি দানপত্র পাওয়া গেছে।

নেল্লুর : এটি আধুনিক নেলোর। পূর্বভাগের চালুক্যেরা এই জেলার উত্তর ভাগ শাসন করত।

নেট্টুর : গ্রামটি শিবগাংগা তালুকে অবস্থিত।

নিড়ুর : কাবেরীর উত্তর তীরে তাঞ্জোরের মায়াভরম তালুকে অবস্থিত।

নীল : মালাবারের বিখ্যাত নদী পোনামী।

নীলা ঃ মহাজব ও পঞ্চাপসরা হ্রদের মধ্যবর্তী একটি বন।

নীল-গঙ্গভরম : গুন্টুর জেলায় অবস্থিত। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

নীলকণ্ঠচতুর্বেদিমঙ্গলম : তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট জেলার করাইভরী আন্দিনাড়ু গ্রাম।

নীলাচল : এই পাহাড়টি উৎকলের মধ্যস্থলে।

নীলগুন্ডা : কর্ণাটকের বেলারী জেলার একটি গ্রাম। এখানে বিক্রমাদিত্য (৬ষ্ঠ) এর কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

নীভা : পালারুর উপনদী।

নুটিমডুগু : অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার একটি গ্রাম। এখানে কয়েকটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে।

ওড্ডাবিষয় : উড্র বা ওডড বা ওড্রদের দেশ। (তেলেগু—ওডরুলু, কানারী—গুড্ডরু এবং হিউয়েন সাঙের যু ছা) হচ্ছে আধুনিক ওড়িশা। বৃহৎসংহিতায় এটি উড্র, যোগিনীতন্ত্রে ওড্র। মহাভারতে উড্রদের উৎকল, মেকল, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং অন্ধ্রদের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। পালি অপদানে কথিত ওড্ডকরাই ওড্র বা উড্র। ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, ওড্রদেশ উত্তরদিকে বিরজা মণ্ডল পর্যন্ত (জাজপুর) প্রসারিত এবং তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে

গঠিত। শ্রীক্ষেত্র, সবিতু বা অর্কক্ষেত্র ও বিরজা ক্ষেত্র। হিউয়েন সাঙ এদেশে পরিভ্রমণ করেন। কর্ণসুবর্ণপুর থেকে যাত্রা করে ৭২২লী পথ অতিক্রম করে য়ু-টু বা ইউ-ছাতে আসেন। রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বের ত্রয়োদশ বছরের তিরুমালাই শিলালিপিতে বলা হয়েছে রাজেন্দ্র চোল ওড্ডবিষয় জয় করেন। নরেন্দ্রভঞ্জদেবের আদিপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে আদিতে ওড্রবিষয় বলতে ছোট একটি জেলা বোঝাত, পরবর্তীকালে এর দ্বারা সমগ্র রাজ্যটিকেই বোঝান হোত—যা আয়তনে ৭০০০ লী ছিল। এখানে অনেক সঙ্ঘারাম ও মন্দির ছিল।

ওল্লাংগ : কেওঞ্ঝর জেলার দেলাং গ্রামটি চিহ্নিত।

ওয়ামানাড়ু : এটি জয়নকোণ্ডাচোলমণ্ডলম জেলার বিজয়রাজেন্দ্রবলনাড়ু। এই দেশটি তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার আধুনিক শহর টিনডিবনম অঞ্চল ঘিরে অবস্থিত ছিল।

পড়ুভুর-কোট্টম : বিজয়কম্পবিক্রমবর্মণের মেলপত্তি লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক ভেলোর ও গুডিয়াট্টম তালুক নিয়ে দেশটি গঠিত ছিল।

পৈথান : সাতবাহন রাজাদের সময় উন্নতিশীল এক নগর যা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত ছিল। এটি আওরঙ্গবাদ জেলার গোদাবরীর উত্তর তীরে অবস্থিত। সুত্তনিপাতে নগরটিকে অস্মকদের রাজধানী বলা হয়েছে। পালি নিকায়তে পোতানাই অস্মকদের রাজধানী পৈথান। এটি সাতবাহন রাজা শতকর্ণী এবং তাঁর পুত্র শক্তিকুমারের রাজধানী ছিল। জৈন গ্রন্থ অনুসারে সাতবাহনেরা উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠানপুর অধিকার করে। শতকর্ণী জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং গোদাবরী তীরে মহালক্ষ্মীর একটি মূর্তি স্থাপন করেন।

পক্ষীতীর্থ : দেবতা বেদগিরিশ্বরের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের মাথার মন্দিরের কাছে প্রত্যেকদিন দুটি চিলকে ভোজন করানো হয়। পল্লবদের সময় থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পাখি দুটি নাকি আসে।

পড়ক্কাড়-স্থান : সিংহবর্মণ এখানে তাঁর উরুভুপল্লী তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। কেউ কেউ পলাকটাকে চিহ্নিত করেন। কেউ আবার গুন্টুর জেলার পলকালুরু গ্রামটিকে চিহ্নিত করেন। কেউ আবার নেলোর জেলার পলকুরুকে প্রাচীন পলক্কডা বা পলাটকটা বলে মনে করেন।

পালনি : এটি চেন্নাই রাজ্যের মুরুগা নামে পবিত্র পাহাড়।

পম্পা : ঋষ্যমুখপর্বতের লাগোয়া একটি হ্রদ।

পম্পাপতি : তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত হাম্পি। উত্তর পশ্চিমে রয়েছে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে কৃষ্ণরায়ের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

পনমালাই : দক্ষিণ আর্কট জেলার একটি গ্রাম। পনমালাই গুহাটি রাজসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজসিংহের সময় পল্লবেরা সুদূর দক্ষিণে পনমালাই পর্যন্ত রাজত্ব করতেন।

পঞ্চধার : এখানে চোড়রাজ কামরাজা রাজা গজপতির সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হন।

পঞ্চধারল : এটি বিশাখাপতনম জেলায় অবস্থিত।

পঞ্চপাণ্ডবমালাই : আর্কট শহরের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই নামের পাহাড়টি

অবস্থিত। এটি সম্ভবত পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

পনমানাড়ু : দক্ষিণ আর্কট জেলায় অবস্থিত।

পরিবৈননাড়ু : এটি অনন্তপুর জেলায় অবস্থিত।

পরুবিষয় : পেনুকোণ্ডা তাম্রশাসনের পরুবিবিষয় একই স্থান। অনন্তপুর জেলার পারিগিকে চিহ্নিত করা যায়।

পট্টেসাম : গোদাবরীর একটি দ্বীপের নাম। বীরভদ্রের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

পয়ালি পট্টন : রাষ্ট্রকূট রাজধানী মান্যখেট বা মালখেড়-এর পশ্চিমী সীমাতে গ্রামটি অবস্থিত।

পাণ্ডুনারবিষয় : অম্মরাজা (দ্বিতীয়)-এর বন্দরাম তাম্রশাসনের পাভুনাবারবিষয় একই স্থান। সম্ভবত এটি আধুনিক কৃষ্ণা জেলার তনকু তালুক নিয়ে গঠিত ছিল।

পালক্কা : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত রাজ্যটি ভিনসেন্ট স্মিথের মতে মালাবারের পালঘাট বা পালক্কাড়ু।

পালারু : উত্তর আর্কট জেলার পালার নদী।

পালার (পালের) : এটি ক্ষীর নদী বলেও পরিচিত। নালগোণ্ডা পাহাড়ে এর উৎপত্তি। ভেলোর, আর্কট, চিংলেপুট এই নদীর তীরে অবস্থিত।

পালুর : কলিঙ্গের এক নগর দন্তপুরা।

পঞ্চপালি : কেওঞ্জর জেলার আনন্দপুর সাবডিভিশনে পঞ্চপালি।

পঞ্চাপসরা : দণ্ডকারণ্যের উত্তর সীমায় একটি হ্রদ।

পাণ্ড্য : পাণিনী অষ্টাধ্যায়ীতে কথিত পাণ্ড্যদেশ মাদুরা ও তিরুনেলভেলি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। রঘুবংশ অনুযায়ী পাণ্ড্যদের রাজধানী উরাগপুর। টলেমি অনুযায়ী এটি পানডিয়ন রাজ্য। মদোউরা এর রাজধানী।

রাজেন্দ্র চোল এদেশ জয় করেছিলেন। ত্রিবাংকুর ১ম শতাব্দীতে পাণ্ড্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আদিতে তিন্নেভেল্লী জেলার তাম্রপর্ণী নদীর তীরে এর রাজধানী ছিল কোলকাই, পরবর্তীকালে মাদুরা (দক্ষিণের মথুরা)। মহাভারত ও অনেক জাতকে পাণ্ডুদের ইন্দ্রপ্রস্থের শাসককূল বলা হয়েছে। কাত্যায়ন তাঁর বত্তিকাতে পাণ্ডু থেকে পাণ্ড্য শব্দটি গ্রহণ করেছেন। রামায়ণে ও পাণ্ড্যদের দেশের কথা বলা হয়েছে—সেখানে সুগ্রীব সীতার সন্ধানে বানর সেনা পাঠিয়েছিলেন। মহাভারতে বলা হয়েছে সহদেব দাক্ষিণাত্যে গিয়ে পাণ্ড্যদের জয় করে। অশোকের শিলালিপি নং ২ ও ১৩ বলেছে পাণ্ড্যদের রাজ্য তাঁর রাজ্য সীমানার বাইরে ছিল। স্ট্রাবো লিখেছেন, পানডিয়ন নামে এক রাজা অগাস্টাস সিজারের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন—সম্ভবত সেটি পাণ্ড্য দেশই হবে।

জৈন উপকথা পাণ্ডুদের পাণ্ড্যদেশের সঙ্গে জড়িত করে। রাজধানী মধুরা।

পারদ : কারো কারোর মতে পারদদের দেশ দাক্ষিণাত্যে হলেও, পারজিটার এটি উত্তর পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বলে বলেছেন। পারদেরা সম্ভবত বর্বর উপজাতি ছিল। হরিবংশ অনুযায়ী রাজা সগর এদের হেনস্তা করেন।

পারাবত : দাক্ষিণাত্যের এক বৌদ্ধবিহার—৫ম শতাব্দীতে ফাহিয়েন স্থানটি পরিদর্শন করেন। পাহাড় খুঁড়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। পাঁচটি তলা ছিল।

পারিকুড : এটি পুরী জেলায় অবস্থিত। মধ্যমরাজাদেবের তাম্র শাসন এখানে পাওয়া গেছে।

পেডাকোমডাপুরী : এখানে চোড় রাজ কামরাজ দাবুরুখানু ও অন্যান্যদের তাদের রাক্ষস সেনা সমেত পর্যদুস্ত করেন।

পেডাবম্মিদি : এটি অন্ধ্রের শ্রীকাকুলান জেলার ভরসন্নপেট তালুকে অবস্থিত ছিল।

পেড্ডামড্ডালি : এটি কৃষ্ণা জেলার নুজবিদ তালুকে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে নানান লিপি পাওয়া গেছে।

পেদ্দাভেগি : ইলোরের কাছে বেনগিপুরা গ্রামটিকে চিহ্নিত করা চলে। এখানে অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

পেদ্দাবম্মিডি : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার নরসন্নপেট তালুকে অবস্থিত।

পেন্নের : উত্তর পেনের ও দক্ষিণ পেনের দুটি নদী। বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পেরামবেয়ার : এই গ্রামটি উত্তর আর্কট জেলায় অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে।

পেরাবলী : এটি পেরাবলি গ্রাম, এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

পেরুমবুল্লি : রমানাথপুরমের ৯ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। এটি দিনদিগুল তালুকে অবস্থিত।

পেরুমুগাই : তামিলনাড়ুর বেলুরের কাছে আধুনিক পেরুমাই। এটি আর্কট (উঃ) জেলার বর্তমান ভেলোর তালুকে অবস্থিত।

পেরুনগর : কাঞ্জিভরম থেকে ওয়ানদিওয়াশ যাবার পথে একটি গ্রাম।

পেরুনগরি : এটি টলেমির পেরিংকারেই। এটি বইগাই নদীর তীরে অবস্থিত।

ফেরবা : এটি সোমপেটা তালুকের আধুনিক -র্ণা গ্রাম।

ফুলসরা : এটি গঞ্জাম জেলার একটি গ্রাম। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

পিন্নি : দক্ষিণ আর্কট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পেন্নাই নদী।

পিপ্পলাল : ইলোরা থেকে ৩৩ মাইল দূরে আধুনিক পিমপ্রল।

পিরানমালাই : এটি রামনাদপুরম জেলায় অবস্থিত। এখানে মঙ্গইনাথেশ্বর মন্দির রয়েছে।

পিসাজিপদক (পিসাচিদ্রক) : এটি লুডারের তালিকায় ১১২৩এ রয়েছে। এটি পাহাড় (ত্রিরশ্মি), তিরানহু পাহাড়ের পশ্চিম ধারে।

পীথাপুরী : পূর্ব গোদাবরী জেলার পিটটাপুরম। পবিত্র স্থান। পৃথ্বি মহারাজের তান্দিবাদ দানপত্রে পিষ্টপুরা বা প্রাচীন পিথাপুরমের উল্লেখ রয়েছে। পিষ্টপুরার রাজা গুণবর্মণের সময় দেবরাষ্ট্রের এটি একটি অংশ ছিল। পিথাপুরম গোদাবরী জেলার একটি প্রাদেশিক শহর। এখানে কুন্তিমাধব বলে একটি বৈষ্ণব মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে একটি প্রস্তর স্তম্ভে চারটি বিভিন্ন মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে একটি প্রস্তর স্তম্ভে চারটি বিভিন্ন তারিখের লিপি রয়েছে। এখানকার রাজারা বেলনন্দু বংশের ছিল। বেলনন্দুরা শূদ্র সম্প্রদায় থেকে এসেছে। এদেরই এক পূর্বজ—নান মল্ল (প্রথম) গঙ্গ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, অন্ধ্র, পুলিন্দ ইত্যাদি রাজাদের নাকি পরাজিত করেছিলেন।

পিথুন্দা : খারবেলের হস্তিগুম্ফার লিপিতে কলিঙ্গ রাজাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পিথুডগা বা পিথুডা নামে একটি স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে এর উল্লেখ আছে। গন্ধব্যূহে উল্লিখিত পৃথুরাষ্ট্র টলেমির পিতুন্দ্রা টলেমি বলেছেন, পিতুন্দ্রা দুই নদীর মধ্যবর্তী মেইশেঠোলিয়ার ভেতরে অবস্থিত। নদী দুটি মাইসোলোস ও মানদস অর্থাৎ গোদাবরী ও মহানদীর ব-দ্বীপে।

পোদিয়িল : তিন্নেভেলী জেলার একটি পাহাড়। এখানে অগস্তের আশ্রম ছিল।

পোলিয়ূরনাড়ু : আরকোনম রেল জংশনের কাছে আধুনিক পোলুর গ্রাম।

পোন্নি : কাবেরী নদী।

পোন্নুটুরু : বিশাখাপতনম জেলার পাটপটানম তালুকে পারলকিমেডি স্টেটের সোমারাজপুরমের এক মাইল দূরে বংশধারা নদীর তীরে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে গঙ্গ সামন্তবর্মণের ৬৪ খ্রিষ্টাব্দের একগুচ্ছ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

পোত্তপি : কুড্ডাপাফা জেলার চেয়য়ুরু নদীর তীরে এটি অবস্থিত।

প্রস্রবণগিরি : আত্তরঙ্গাবাদের পাহাড়গুলি গোদাবরীর তীরে অবস্থিত ছিল। ভবভূতি তার উত্তররামচরিতে এই কথা লিখেছেন। হেমকোষ অনুযায়ী মলয়বানগিরিই প্রস্রবণগিরি—জনস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। বালির রাজধানীর পাশেই ছিল প্রস্রবণগিরি। এরই একটি গুহায় বালিকে নিহত করার পর রামচন্দ্র বিশ্রাম করেছিলেন। এই পাহাড়টিকে হাম্পির কাছে চেল্লরী জেলার কোথাও ছিল বলে মনে করতে হবে। কিন্তু ভবভূতির মতে এটি দুটি পৃথক পাহাড়।

প্রতিষ্ঠান : প্রতিষ্ঠান (আধুনিক পৈথান) অন্ধ্রপ্রদেশের আওরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। রাজা শতকর্ণী (সাতবাহন বা শালিবাহন) ও তাঁর পুত্র শক্তিকুমার যাদের রাজা শতকর্ণী এবং রাজকুমার শক্তিশ্রী বলে মনে করা হয়—নানাঘাট লিপি অনুযায়ী। পৈথান বা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বা সুপ্রতিষ্ঠাহার বা সুপ্রতিষ্ঠিত তদানিন্তন নিজাম রাজ্যের গোদাবরীর তীরের সেইস্থান যেখানে তৃতীয় গোবিন্দ—(শক ৭১৬)-এর তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। বাকাটক রানী প্রভাবতী গুপ্তার পুণা তাম্রশাসনে প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। অশোকের শিলাপিপি নং ৫ ও ১৩ তে উল্লিখিত পোটনিকরাই প্রতিষ্ঠানিক বা গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী। প্রতিষ্ঠান সাতবাহন রাজাদের আমলে এক সমৃদ্ধ নগরী ছিল। কেউ কেউ বলেন, এরা সাতবাহন শাসকদের পূর্বজ। পেলিপ্লাসের লেখকের মতে বরাগজা থেকে ২০ দিনের দূরত্বে পৈথান অবস্থিত ছিল। বরাগজা হচ্ছে আধুনিক ব্রোচ বা ভরুকচ্ছ। সাতবাহন উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা হন। তিনি দাক্ষিণাত্যে তাপ্তি পর্যন্ত অনেক রাজ্য জয় করেন। তিনি জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং গোদাবরীর তীরে মহালক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপন করেন। জৈন বিবিধতীর্থকল্প অনুসারে মহারাষ্ট্রের এই নগরটি কালের প্রবাহে সামান্য একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে।

পুড়ুপ্পাক্কম : উত্তর আর্কট জেলায় অবস্থিত।

পুগার : এটি তাঞ্জোর জেলার আধুনিক কাবেরীপাট্টিনম।

পুলিক্কুনরম : এটি নুগা নদীর পশ্চিমে একটি গ্রাম। এই গ্রামটি পেরুনজিগাই ঈশ্বরের মন্দিরকে দান করা হয়েছে।

পুলিনাড়ু : রাজরাজ (প্রথম)-এর ৩৬তম বছরের এক তথ্য থেকে জানা যায় যে এটি ত্যাগভরণবলনাড়ুতে অবস্থিত ছিল। পরবর্তী চোলরাজা বীরুররাজেন্দ্রর চতুর্থ বছরের তথ্য থেকে জানা যায় যে এটি জয়নগোন্ডসোলমণ্ডলমের পাড়ুভুরকোট্টম ছিল।

পুলিন্দরাজরাষ্ট্র ঃ মহারাজা হস্তিনের নবগ্রাম দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। তার থেকে এটি পরিস্কার থেকে পুলিন্দ অধিকর্তার রাজ্য ছিল নৃপতি পরিব্রাজক পরিবারের অধিকৃত অঞ্চলে। অশোকের ১৩ নং শিলালিপিতে বলা হয়েছে পুলিন্দরা এক করদ উপজাতি ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্রদের সঙ্গেই পুলিন্দদের নাম করা হয়েছে। পুরাণে তাদের শবরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—বিদর্ভ ও দন্ডকদের সঙ্গে এরাও দক্ষিণাপথের অধিবাসী। পুলিন্দদের রাজধানী পুলিন্দনগর জব্বলপুর জেলার ভিলসার কাছে ছিল। রূপনাথ নিশ্চয় পুলিন্দদের অধিকারে ছিল— সেখানে অশোকের একটি ছোট শিলালিপি পাওয়া গেছে।

পুল্লমঙ্গলম : তাঞ্জোরের কাছে পুল্লমনগাই গ্রাম।

পুণক (পুণ্য) : রাষ্ট্রকূট রাজা কৃষ্ণ (প্রথম)-এর দুটি দানপত্রের তাম্রশাসন অনুযায়ী পুণক বা পুণ্য-পুণার আদি নাম। ১৬ শতকে পুণা পুরানো নগর বলে পরিচিত ছিল এবং গোবিন্দদাসের কড়চা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্য তাঁর দলবল সমেত সেখানে গিয়েছিলেন।

পুরন্দর : পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এটি দক্ষিণের একটি নগর।

পুরী (পুরুষোত্তম ক্ষেত্র) : এটি উড়িষ্যার পুরী জেলায় অবস্থিত। ব্রহ্মপুরাণে বলেছে, এটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণ একে পুরুষোত্তম বলেছে। এখানে রয়েছে বিখ্যাত পুরুষোত্তম মূর্তি। পুরীর দুটি ভাগ রয়েছে। বালুখণ্ড—দুটি তীর্থের মাঝখানে : স্বর্গদ্বার ও পক্ষীতীর্থ। এটি জগন্নাথের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এটি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলেও পরিচিত।

পুরিকা ঃ এটি একটি নগরের নাম। মহাভারতের পুলিকা খিল হরিবংশের পুরিকা, এবং পুরাণের পাউলিশ, পাউরিকা ও সাউলিকা একই নাম। খিল হরিবংশে বিন্ধ্য পর্বতমালা ও মাহিষ্যতির মধ্যে ঋক্ষবন্ত পর্বত থেকে নির্গত একটি নদীর তীরে এটি অবস্থিত।

পুরুষোত্তমপুরী : রামচন্দ্রের পুরুষোত্তমপুরী তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, নগরটি ভীর জেলার গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

পুষ্করী : ওড়িশার কোরাপুট জেলার পোড়াগড় অঞ্চলে অবস্থিত।

পুষ্পগিরি : অন্ধ্রের কুড্ডাপার উত্তরে একটি গ্রাম। এখানে যাদব সিংহনের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

পুষ্পজাতি (পুষ্পজা বা পুষ্পবতী) : মলয় পর্বতে উৎপন্ন এই নদীটির উল্লেখ বায়ু পুরাণে রয়েছে।

রণডুভল্লী : প্রাপ্ত একটি লিপি থেকে জানা যায় এটি গুদ্রাহারবিষয়ে অবস্থিত একটি গ্রাম যা এক ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছিল।

রত্নগিরি : এটি এশিয়া পর্বতমালার একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়। গোপালপুরের ৪ মাইল উত্তরপূর্বে কেলুয়া বলে একটি নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি বিরুপার শাখা। পাহাড়ের

মাথাটি সমতল। এখানে একটি বড় স্তূপ রয়েছে।

রট্টপাডিকোণ্ডা : সোলমণ্ডলম—চিত্তুর জেলার পুনগানুরের চতুর্দিকে এবং পার্শ্ববর্তী মহীশূরের চিন্তামণি তালুক নিয়ে ছিল এই অঞ্চল।

রাগোলু : শ্রীকাকুলাম জেলায় অবস্থিত।

রাজগম্ভীর পাহাড় : এটিকে রাজগম্ভীরন-মালাইও বলা হয়।

রাজরাজমণ্ডলম : এটি পাণ্ড্যদেশের এক অংশ এবং কেরালা দেশ (মাদুরা ও ত্রিবাংকুরের অংশ) নিয়ে গঠিত ছিল।

রাকলুভ : গঞ্জাম জেলার শ্রীকাকুলের রাগোলু গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়। এখানে শক্তিবর্মনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল।

রামনাথপুরম : এটি ভিন্দিগল রেলস্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে পাণ্ড্যদের লিপি পাওয়া গেছে।

রামপারকটি : যোশীপুর পরগণার কিয়াপিরের রামসাহী গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

রামতীর্থ : বিশাখাপত্তনম জেলার একটি গ্রাম। এখানে বিষ্ণুবর্ধন মহারাজের একটি লিপি গুহাগাত্রে খোদিত আছে।

রামেশ্বরম : বঙ্গোপসাগরে এটি একটি পবিত্র দ্বীপ। রামনাথ স্বামীর বিখ্যাত মন্দির এখানে রয়েছে। কথিত আছে লংকা অভিযান করার সময় রামচন্দ্র এটি নির্মাণ করেন। বিশাল মন্দিরে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ, অন্নপূর্ণা, পার্বতী এবং হনুমানের মূর্তি।

রানী খরিয়াল : ওড়িশার তদানিন্তন পাটনা স্টেটের টিটলাগড়ের ২৬ মাইল পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত।

রাষ্ট্রকূট অঞ্চল : অষ্টম শতকে আওরঙ্গবাদ জেলা, নাসিক ও খান্দেশের অংশ নিয়ে এটি গঠিত ছিল।

রেনানডু : পেন্নারের দুটি উপনদী চিত্রাবতী ও চিয়য়েরু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত। কুড্ডাপহ, কোলার ও চিত্তুরজেলার অধিকাংশ অঞ্চলও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রেইয়ুরু : এই গ্রামটি মেলমুণ্ডা রাষ্ট্রতে অবস্থিত ছিল। কোভরু তালুকের বেশির ভাগ, এবং পার্শ্ববতী নেলোর জেলার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ নিয়ে মুণ্ডারাষ্ট্র গঠিত ছিল।

রোহণা : এটি সিংহলের আদমের শৃঙ্গ।

রোহানাকি : হস্তিবর্মণের নরসিংপল্লীর তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে।

ঋষ্যমুখ : তুঙ্গভদ্রার তীরে অনাগন্ডির আটমাইল দূরে এই পর্বতটি। পম্পা নদী এই পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে তুঙ্গভদ্রায় পড়ছে। এখানেই প্রথম রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীব আর হনুমানের সাক্ষাৎ হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঋষ্যমুখ পর্বতের উল্লেখ রয়েছে। পারজিটারের মতে আমেদনগর থেকে নলদুর্গ ও কল্যাণী পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত শ্রেণি যা মঞ্জিরা ও ভীমা নদীকে বিভক্ত করেছে—সেটিই ঋষ্যমুখ পর্বতমালা। এরই একটি গুহায় বালির ভয়ে সুগ্রীব লুকিয়ে ছিল।

রুদ্রগয়া : পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এটি দক্ষিণাপথের কোলাপুর।

সগর : এখানে চোড়রাজ অন্নদেব কর্নাট সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন।

সহ্যাদ্রি : প্রাচীনকালে পশ্চিমঘাট সহ্যাদ্রি বলে পরিচিত ছিল। এটি দাক্ষিণাত্যের

পশ্চিম সীমা নির্দ্ধারণ করে কুন্দাইবারি গিরিপথ (খান্দেশ জেলায়) থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রায় ১০০০ মাইল নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে গেছে। রঘু মলয় ও দর্দুর মধ্যবর্তী পালঘাটের ফাঁক দিয়ে সহ্যাদ্রি পার হয়েছিলেন। পশ্চিমঘাট অনেক স্থানীয় নামেও পরিচিত। এর সঙ্গে ত্রিকুট, ঋষ্যমুখ ও গোমন্ত ইত্যাদি কয়েকটি ছোট পাহাড়ও যুক্ত।

সাইয়ম : এটি সহ্যাদ্রির তামিল নাম এবং পশ্চিমঘাটের সংস্কৃত নাম।

সালেম : এটি দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ জেলা। এখানে রাজরাজের ২৬তম বছরের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

সমালিপাড : গোদাবরী অঞ্চলে গোবর্ধন জেলার পূর্বদিকের রাস্তার একটি গ্রাম।

সঙ্গলুড (সঙ্গলাড) : মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলা।

সঙ্গুকোট্টম : সমুদ্রতীরের একটি দেশের নাম।

সঙ্গুর : কানারা জেলার হাবেরী তালুকের আটমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সিরসি যাবার পথে একটি গ্রাম যা সঙ্গভুরু, কংগুরা, কংগাপুর ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এখানে বীরভদ্রের মন্দিরের সামনে নন্দীস্তম্ভের গায়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ করা আছে।

সনকনীপল্লী : এটি কৃষ্ণা জেলার আধুনিক সংকর্ষণপুর।

সংকরম : বিশাখাপত্তনম জেলার অনকাপল্লীর কাছে। ১৯০৭-০৮ এ এখানে প্রচুর প্রত্নতত্ত্ব বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।

শরপত্রক : করঞ্জিয়া পরগণার সারদহ গ্রামটিই—আধুনিক শরপত্রক।

সরস্বতী : একটি নদীর নাম।

সরেফা : ভানুদত্তের বালাশোর তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। ওড়িশার বালেশ্বর জেলার সোরোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সতিয়পুত্র (সত্যপুত্র) : অশোকের শিলালিপি নং ২ ও ১৩তে এর উল্লেখ আছে। এটি চোড় ও পাণ্ড্যদের রাজ্যের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কেউ বলেন, এটি কাঞ্চীপুরের সত্যব্রত ক্ষেত্র। আয়েঙ্গার ও ভাণ্ডারকার বলেন, সত্যপুত্র একটি নাম সমষ্টি—মালাবারের নানান মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীর। যেমন তুলু, নায়ার ইত্যাদিদের নাম নিয়ে এটি গঠিত। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, এটি কোয়েম্বাটুর জেলার সত্যমঙ্গলম তালুক যেটি পশ্চিমঘাট বরাবর ছিল এবং পাশে ছিল মহীশূর, মালাবার, কোয়েম্বার ও কুর্গ। আবার কারোর মতে, সত্যপুত্রই হচ্ছে কেরালোলপত্তির সত্যভূমি অর্থাৎ একটি অঞ্চল যা উত্তর মালাবারের সমান, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল দক্ষিণ কানারার কাসেরগোডে তালুকের কিছু অংশ। বার্নেট ও জয়সওয়ালের মতে, সাতবাহন ও সাতকর্ণী নামের উদ্ভব সতিয়পুত্র থেকেই।

সত্তেনপল্লী : এটি গুন্টুর জেলায় অবস্থিত। এখানে চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

সত্যমঙ্গলম : এটি ভেলোর তালুকে অবস্থিত। এখানে দেবরায় (দ্বিতীয়) এর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

শবর দেশ : এটি দাক্ষিণাত্যেব কোথাও হবে। মহাভারত বলেছে এটি দাক্ষিণাত্যে। টলেমি শবরাই বলে একটি দেশের কথা বলেছেন—সম্ভবত সেখানকার অধিবাসীরা ছিল শবর। কানিংহাম টলেমির সবরাইকে প্লিনির সুয়ারি বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে

দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত শবর দেশ প্রসারিত ছিল।

শবরী আশ্রম : পূর্বে একটি ঋষি মাতংগ ও তাঁর শিষ্যদের ছিল। রামলক্ষণ এখানে এলে শবরী তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। আশ্রমের ঐতিহ্য মতো সে তার জটাময় চুল, সামান্য বস্ত্র এবং কৃষ্ণ হরিণের চামড়া উড়নী হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

সাদুলে : এটি সাদোলা।

সাক্ষীগোপাল : পুরীর কাছাকাছি একটি গ্রাম। কথিত আছে কৃষ্ণ এখানে পাথর হয়ে আছেন। সাক্ষীগোপালের মন্দিরের জন্য স্থানটি বিখ্যাত।

সালাইগ্রাম : তামিলনাড়ুব রামনাদ পুরম জেলার পরমাগুডি তালুকে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে ১০ম শতকের দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

সান্তাবোম্মাল্লী : এটি গঞ্জাম জেলার একটি গ্রাম। এখানে কয়েকটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে।

সারড্ডা : কোমাণ্ডের ১০ মাইল পূর্বে আরাদা নামে স্থানটি চিহ্নিত।

শাসনকোটা : অনন্তপুর জেলার হিন্দুপুর তালুকে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে গঙ্গ মাধববর্মণের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কিছু প্রত্নবস্তুও আবিষ্কৃত হয়েছে।

শেমবগপেরুমলনাল্লুর : এটি আধুনিক সুমাঙ্গীনেল্লুর।

শেনদামঙ্গলম : একই নামেব একটি গ্রাম যেখানে মানবলপেরুম্মলের লিপি পাওয়া গেছে। এটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়।

শেনগ্রাম : এটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়।

সেতপাদু : গুন্টুর জেলায় অবস্থিত।

সিদ্ধেশ্বর : গ্রামটি কটক জেলায় বৈতরণীর তীরে জাজপুরের (প্রাচীন বিরজা ক্ষেত্র) কাছে অবস্থিত। দেবতা সিদ্ধেশ্বরের নামে এই নাম।

সীমাচলম : বিশাখাপতনম থেকে ৯ মাইল দূরে পাহাড়ের মাথায় বরাহ নরসিংহ স্বামীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

সিরিপুরম : শ্রীকাকুলের কাছে একটা গ্রাম। এখানে কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মণের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

সিংহপুর : চন্দ্রবর্মণের কোমারতি তাম্রশাসন ও উমাবর্মণের বৃহৎপ্রস্থ দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীকাকুল ও নরসন্নপেটার মধ্যবর্তী সিংহপুরমকে চিহ্নিত করা হয়েছে সিংহপুর। তামিল প্রাচীন সাহিত্য সিলপ্পধিকরম এবং মণিমেখলাই একে অরিপুর—বা কল্লিঙ্গের দুটির মধ্যে একটি রাজধানী বলে উল্লেখ করেছে। কাণ্ডি জেলার দক্ষিণ সীমায় উত্তর কলিঙ্গের মধ্যে স্থানটিকে নির্ণয় করা হয়েছে।

সিরিটন : মনে হয় এটি প্রাকৃত শ্রীস্তান বা শ্রীস্থান। কৃষ্ণার তীরে বিখ্যাত শ্রীশৈলই হচ্ছে সিরিটন।

সিরুমবক্কম : উত্তর আর্কট জেলার তিরুবাল্লুর তালুকের একটি গ্রাম। এখানে পরমেশ্বর বর্মণের লিপি পাওয়া গেছে।

সিরিয়াড্ডুর : উত্তর আর্কট জেলার ওয়ালাজাপেট তালুকের সিত্তাত্তুরকে চিহ্নিত

করা হয়েছে।

সিরুকদম্বুর : একটি গ্রামের নাম।

শিশুপালগড় : ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কাছে অবস্থিত। এটি মধ্যযুগের মন্দির এবং একটি বর্গাকার দুর্গের জন্য প্রসিদ্ধ। ভুবনেশ্বরের ১১/২ মাইল দূরে শিশুপালগড়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, বহু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজা ধর্মদামাধবের কুষাণ-রোমীয়দের মতো দেখতে ২০০ খ্রিষ্টাব্দের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।

সিবনবায়ল : উত্তর আর্কট জেলার একটি গ্রাম।

সিবিন্দিরাম : কন্যাকুমারীর কাছে বর্তমান শুচিন্দ্রমের প্রাচীন নাম।

সোলাপুরম : ভেলোরের আট মাইল দক্ষিণের একটি গ্রাম। এখানে কয়েকটি লিপি পাওয়া গেছে।

সোমলাপুর : কর্ণাটকের এটি বেলারী জেলায় অবস্থিত। কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

শোরাই : এটি উরত্তির কাছে একটি গ্রাম।

শোরাইক্কাভুর : এটি তাঞ্জাভুর জেলায় অবস্থিত। এখানে ১০৮ শকের বিরুপাক্ষের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

শোরাপুরম : বেলুরের কাছে একটি গ্রাম।

সোরেমটি : মদনপল্লীর লাগোয়া নোলাম্ব অঞ্চলে এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শ্রাবণ-বেলগোলা : এটি কর্ণাটকের হাসান জেলার চন্নরায়পত্ন তালুকের দুটি পাহাড় চন্দ্রবেত্তা ও ইন্দ্রবেত্তার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে প্রভাচন্দ্রের লিপি পাওয়া গেছে। চন্দ্রবেত্তা পাহাড়ের মাথায় জৈন দেবতা গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তি রয়েছে। এটি একটি প্রাচীন জৈন শিক্ষা কেন্দ্র। ভদ্রবাহু এখানে এসেছিলেন। কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জেনধর্ম গ্রহণ করে এখানে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীক্ষেত্র : উড়িষ্যার পুরী। জগন্নাথের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য এখানে এসেছিলেন।

শ্রীমধুরান্তকচর্তুবেদিমঙ্গলম : জয়নগোন্ডাসোরমঙ্গলমের জেলা কাডাত্তুরকোট্টমের একটি স্বাধীন গ্রাম।

শ্রীমল্লীনাথচতুর্বেদিমঙ্গলম : উত্তর আর্কট জেলার একটি গ্রামের নাম।

শ্রীপর্বত : মার্কন্ডেয়, কূর্ম, অগ্নি এবং সৌরপুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। এটিকে শ্রীশৈলও বলা হয়। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী এই পাহাড়ের শিখরে বাস করেন দেবতা মল্লিকার্জুন। কুর্নুল জেলার কৃষ্ণার দিকে পাহাড়টি ঝুঁকে রয়েছে। নাসিক প্রশস্তির সিরিটনকে চিহ্নিত করা হয়। এইস্থানে রয়েছে মল্লিকার্জুনের বিখ্যাত মন্দির। অগ্নিপুরাণ বলেছে এটি কাবেরী নদীর তীরে। বাণের হর্ষচরিতে শ্রীপর্বতের উল্লেখ রয়েছে এবং তা তেলেঙ্গানার একটি পর্বত। অবস্থান সম্পর্কে বলতে হলে বলা যায় যে কৃষ্ণার দক্ষিণতীরে ঋষভগিরির ওপর রয়েছে এই বিখ্যাত মন্দিরটি।

শ্রীপুর : এটি আধুনিক সিরপুর—মুখলিঙ্গমের উত্তরপশ্চিমে বংশধারা নদীর বাম তীরে—গঞ্জাম জেলায়। পান্ড্যেরা শ্রীপুর থেকে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে কোশলের ওপর

রাজত্ব করেছে। এখন এটি বিশাখাপত্তনম জেলায় অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গম : তিরুচিরাপল্লীর কাছে একটি দ্বীপ। এখানে রয়েছে বিখ্যাত রঙ্গনাথের মন্দির। এখানে রামানুজ ও মনভাড় মহামুনি কিছু সময়ের জন্য বসবাস করেছিলেন। গরুড়বাহনভট্টের ১৪১৫ শকাব্দের শ্রীরঙ্গম লিপি থেকে জানা যায়, শ্রীনিবাস একখন্ড ভূমিদান করেচিলেন। মন্দিরটি দ্বীপের মধ্যস্থলে। নির্মাণ করেছিলেন পাড্যদের নায়ক শাসকেরা। মৎস্য, পদ্ম, ব্রহ্মান্ড, পদ্ম, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য এটিকে একটি বড় তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করেছে। রামানুজ এখানে ১১ শতকে মারা যান। লংকা যাবার পথে রামচন্দ্রও নাকি এখানে বসবাস করেছিলেন। বিশাল এই প্রাচীন মন্দিরটিকে চোল-পান্ড্য ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজারা সংস্কার করেছিলেন। শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে রয়েছে হরিহর রায়ের তাম্রশাসন। এখানে চোল কুলোতুঙ্গার একটি লিপি রয়েছে।

শ্রঙ্গবরপুকোট : এটি বিশাখাপত্তনমের একটি গ্রাম। এখানে কলিঙ্গের রাজা অনদুতবর্মণের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

সুদসুণ (সুদিসম) : গোদাবরী জেলার গোবর্দ্ধনের কাছে এই গ্রামটি অবস্থিত ছিল।

সুদব : গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ধর্মলিঙ্গেশ্বর মন্দিরের কাছে খননের সময় দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

সুদাডুপারাই-মালাই : একটি পর্বতের নাম। এটি বভাজি পাহাড়ের পূর্ব নাম।

সুপ্রযোগ : মহাভারতে উল্লিখিত নদী। এটি কৃষ্ণার এক পশ্চিমী উপনদী।

সুরানকুডি : এটি তামিলনাডুর তিরুনেলভেলি জেলার একটি গ্রাম।

সুরভরম : এখানে চোড়রাজ অন্নদেব রাজা অন্নভোতাকে পরাজিত করেন।

সুরুলিমালাই : এটি একটি পাহাড়েব নাম। এটি সুরুড়িয়ারু নদীর উৎস।

শুরুড়িয়ারু : একটি নদীর নাম।

সুবর্ণগিরি : অশোকের ছোট শিলালিপিতে—এক উল্লিখিত সুবর্ণগিরির খোঁজ সম্পর্কে পরবর্তী কোংকন ও খান্দেশের মৌর্য শিলালিপির কিছু সাহায্য পাই। হালজ অন্ধ্রপ্রদেশের কণকগিরিকে চিহ্নিত করেন। বুলহার পশ্চিঘাটের কোথাও এর খোঁজ করতে চান। কৃষ্ণ শাস্ত্রী এটিকে মহীশূরের সিদ্দাপুরের পশ্চিমে মাস্কি বলে চিহ্নিত করতে চান। এটি খুব সম্ভবত থানা জেলা ও খান্দেশের ওয়াংলির উত্তরে বাদ-র আশপাশে ছিল— যেহেতু পরবর্তী মৌর্যলিপি কোংকন ও খান্দেশে পাওয়া গেছে। প্রাদেশিক হিসাবে এক রাজকুমারকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি হয় অশোকের কোন ভাই বা পুত্র হবেন।

সুবর্ণমুখারী : স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী এটি একটি বিখ্যাত নদী। হস্তিশৈল পর্বতের উত্তরে এর উৎস।

সুবর্ণপুরা : এটি তেল ও মহানদীর সংগমে আধুনিক সোমপুর।

শ্বেতক : ভারতীয় যাদুঘরে রাখা গঙ্গ ইন্দ্র বর্মণের তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। জয়বর্মদেবের গঞ্জাম দানপত্র শ্বেতক থেকেই প্রচারিত হয়েছিল। গঞ্জাম জেলার সোমপেটা তালুকের আধুনিক চিকটিকে চিহ্নিত করা যায়। মনে হয় এটি উত্তর গঞ্জামে অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ বলেন পশ্চিমে কলিঙ্গের লাগোয়া কোন স্থান ছিল শ্বেতক।

তাদপত্রী : পেন্নার নদীর তীরে অনন্তপুর জেলায় এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে প্রাচীন

শ্রীবল্লু রামলিঙ্গ ঈশ্বরের মন্দির আছে।

তগর : হায়দ্রাবাদ জেলার ১২ মাইল উত্তরে আধুনিক ওসমানাবাদের টারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফ্লিট বলেছেন, পৈথানের ৯৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে টারের অবস্থিতি। আবার কেউ বলেছেন, এটি দেবগিরি, কেউ জুন্নর এবং ভান্ডারকার হায়দ্রাবাদের ধারুরকে চিহ্নিত করেছেন। টলেমি এটিকে বৈথান ও পৈথানের উত্তরপূর্বে এবং পেরিপ্লাস এগুলির থেকে ১০ দিনের দূরত্বে একটি স্থান নির্দিষ্ট করেছেন। ইয়ুল পৈথানের দক্ষিণপূর্বে ১৫০ মাইল দূরে কুলবর্গাকে চিহ্নিত করেছেন। আবার ডাফ গোদাবরী উপকূলে ভীরকে চিহ্নিত করেছেন। পেরিপ্লাস বলেছিলেন, এটি একটি বিশাল নগর। রাহাচার্য নগরটি পরিদর্শন করেছিলেন। মনে করা যেতে পারে শিলাহরদের দেশ ছিল তাগরা।

তক্কনলাদম : এটি দক্ষিণী লাট (গুজরাট)। এটি গন্ডদেশের দক্ষিণী লাট। প্রাচীন চিংলেপুট জেলার আরপক্কম গ্রামটি উমাপতিদেব বা জ্ঞানশিবদেবকে দান করা হয়েছিল। দাতা জনৈক এদিরিলিশোড় সম্বুভেরায়ন।

তক্কোলম : উত্তর আর্কট জেলার আরকোনাম তালুকের তক্কড়ম গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে পরান্তক (প্রথম)-এর তক্কোড়ম লিপিতে। এটি টোনডাইনাড়ুতে অবস্থিত ছিল। এখানে চোল শৈলীর একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরের দেবতাকে প্রাচীনকালে তিরুবুরাল-মহাদেব বলা হোত।

তল্লাপাক্কম : এটি চেয়েয়ুরুর দক্ষিণে এবং আত্তিরালের পশ্চিমে অবস্থিত।

তাল্লারু : কোপ্পারুনজিনগদেবের ভেলুর লিপিতে তাড্ডারুর উল্লেখ রয়েছে। এটি উত্তর আর্কট জেলার একই নামের গ্রামটিকে চিহ্নিত করা যায়।

তাম্বপন্নি (তাম্রপর্ণী) : মারবর্মণ সুন্দব (দ্বিতীয়) পান্ড্যের তিন্নেভেলী লিপিতে তামপোরুন্ডা আরু-র উল্লেখ রয়েছে। এটি সাধারণত তাম্রপর্ণীকেই বলা হয় এবং তাম্রপর্ণী নামটি হচ্ছে সিংহলের। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একে পারসমুদ্র বলা হয়েছে। গ্রীক লেখকরা বলেছেন, তাপ্রোবেন। এটি অশোকের ২নং ও ১৩নং শিলালিপিতে উল্লিখিত। রঘুবংশে এর উল্লেখ আছে। বলরাম এইদেশ পরিদর্শন করেছিলেন। ভি. স্মিথ বলেন, তাম্রপর্ণী মানে সিংহল নয়, তিন্নেভেলী জেলার তাম্রপর্ণী নদী। ভাগবতপুরাণ একে নদী বলেছে। নদীটি নিশ্চয় পান্ড্যদেশের দক্ষিণ সীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হোত এবং তার আধুনিক নাম তাম্বরভরী। রঘুবংশ অনুসারে স্থানীয়ভাবে তাম্রপর্ণীকে তাম্বরভরী বলত। মুক্তার চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বৃহৎসংহিতা বলেছে তাম্রপর্ণীতে মুক্তা পাওয়া যেত, মহাভারতও বলেছে, এটি একটি পবিত্র নদী। শিলালিপি নং ১৩ তে বলা হয়েছে তাম্রপর্ণীর অধিবাসীদের তাম্বপংনিয়া অর্থাৎ তাম্রপর্ণা বলা হোত। শিলালিপি ১৩তে তাম্রপর্ণী বা তাম্রপর্ণাদের দেশকে পান্ড্যদেশের নীচে দেখান হয়েছে। মহাকাব্যেও তাম্রপর্ণীকে পান্ড্য বা দ্রাবিড়ের নীচে দেখান হয়েছে এবং বৈদুর্যপাহাড়কে এর এক শিলাময় অঞ্চল বলে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। অগস্ত্যের আশ্রম ও গোকর্ণতীর্থ এরই মধ্যে অবস্থিত। এ সমস্ত তথ্য আমাদের তাম্রপর্ণী ক হিউয়েন সাঙ উল্লিখিত পর্বত পোটলক (বৈদূর্যক) এর সঙ্গে দ্রাবিড়ের নীচে মলয়কূটকে চিনতে সাহায্য করেন। কিন্তু তাম্রপর্ণী বা তাপ্রোচেন দ্বারা সিংহলকেই বোঝান হয়েছে। কারণ, দ্বীপ শব্দটি এর সঙ্গে জড়িত। নাগার্জুন কোন্ডার

একটি লিপিতে তাম্বপংনকে পরিষ্কারভাবে দ্বীপ তাম্বপন্নী থেকে পৃথক করে দেখান হয়েছে।

তনসুলি বা তনসুলিয় : কলিঙ্গরাজ্যের অদূরেই ছিল। এখানে থেকে মহারাজনন্দ একটি খাল উন্মোচন করেন। খালটি কলিঙ্গনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তনডানতোট্টম : কুম্ভকোনমের কাছে একটি গ্রাম।

তঙ্গাটুরু : কুড্ডাপা জেলার প্রোড্ডুঙ৺ তালুকের একটি গ্রাম।

তাঞ্জোর (তাঞ্জই) : এটি একটি গ্রামের নাম। তাঞ্জোর মন্দিরে রয়েছে চন্দ্রেশ্বরের মূর্তি। এটি চোল রাজাদের এবং মারাঠা রাজা নায়কদের রাজধানী ছিল। তাঞ্জোর ব্রহদিশ্বরের মন্দিরেব জন্য বিখ্যাত। এটি ভারতে সর্বোচ্চ মন্দির, রাজরাজেশ্বর ও বৃহদিশ্বরের মন্দির মহান রাজরাজা (৯৮৫-১০১৪ খৃঃ) নির্মাণ করেন। বৃহদিশ্বরের মন্দিরে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ রয়েছে। এটি ২১৭ ফুট উঁচু এবং ভারতীয় স্থাপত্যের এক অনুপম নির্দশন। পাথরের তৈরি বিশাল যাঁড়রূপী নন্দী মন্দিরের সামনে বসে আছে।

তংকন (তংগন) : বৃহৎসংহিতায় এটিকে একটি দেশ বলা হয়েছে।

তনপোরুন্ড-আরু : মারবর্মণ সুন্দর পান্ড্য (দ্বিতীয়)র তিন্নেভেলীলিপিতে তাম্রপর্ণী নদীর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

তরডংশকভোগ : মহাশিবগুপ্তের মেল্লার তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। তলহারিমন্ডলকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তালগুন্ডা : কর্ণাটকের সিমোগা জেলার শিকারপুর তালুকে অবস্থিত। এখানে ককুৎস্থবর্মণের একটি স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

তালপুরংশক : এটি প্রাচীন নাগপুরানন্দীবর্ধন জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। একজন ব্রাহ্মণকে এই গ্রাম দান করা হয়েছিল। দান করেছিলেন কৃষ্ণ (তৃতীয়) বা অকালবর্ষ। ইনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট পরিবারের ভাই জত্তুঙ্গা কৃষ্ণ (দ্বিতীয়)-এর নামে এই দানপত্র করেন। অকালবর্ষ গুর্জরদের ভীত সন্ত্রস্ত করেন। লাটদের গর্ব খর্ব করেন। গৌড়দের অপমানিত করেন। তাঁর নেতৃত্ব অঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় এবং মগধ স্বীকার করে নিয়েছিল।

তালখের : প্রাচীন ক্রোষ্টুকবর্তনী জেলার একটি গ্রাম। গঙ্গ রাজত্বে মহারাজধিরাজ দেবেন্দ্রবর্মণের পুত্র মহারাজ অনন্তবর্মণ বিষ্ণুসোমাচার্য নামে এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে এই গ্রাম দান করেন। সুড়ব থেকে প্রাপ্ত পূর্ব গঙ্গ তাম্রশাসনে এটি উল্লেখ করা রয়েছে।

তামর : আধুনিক ধামল নামে একটি গ্রাম। চিংলেপুট জেলার নিত্যবিনোদানাল্লুর নামেও গ্রামটি পরিচিত।

তামরচেরু : পূর্বতন গঙ্গ দানপত্রে বলা হয়েছে, গ্রামটি বরাহবর্ত্তিনীতে।

তাডিকোন্ডা : এটি আধুনিক গ্রাম তাডিগোন্ডা বা টাডিকোন্ডা—গুন্টুর জেলার গুন্টুর তালুকে অবস্থিত। এই গ্রামের সীমার মধ্যে চৈত্তটাক এবং ভীমসমুদ্র নামে দুটি জলাশয় আজও বিদ্যমান। ভীম সমুদ্র এক বিশাল দীঘি—এর পাড়ে শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। চৈত্তটাক ৩/৪ বর্গমাইলের এক বিশাল দীঘি—আশপাশ অঞ্চলের জলসেচনের এটিই মাধ্যম।

তাডিবাদ : বঙ্গিপারুর এক ব্রাহ্মণকে কোনুরুনান্দুবিষয়-এর একটি গ্রাম দান করা হয়। কৃষ্ণা জেলার তনুকু তালুকের তাদিপরুকেও চিহ্নিত করা চলে।

তেক্কালি : এখানে কোনগোডার শৈলোদভব-এর তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এটি গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। দেবেন্দ্রবর্মণের পুত্র রাজেন্দ্রবর্মণেরও কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

তেলবাহ : এটি জাতক বর্ণিত নদী। এর তীরে ছিল গন্ধপুর। সেরিব রাজ্য থেকে বণিকেরা এই নদী পার হয়ে এখানে আসত। কেউ কেউ আবার আধুনিক তেল বা তেলিংগিরিকেও সনাক্ত করেন।

তিরচ্চেনদুর : এটি তিন্নেভেলী জেলায় অবস্থিত। এখানে বরগুনমহারাজা (দ্বিতীয়) -এর লিপি পাওয়া গেছে।

তিরুক্কলুক্কুনরম : এটি প্রাচীন চিংলেপুট জেলার একটি বড় গ্রাম। এখানে চারটি তামিলভাষার লিপি পাওয়া গেছে। এটি পক্ষীতীর্থম বলেও সুপরিচিত।

তিরুক্কোডুনকুনরম : কৃষ্ণদেবরায়ের পিরানমালাই লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি তিরুমালাইনাডুতে অবস্থিত। শিবগুপ্ত তালুকের আধুনিক গ্রাম তিরুমালাইয়ের অনুসরণে এর নামকরণ করা হয়েছে।

তিরুক্কুডমুক্কিল : কুম্ভকোনমের তামিল নাম। এটি তাঞ্জাভুর জেলায়। এটি একদা চোল রাজাধানী ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কুম্ভকোনমের শিবমন্দির বিখ্যাত।

তিরুমালাই পাহাড় : এটি একটি পাহাড়ের নাম। তামিলনাড়ুর উঃ আর্কট জেলায় অবস্থিত। এটি অরহসুগিরি এবং এনগুনভিরাই-তিরুমালাই নামেও পরিচিত।

তিরুমালাই গ্রাম : একটি গ্রামের নাম। এটি চালুক্যদের দেশের চেয়ে পল্লবদের দেশের বেশি কাছে। গ্রামটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এটি বৈষ্ণব কেন্দ্র। দেবতা ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির আছে পাহাড়ের মাথায়। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ এর পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে।

তিরুমালে : কেলাডি সদাশিব নায়কের কাপ তাম্রশাসনে তিরুমালের উল্লেখ রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলার তিরুপতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিরুমালাই-শাই : এটি পুনামল্লের কাছে অবস্থিত।

তিরুমানিকুলি : নদী গেডিলমের তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এটি উদবি তিরু মানিকুলি নামেও পরিচিত। কথিত আছে প্রাচীন চোলরাজ সেনগান্নন এখানে শিবপূজা করেছিলেন। তিরুমানিকুলির একটি অংশ পেরমবলমপোনমেয়ন্ডা-পেরুমলনাল্লুর গঠিত করেছিল।

তিরুমুড়ুকুনরম (প্রাচীন পবিত্র পাহাড়) : সম্ভবত এর সংস্কৃত নাম ভদ্রাচলম, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার সদর দপ্তর।

তিরুনামনাল্লুর : দক্ষিণ আর্কট জেলার তিরুক্কোভালুর তালুকে অবস্থিত। পূর্বে এটি তিনাভালুর নামে পরিচিত ছিল।

তিরুপতি : তিরুপতি বা ত্রিপতি বা ত্রিপাডি উত্তর আর্কট জেলায় অবস্থিত। সাতটি পাহাড়গুচ্ছের মাথায় তিরুপতি মন্দিরটি রয়েছে। সাতটি পাহাড় সাতটি সর্পের প্রতিরূপ যাদের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ভেংকটচলপতি দাঁড়িয়ে আছেন। সর্পদেহের মধ্যভাগ নরসিংহের। এর লেজটি মল্লিকার্জ্জুনের বাসভূমি। শুরু, মধ্যভাগ ও শেষভাগে অধিষ্ঠান

করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

তিরুপ্পুবনম : জটাবর্মণ কুলশেখর (প্রথম)-এর তিরুপ্পুবনম তাম্রশাসনে রামনাথপুরম জেলার এই গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বৈগাই (সং-বেগবতী) নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

তিরুসুলম : এটি একটি গ্রাম। এখানকার শিবমন্দির চোলদের সমসাময়িক। একটি ১১ শতকের লিপি এখানে পাওয়া গেছে।

তিরুবদত্তুরাই : এটি দক্ষিণ আর্কট জেলায়।

তিরুবাদী : কুড্ডালোর জেলায় অবস্থিত। গোড়িলং নদীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত।

তিরুবল্লম : উত্তর আর্কট জেলার একটি গ্রাম। এখানে অনেকগুলি চোললিপি ও বিশ্বনাথেশ্বরের মন্দির আছে।

তিরুভয়িন্দিরপুরম : এটি কুড্ডালোর জেলার আধুনিক তিরুভেন্দিপুরম।

তিরুভেন্দিপুরম : কুড্ডালোর জেলার একটি গ্রাম।

তিরুভোড়িড়য়ুর : রাজরাজ (তৃতীয়) এর সমসাময়িক বিজয়গন্ডগোপালের তৃতীয় বছরের একটি লিপি পাওয়া গেছে। লিপিটিতে কিতারওরাইয়াম নামে জনৈক ব্যক্তির এক শিবমন্দিরকে একখন্ড ভূমিদান করার কথা রয়েছে।

তিরুবদিকুন্দ্রম : উত্তর আর্কট জেলার জিংগুতালুকে একই নামে একটি গ্রাম।

তোন্ডামন্ডলম : কাঞ্চিও বেঙ্গদম (তিরুপতি) এর মধ্যে যুক্ত রয়েছে।

তোন্ডি : মাদুরা জেলার একটি বন্দর।

তোন্টাপর : শ্রীকাকুল তালুকে আধুনিক তোটাডা গ্রাম।

তোসালি : অশোকের শিলালিপি নং ১-এ এর উল্লেখ রয়েছে। নাগার্জুন কোন্ডার বীরপুরুষ দত্তের লিপিতেও এর উল্লেখ রয়েছে। এটি টলেমির তোসালেই। তোসালি পুরী জেলার ধাউলি। অশোকের সময় একজন প্রাদেশিক এখানে থাকতেন। কটকের কাছে পাওয়া দুটি তাম্রশাসনে দেখা যায় উত্তর তোসল ও দক্ষিণ তোসলের নাম রয়েছে। নেউলপুর দানপত্রে উত্তর তোসলের একটি গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গ্রামটিকে ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় চিহ্নিত করা হয়েছে। বালেশ্বর জেলার সোরোতে পাওয়া তাম্রশাসনে উত্তর তোসলে সেরাফার লাগোয়া একটি গ্রামে একখন্ড ভূমিদানের উল্লেখ রয়েছে। উত্তর তোসল ওড্রবিষয়ের একটি অংশমাত্র।

ত্রিভুবনম : এটি তাঞ্জাভুর জেলার তিরুভিডাইমারুদুর রেল স্টেশনের কাছে ত্রিভুবন অবস্থিত। এখানে কুলোত্তুঙ্গা (তৃতীয়)র একটি সংস্কৃত লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিতে চিদাম্বরমের এবং নটরাজ মন্দিরে সামনে মুখমন্ডপ নির্মাণের তথ্য রয়েছে। লিপিটিতে কাঞ্চিপুরমের একামেশ্বর, মাদুরার সুন্দরেশ্বর, মধ্যার্জুন মন্দির এবং রাজরাজেশ্বর মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। এতে বাল্মিকেশ্বর মন্দিরের একটি মন্ডপ ও গোপুর নির্মাণের কথাও রয়েছে।

ত্রিকলিঙ্গ : গঙ্গ ইন্দ্রবর্মণের জিরজিংগি তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি প্রাচীন কলিঙ্গ, তোসল এবং উৎকল নিয়ে গঠিত ছিল। আবার কারোর মতে, ওড্র (আসল উড়িষ্যা) কোংগড এবং কলিঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। রামদাসের মতে ত্রিকলিঙ্গ বলতে

কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল বা আধুনিক ছত্তিশগড়ের মধ্যবর্তী পাহাড়ি ভূমিকে বোঝাত। প্লিনির মতে কুণ্ডী তাম্রশাসনে বর্ণিত অঞ্চলটি কলিঙ্গবাসী, ম্যাক্কো কলিঙ্গবাসী, এবং গঙ্গারিড়ি কলিঙ্গবাসীদের দ্বারা অধ্যুসিত ছিল। কানিংহামের মতে তিন কলিঙ্গ আসলে তিন রাজ্য—কৃষ্ণার তীরে ধনকটক বা অমরাবতী, অন্ধ্র বা ওয়ারঙ্গল এবং কলিঙ্গ বা রাজমন্দ্রী। গোদাবরী জেলায় ত্রিকলিঙ্গদেশ বিক্রমাদিত্য একবছর শাসন করেছিলেন, আবার কারোর মতে, ত্রিকলিঙ্গ অর্থে উঁচু বা পাহাড়ি কলিঙ্গ যা আসল কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশলের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। ত্রিকলিঙ্গদেশ উত্তরে গঙ্গা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ত্রিকূট : সহ্যপর্বতমালার সঙ্গে যুক্ত এই পাহাড়টির কথা কালিদাস বলেছেন, ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী এই পর্বতটি মেরু বা সিনেরু পর্বতের পাদদেশে ছিল।

ত্রিপুরী : জাজল্লদেবের রত্নপুর প্রস্তর লিপিতে (চেদি সংবত ৮৬৬) ত্রিপুরীর উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, চেদি শাসক কোকল্লের আঠারটি পুত্রের মধ্যে কোনও এক পুত্র ত্রিপুরী শাসন করত।

ত্রিসামা : ত্রিসামা বা ত্রিভাগা বা পিতৃসোমা এবং ঋষিকুল্য পুরাণে উল্লিখিত দুটি নদী। কিন্তু মনে হয় দুটি একই নদী। ত্রিসামা-ঋষিকুল্য নদীর ব্যবহারিক নাম ঋষিকুলা। মার্কন্ডেয় পুরাণ বলেছে, ঋষিকুলা এবং পিতৃসোমা মহেন্দ্র পর্বতমালায় উৎপন্ন হয়েছে। কূর্মপুরাণ মতে ত্রিসামা, ঋষিকুলা এবং বংশধারিনী শুক্তিমত পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ত্রিশিরাপল্লী : কাবেরীর তীরে আধুনিক তিরুচিরাপল্লী। ত্রিশিরাপল্লী পাহাড়ের অদূরে খোদাই করা এক পাথরের স্তম্ভে দটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। আদিতে যুরুইয়ুর নামে এখানকার এক শহরতলিতে চোলদের রাজধানী ছিল। পরে তিরুচিরাপল্লী কিছুদিনের জন্যে মাদুরার নায়ক শাসকদের রাজধানী ছিল। কর্ণাটীয় যুদ্ধে এই স্থানটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

তুন্ডাকবিষয় : তুন্ডাইমন্ডলম একই।

তুঙ্গভদ্রা : পদ্ম ও ভগবত পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণার নীচের দিকের উপনদীর মধ্যে এটি প্রধান। দুটি জলধারা তুঙ্গ ও ভদ্রার উৎপত্তি মহীশূরের পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতে। কর্নুল জেলায় নন্দী কোটকুরের কাছে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার সঙ্গে মিশেছে। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার অববাহিকায় অশোকের চার 'সেট' শিলালিপি পাওয়া গেছে।

উদগাই : এটি একটি পাণ্ড্য নগর। কথিত আছে রাজরাজা (প্রথম) মালাইনাডু যুদ্ধের সময় নগরটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

উদয়গিরি : খন্ডগিরি দেখুন।

উদয়গিরি : জাজপুর সাবডিভিশনে অবস্থিত এশিয়া পর্বতমালার পূর্বতম প্রান্তের একটি শিখর। স্থানটি গোপালপুরের তিন মাইল উত্তরে পটামুন্ডাই খালের তীরে অবস্থিত। এখানে দুবাহু বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রয়েছে। সপ্তম/অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত অক্ষরে একটি লিপিও রয়েছে।

উদয়গিরি : এটি নেলোর জেলায়। এখানে কৃষ্ণের মন্দির রয়েছে।

উদয়েনদিরম : উত্তর আর্কট জেলার গুডিয়াতম তালুকে অবস্থিত। এখানে বাণ রাজা বিক্রমাদিত্যের (দ্বিতীয়) তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

উদুম্বরবতী : হরিবংশে উল্লিখিত নদীটি দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত।

উলগাই : এটি পান্ড্যদের একটি নগর ছিল। তক্কোলম লিপিতে বলা হয়েছে উদ্গাই।

উপলদ : এটি উপলবাদা নামে পরিচিত। এটি গঞ্জাম জেলার পারলাকিমেডি তালুকের একটি গ্রাম। এখানে রানক রামদেবের এক গুচ্ছ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

উরাগপুর : কাবেরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কেউ আবার এটিকে কাবেরীর দক্ষিণ তীরে তিরুচিরাপল্লীর কাছে উরাইয়ূরকে সনাক্ত করেন। কেউ আবার কাবেরীর মোহনার ৪০ মাইল দূরে উপকূলীয় শহর নেগাপতনমকে চিহ্নিত করেছেন। রঘুবংশে এই নগরের উল্লেখ আছে।

উরলাম : এটি গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত।

উরত্তিবিষয় : বৈতরণীর দক্ষিণ তীরে কেওঞ্ঝরে অবস্থিত।

উৎকলবিষয় : স্কন্দ পুরাণ হিসাবে উৎকল দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে রয়েছে অনেক তীর্থ এবং পবিত্র স্থান। গহড়বাল গোবিন্দ্রচন্দ্রের·দ্বাদশ শতকের লিপিতে উৎকল দেশের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে এখানে শাক্যরক্ষিত বলে এক বৌদ্ধ পন্ডিত বাস করতেন। নরসিংহ (প্রথম) এর ভুবনেশ্বর প্রস্তরলিপিতে দেখা যায় যে তাঁর ভগ্নী চন্দ্রিকা উৎকল বিষয়ে একামরা-য় (আধুনিক ভুবনেশ্বর) একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করছেন। এই লিপি থেকে পরিষ্কার যে পুরী আর ভুবনেশ্বর অঞ্চল উৎকল বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। উৎকলের (উৎকলানাম দিশা) নারায়ণপালের ভাগলপুর দানপত্রে দেখা যায় যে তিনি পালবংশের জয়পালের আক্রমণের আশঙ্কায় রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। গুডবমিশ্রের বাডল স্তম্ভলিপিতে দেবপালকে উৎকল জাতির ধ্বংস, হুণদের গর্ব খর্ব করার জন্য এবং দ্রাবিড় ও গুর্জর রাজাদের শঙ্কিত করার জন্যে প্রশংসা করা হয়েছে। মহাশিবগুপ্ত যযাতির সোনপুর দানপত্রে দেখা যায় তিনি উৎকল দেশকে কলিঙ্গ ও কোনগোডা থেকে পৃথক করেছেন। বৃহৎসংহিতায় একে আধুনিক উড়িষ্যাই বলা হয়েছে। স্কন্দপুরাণ বলেছে, ঋষিকুল্যা নদী থেকে সুবর্ণরেখা ও মহানদী পর্যন্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। মনে হয় উৎকলের পূর্ব সীমান্ত কপিশা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মেকলদের রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

উৎপলাবতী (সুতপলাবতী) : মহাভারতে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে। হরিবংশে আরও একটি নাম পাওয়া যায় উৎপল। মলয় পর্বত এর উৎস।

উত্তম-গণ্ড চোড়ান্নদেবরম : প্রাচীন বিশারী জেলার এই গ্রামটি চোড় রাজা অন্নদেবের নাম অনুসারে। গঙ্গা ও পিমসানী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত।

উত্তম কাকুল : এটি উত্তর কাকুলা। মনে হয় এটি গঞ্জাম জেলার শ্রীকাকুল তালুকে অবস্থিত ছিল।

উত্তিরলাডম : এটি উত্তর লাট।

বৈগডুর : তিরুমালাই পাহাড়ের পাদদেশের একটি গ্রাম। এটি পানগলানাডুর একটি অংশ। মুগাইনাডুতে অবস্থিত।

বৈগাই : এটি তিরুমালাই পর্বত। মধুরার পাশ দিয়ে রয়ে যাওয়া একটি নদীরও নাম। কৃতমালা নদীটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈকণ্ঠ : তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তিন্নেভেলীর ২২ মাইল পূর্বে একটি তীর্থস্থান। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে শ্রীচৈতন্য স্থানটি পরিদর্শন করেন।

বৈলুর : উত্তর আর্কটি জেলার ওয়ানদিওয়াসা তালুকে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত একটি লিপি পাওয়া গেছে। উত্তর আর্কট জেলার বায়লুর থেকে এটি আলাদা।

বৈতরণী : ওড়িশার কেওঞ্ঝর জেলার উত্তর পশ্চিমের পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। এটি কেওঞ্ঝর ও ময়ূরভঞ্জ এবং কেওঞ্ঝর ও কটকের সীমা রচনা করে। কথিত আছে রাম সীতা উদ্ধারের জন্যে লঙ্কায় যাবার পথে কেওঞ্ঝর সীমান্তে এই নদীর তীরে অবস্থান করেছিলেন। মহাভারতে উল্লিখিত নদীটি কিন্তু কলিঙ্গে অবস্থিত। পদ্ম ও মৎস পুরাণ বলে, পরশুরাম এই নদীটিকে মর্তে নিয়ে আসেন। জৈন সাহিত্যে নদীটিকে বৈতরণী বলা হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়তে এর উল্লেখ আছে। বলা হয়ে এটি যম নদী (যমস্য বেতরণিম), তাই দেখা যায়, এটি যমের নদী—এই হিন্দুমতকে বৌদ্ধরা সমর্থন করে।

বল্লবাড় : মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে ২৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে আধুনিক রাধানগরীর স্থানেই ছিল বলয়বাড় বা বলবাড।

বাল্লাড : উত্তর আর্কট জেলার গুডিয়াট্রম তালুকের তিরুবল্লমকে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন বাণ রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

বল্লিমালাই : উত্তর আর্কট জেলার চিত্তুর তালুকের একটি পাহাড়। এটি একটি প্রাচীন জৈন কেন্দ্র। এখানে একটি জৈন লিপি পাওয়া যায়।

বল্লুরু : এটি কুডাপ্পা জেলায় অবস্থিত। এটি ত্রৈলক্যমল্ল মল্লিদেব মহারাজার রাজধানী ছিল।

বংশ ধারা : গঞ্জামের একটি আভ্যন্তরীন নদী। কলিঙ্গপতনমে এটি বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

বনপল্লী : অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার অমলাপুরম তালুকের একটি গ্রাম।

বনবাসী দেশ : বৃহৎ সংহিতা একে দক্ষিণের একটি দেশ বলেছে। কর্ণাটকের উত্তর কানারা জেলায় এটি অবস্থিত। এটি কর্ণাটকের শিমেগা জেলার একটি গ্রামও। একদা এটি অবস্থিত। এটি মহীশূরের শিমোগা জেলার একটি গ্রামও। একদা এটি রাজকীয় মহিমায় উজ্জ্বল ছিল। এখন এক ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম। কদম্ব কীর্তিবর্মার দুটি লিপি এখানে পাওয়া গেছে। এখানে প্রাচীন কদম্বদের দেবতা মধুকেশ্বরের মন্দির রয়েছে। বীরপুরুষ দত্তের নাগার্জুন কোন্ডার লিপিতে উল্লিখিত বনবাসী একই। জরাকুমারের দৌহিত্র জিয়সত্তু এখানে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে অর্হৎ রক্ষিতকে এখানে পাঠান হয়। বৌদ্ধ যুগে এবং পরবর্তী কালে উত্তর কানাড়া বনবাসী বলে পরিচিত ছিল। বুলহারের মতে এটি পশ্চিমঘাট, তুঙ্গভদ্রা ও বরোদার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। হরিবংশে এই দেশের উল্লেখ রয়েছে। বায়ুপুরাণ ও মহাভারতেও এর উল্লেখ রয়েছে। দশকুমারচরিতে দেখা যায়। বসন্তভানু বনবাসী রাজ ভানুবর্মাকে অনন্তবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে

উত্তেজিত করে তোলে। অস্মকরাই প্রথম তাঁকে সহায়তা করে। বনবাসী রাজ্য হচ্ছে প্রাচীন বৈজয়ন্তীপুরা বা জয়ন্তীপুরা—কদম্বদের রাজধানী। প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন অনুযায়ী এটি বৈজয়ন্তী সোরালে তালুকের পশ্চিম সীমান্তে বরোদা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পেরিপ্লাসের বুসানসন—টলেমির বনয়াউয়াসেই। সেন্ট মার্টিনের মতে হিউয়েন সাঙ এই নগর পরিদর্শন করেছিলেন—নাম ছিল কোন-কিন-না-পু-লো—অর্থাৎ কৌংকনপুরা।

বঞ্জি : তামিল প্রাচীন সাহিত্যে এটি কারুর। এটি কাবেরী বা পন্নী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত একটি নগর। কেউ কেউ বলেন, এটি কেরল বা চেরদের রাজধানী ছিল। এখন পেরিয়ার নদীর তীরে—কোচিনের কাছ তিরুকারুর নামে পরিচিত।

বরোদা : মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে এই নদীর নাম রয়েছে। অনন্তপুরেরর উত্তরে পশ্চিমঘাট থেকে উৎপন্ন হয়ে এই প্রাচীন নদীটি করোজগির পূর্বে তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে মিশেছে। বরোদা বেদবতী নামেও পরিচিত। এটি কৃষ্ণার একটি দক্ষিণী উপনদী। মার্কেন্ডেয় পুরাণের বরদা ও অগ্নিপুরাণের বরোদা একই।

বরগুণমঙ্গলম : এটিকে রাজসিংহকুলক্কিও বলা হয়। তদানিন্তন শিবগঙ্গা জমিদারীর রাজসিংহমঙ্গলম বলে চিহ্নিত। পান্ড্যদেশের বৈষ্ণবদের ১৮টি পবিত্র স্থানের অন্যতম। এটি তিন্নেভেলী থেকে ১৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

বরাহবর্তনী : এটি সম্ভবত শ্রীকাকুলের কাছে অবস্থিত ছিল। হস্তিবর্মণের নরসিংহপল্লীর তাম্রশাসনের এর উল্লেখ রয়েছে। বরাহবর্তিনী জেলার রোহনকি গ্রামকে শ্রীকাকাকুল তালুকের সিঙ্গপুরার আধুনিক রোনানকি বলে চিহ্নিত করা হয়। শ্রীকাকুল ও তেক্কালীর মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে বরাহবর্তনী গঠিত ছিল।

বতসগুল্ম : বাকাটক দ্বিতীয় বিন্ধ্যশক্তির বাসিম তাম্রশাসনের এই স্থানটির উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এটিই ছিল বিন্ধ্যাশক্তির রাজধানী। রাজশেখর তাঁর কর্পূরমঞ্জরীতে বচ্চহোমি বলে একটি স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন যা আসলে সংস্কৃত বত্সগুলমী। বচ্চহোমি নামটি তার রাজধানী বচ্চহোমা থেকে নেওয়া হয়েছে যা বৈদ্রভীর সমতুল। রাজশেখর বলেছেন বচ্চহোমা দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিল। তাঁর সময়ে এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এটি বেরারের আকোলা জেলার বাসিম তালুকের সদরদপ্তর বাসিমের সমতুল।

বাগহাউরা : এটি ওয়াঘুর ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে।

বাতাপী : একটি গ্রামের নাম। বাতাপি যুদ্ধ হয়েছিল ৬৪২ খ্রিঃ। সিরুত্তোন্ড যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

বেখা : এটি বেগবতী নদীর তামিল নাম।

বেলনাণ্ডু : সকরম্বু লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান গুন্টুর জেলার আধুনিক রেপাল্লে তালুককে বেলনাণ্ডু বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে এখানকার শাসকেরা মধ্যদেশের কীর্তিপুরাকে তাদের আদিনিবাস বলে দাবি করেছিলেন।

বেলপাদি : উত্তর আর্কট জেলার ভেলোরের একটি শহরতলি।

বেল্লুর : বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত একটি দক্ষিণী নগর। এটি বেলুড, ইয়েলুডা, ইলুরা বা ইলোরা একই স্থান।

বেলুকণ্টক : এটি দাক্ষিণাত্যের একটি অরণ্য।

বেলুনগগুন্টা : এটি চিত্তুর জেলার আধুনিক বেলিগল্লু।

বেলুরা : গঙ্গ অনন্তবর্মণের স্বল্প বেলুর দানপত্র অনুযায়ী এই নামে দুটি গ্রাম রয়েছে—একটি ছোট, অপরটি বড়।

বেনা : বৃহৎসংহিতা অনুযায়ী এটি এক দক্ষিণী নদী।

বেনাড : এটি আধুনিক ত্রিবাঙ্কুর যার রাজধানী ছিল কোল্লম (কুইলোন)

বেনগাই-নাড়ু : এটি প্রসিদ্ধ বেনগি রাজ্য। এটি পূর্ব চালুক্য অঞ্চল। কুলোত্তুঙ্গদেব বা রাজনারায়ণ সর্বপ্রথম বেনগির সিংহাসনে বসেন। কেরালা. পাণ্ড্য, কুন্তল প্রভৃতি দেশ জয় করেন। এটি চোড় রাজ্য ভুক্ত হয়।

বেনগি (বেনগিপুরা) : গোদাবরী জেলার ইলোরের কাছে পেড্ডাবেগী গ্রাম। এটি গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সোমেশ্বরদেবের কুরুষপাল প্রস্তর লিপি অনুযায়ী, বীরচোড়কে তাঁর পিতা এখানকার প্রাদেশিক নিযুক্ত করেন। বীর রাজেন্দ্রদেবের (শক ৯৯১) চরল তাম্রশাসনে বেনগি দেশের উল্লেখ রয়েছে। বল্লভ-বল্লভ এই দেশটি জয় করেন। নন্দীবর্মণের (দ্বিতীয়) পেড্ডাবেগি তাম্রশাসনে দেখা যায়, বেলগির রাজা হস্তিবর্মণ সালনকায়ন বংশের লোক ছিলেন। কুলতুঙ্গা (প্রথম) এর ১০৮৭ খ্রিঃ টেকি তাম্রশাসনে দেখা যায় তাঁর পুত্র বীরচোড় বেনগির প্রশাসক। বেনগির সীমা উত্তরে মহেন্দ্রপর্বত এবং দক্ষিণে নেল্লোর জেলার মন্নেরু।

বেংকটগিরি : উত্তর আর্কট জেলার তিরুপতির কাছে তিরুমালাই পর্বত। এখানে দ্বাদশ শতকে প্রখ্যাত বৈষ্ণব রামানুজ বিষ্ণুপূজা করেছিলেন। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী এটি বেংকটাচল।

বেপ্পমবট্টু : উত্তর আর্কট জেলার আন্দিনাড়ুতে অবস্থিত।

বিজয়নগর : কর্ণাট দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। এটি বিজয়ানগর বলেও পরিচিত ছিল। একদা এই দেশের রাজ্য সীমার মধ্যে ছিল সমগ্র চেন্নাই প্রদেশ, মহীশূর, ধারোয়ারের জেলাগুলি এবং তদানিন্তন বোম্বে প্রেসিডেন্সি, উত্তর কানাড়া, কৃষ্ণার উত্তরের জেলাগুলি বাদে, পশ্চিম উপকূলের মালাবার জেলা, ত্রিবাংকুর ও কোচিন। খুব সমৃদ্ধ দেশ ছিল। বিজয়নগরের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমন্দিরের কিছু লিপি থেকে জানা যায়, ১৫১৪ খ্রিঃ বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় ওড়িশার গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে উদয়গিরি দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি এখানকার বালকৃষ্ণের একটি মূর্তি নিয়ে গিয়ে বিজয়নগরের কৃষ্ণমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন পম্পা—অধুনা হাম্পির স্থানেই ছিল বিজয়নগর।

বিজয়বাটি: কৃষ্ণার ওপর আধুনিক বিজয়ওয়াড়া।

বিক্রমপুর : ত্রিচি জেলার মুসুরি তালুকের কান্নানুর হচ্ছে এর প্রাচীন নাম।

বিলবট্টি : এটি সম্ভবত গ্রাম বব্বেরু। কেউ এরই ১২ মাইল পূর্বে বিডাভলুরুকে চিহ্নিত করেন।

বিলিগ্রাম : তদানিন্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি বন্দর।

বিন্নকোটা : অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার গুডিবাড তালুকের আধুনিক বিন্নকোট।

বিসমগিরি : গঞ্জাম জেলার অসকা তালুকে অবস্থিত একটি গ্রাম।

বিসরিনাড়ু : অনন্তদেবের পূর্বজ এরুবভীম কর্তৃক বিজিত দেশগুলির একটা। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগের একটি লিপি থেকে এটি সমর্থিত হয়।

ব্যাঘ্রাগ্রহার : চিদাম্বরমের অন্যতম নাম। সংস্কৃত—পুলিয়ুর (ব্যাঘ্র গ্রাম)।

ব্যাস সরোবর : জাজপুর রোড স্টেশনের ২ মাইল দূরে খুঁজে যাওয়া একটি জলাশয়।

যৌগডহ : গঞ্জামের ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে একটি স্থান। এখানে অশোকের লিপি পাওয়া গেছে।

যযাতি নগর : এটি ওড়িশার কটকের প্রাচীন নাম। কেউ বলেন এটি ওড়িশার জাজপুর। এটি সঠিক নয়। কারণ যযাতি-নগর মহানদীর তীরে ছিল। জাজপুর বৈতরণীর তীরে। তাছাড়া লিপিতে প্রাপ্ত সনদ থেকে দেখা যায় তা প্রচারিত হয়েছিল কটক থেকে যা আধুনিক কটকই।

য়েডাতোর (ইডালিটুরেইন নাড়ু) : মহীশূর জেলার ছোট একটি গ্রাম।

ইয়েয়ুর : কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার সোরাপুর তালুকের একটি গ্রাম। এখানে জয়সিংহ (দ্বিতীয়) এবং বিক্রমাদিত্য (ষষ্ঠ)-র লিপি পাওয়া গেছে।

পূর্ব ভারত

অগ্রদ্বীপ : পঃ বঙ্গের নদিয়া জেলার ভাগিরথীর একটি দ্বীপ।

অহিয়ারি : দ্বারভাঙার ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে কামতাউলের একটি ছোট গ্রাম। কথিত আছে এখানে ঋষি গৌতমের একটি মন্দির ছিল। অহল্যা ছিল ইঁনারই স্ত্রী। রূপের জন্য ভুবন বিখ্যাত। ইন্দ্র একে ছলনা করেছিলেন। ইনি গৌতমের অভিশাপে পাষাণে পরিণত হন এবং রামচন্দ্রের স্পর্শে মুক্তি পান।

ঐরাবট্টমণ্ডল : পাটোদাবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যার কটক জেলার বাংকি পুলিশ থানার রটাগড়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অজয় : বর্ধমান জেলায় ভাগিরথীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অজয় নদ। এটি বর্ধমান ও বীরভূমের সীমা রচনা করেছে। এটি অজমতী বলেও পরিচিত। এরিয়ানের ইন্ডিকা অনুযায়ী এটি অম্যাসতিস নদী কাকটদ্বীপের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। বিখ্যাত বাঙালি কবি জয়দেব এই নদীর তীরে কেন্দুলী (কেন্দুবিল্ব) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অল্লকপ্পা : স্থানটি বেথদ্বীপের কাছেই। সাহবাদ অঞ্চলের মাসার থেকে বৈশালী যাবার পথে এটি অবস্থিত ছিল। আয়তন ছিল ১০ লীগ। বেথদ্বীপের রাজা বেথদ্বীপকের সঙ্গে অল্লকপ্পার রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গণতন্ত্রী বুলিরা অল্লকপ্পার অধিবাসী ছিল। এরা বুদ্ধের চিতাভস্মের একটি ভাগ পেয়ে তার ওপর একটি স্তূপ রচনা করেছিল। কেউ কেউ বলেন, বুলিরা গঙ্গার দুই তীরে মুজঃফরপুর ও সাহবাদে বাস করত।

অম্বালথিকা : দীর্ঘনিকায়তে বর্ণিত রাজগৃহের ভেতর বা বাইরে বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্বের স্থান। অম্বালথিকায় রাজাগারকা ছিল রাজা বিম্বিসারের একটি বাগান বাড়ি। বুদ্ধ ঘোষের কথায় রাজ উদ্যানের এটি যথাযথ নাম। কারার প্রবেশ দ্বারের কাছেই ছিল একটি নবীন আম্রকানন। স্থানটি রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। বুদ্ধের সময় রাজগৃহ থেকে নালন্দা এবং আরও পূর্বে বা উত্তর পূর্বে যাবার পথে এটিই ছিল প্রথম বিশ্রামস্থল।

অম্বপালীবন : বৈশালীর এই আম্র উদ্যানে বুদ্ধ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। এটি নগরনতর্কী আম্রপালীর উপহার ছিল।

অম্বসণ্ডা (আম্র খণ্ড) : বেদিয়ক পর্বতের উত্তরে রাজগৃহের পূর্বে একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম এবং ইন্দ্রশাল গুহা। অদূরেই ছিল একটি আম্রকুঞ্জ। তাই এই নাম।

অম্ববন : রাজ চিকিৎসক জীবকের আম্রকুঞ্জ। এখানে বুদ্ধ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিলেন।

অন্ধকবিন্দ : মগধের এই স্থানে বুদ্ধ একবার বাস করেছিলেন। ব্রহ্মা সহমপতি এখানে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। রাজগৃহের সঙ্গে স্থানটি গোশকট পথে যুক্ত ছিল।

অন্ধপুরা : সেরি রাজ্যের অধিবাসীরা যারা তৈজস পাত্র বিক্রয় করত—তারা তেলবাহ নদী পার হয়ে এই নগরে প্রবেশ করত।

অঙ্গ : অঙ্গ ভারতের প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম এক সমৃদ্ধ রাজ্য। যোগিনীতন্ত্র, রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। অথর্ববেদ অঙ্গদের এক জাতি হিসাবে মগধ,

মূজবন্ত এবং গান্ধারদের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। কিন্তু কোনও রাজ্যসীমা দেয়নি। এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে অর্থাৎ ব্রাত্য ছিল। গোপথ ব্রাহ্মণে এদের অঙ্গ-মগধ বলা হয়েছে। পাণিনী জোট হিসাবে উল্লেখ করেছেন, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিন্দ, পুণ্ড্র ইত্যাদি। সব কটি রাজ্যই ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। মহাভারত বলেছে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি জাতিরা বালির স্ত্রী সুদেশনার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতম কর্তৃক উৎপাদিত। জিমার ও ব্লুমফিল্ড বলেন, অঙ্গেরা শোণ ও গঙ্গার তীরে বসবাস করত। পার্জিটার মনে করেন, এরা অনার্য এবং সমুদ্রপথে ভারতে এসেছিল। নৃতত্ত্বগত ভাবে এরা কলিঙ্গ এবং বঙ্গের লোকদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসন অনুযায়ী বর্মণ রাজারা এই দেশ জয় করেছিল। কর্ণের রেওয়াল প্রস্তরলিপি অঙ্গদের কাংড়া উপত্যকার, লাট, কুন্তল এবং কুলঞ্চদের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। আধুনিক ভাগলপুর জুড়ে ছিল অঙ্গ দেশ। কনৌজের রানী কুমারদেবীর সারনাথ লিপি তাঁর মাতামহ রামপালের অধীনে মোহন বলে একজন প্রাদেশিক অঙ্গ শাসন করতেন। নবম শতাব্দীর অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ড প্রস্তর লিপি বলে, অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের শাসকেরা তাঁর পদানত ছিল। কৃষ্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের দেওলি দানপত্রে বলা হয়েছে, অঙ্গ, মগধ ও অন্যান্যরা তাঁদের পদানত ছিল।

রাজা অঙ্গের নামেই অঙ্গ। রামায়ণ বলে, দেব মদন রুদ্রের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এখানে পালিয়ে এসে অনঙ্গ অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগ করে দেহহীন হয়ে যান তাই অঙ্গ নাম। অঙ্গকে ঘিরে যে আনভ রাজ্য তার রাজ ছিলেন বলি। তার রাজ্য পাঁচ পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে পৃথক নামকরণ হয়। পার্জিটার বলেন, আনভ রাজ্য সমগ্র পূর্ব বিহার, বাংলা-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, এবং কলিঙ্গ। অঙ্গ রাজ্য ভাগলপুর এবং সম্ভবত মুঙ্গের নিয়ে গঠিত ছিল। অঙ্গের আদি নাম ছিল মালিনী। পরে রাজা চম্পার সম্মানে নাম হয় চম্পা, চম্পাবতী। রাজা চম্পা ছিলেন ঋষি লোমপাদের দৌহিত্রের দৌহিত্র। চম্পা নগর নির্মাণ করে মহাগোবিন্দ। এখানেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি দেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র একদা এর শাসক ছিলেন। বুদ্ধ এবং মহাবীরের পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল চম্পা।

এটি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর বসুপুজ্যের জন্ম ও মৃত্যুস্থান। বিন্দুসারের স্ত্রী—অশোকের মাতা ছিল চম্পার ব্রাহ্মণ কন্যা শুভদ্রাঙ্গী।

চম্পাপুরী, চম্পানগর বা চম্পামালিনীকে মহাভারত এক তীর্থ বলে উল্লেখ করেছে। হিউয়েন সাঙ এই নগরকে বলতেন চানপ-ও। জৈনদের পবিত্র নগর। চম্পা নদী অঙ্গ আর মগধের সীমা রচনা করত। মহাভারতের সময়েও নগরটি চম্পা গাছে পরিবেষ্টিত ছিল। চম্পার রাজধানীর বাইরে গঙ্গার তীরে একদা বাস করতেন ঋষি মরিচী—।

ফাহিয়েন চম্পা পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি কিছু স্তুপ দেখেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ দেখেন, অধিকাংশ বিহারই ধ্বংস প্রাপ্ত। ২০০জন হীনযানী ভিক্ষু চম্পায় বাস করেন। ঈরণপর্বত চম্পায় ছিল। সেখান থেকে যুদ্ধের হাতি সংগ্রহ করা হোত। রামায়ণ অনুযায়ী সুগ্রীব সীতার খোঁজে পূর্বদেশে যে বাঁদর সেনা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে অঙ্গ। ঋকবেদের এক বিখ্যাত লেখক আউরবের দেশ ছিল অঙ্গ। ললিত বিস্তারের মতে অঙ্গের নিজস্ব একটি লিপি ছিল।

প্রাচীন অঙ্গ-এ ছিল ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম, কর্ণগড় বা কর্ণের দুর্গ, জহ্নু মুনির ও ঋষি মোদাগিরির (মুঙ্গের) আশ্রম। মহাভারতে অঙ্গ আর বঙ্গ মিলিয়ে একটি দেশেরই কথা বলা হয়েছে।

অঙ্গে অনেকগুলি নগর ছিল যেমন : আপন, ভদদীয় নগর—যেখানে বিশাখার কন্যা সুমনাদেবী বাস করত, বুদ্ধ পরিদর্শিত অস্সপুর ইত্যাদি।

বুদ্ধের সময় অঙ্গ ও মগধের রাজা অর্থাৎ প্রসেনজিৎ ও বিম্বিসারের দানে অনেকগুলি স্নাতক বিদ্যা কেন্দ্র চলত।

অঙ্গে স্ত্রী-পুত্র বিক্রী করার একটা প্রথা ছিল।

দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অঙ্গরাজ আহুত হয়েছিলেন। অঙ্গের শক্তিশালী রাজা রোমপাদের আহ্বানে বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে এসেছিলেন। দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজের কন্যাকে দান করেন। রোমপাদের অনুরোধে ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর স্ত্রী শান্তাকে নিয়ে অযোধ্যায় দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে যান।

দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গের সিংহাসনে বসান। বুদ্ধ ও মহাবীরের সময় শ্রেণীয় বিম্বিসার মগধের রাজা ছিলেন। অঙ্গ ও মগধের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হোত। মগধের রাজা ভাতিয়ের সময় তাঁর পুত্র বিম্বিসার মগধের প্রাদেশিক ছিলেন। বিম্বিসারের সময় পুত্র অজাতশত্রু অঙ্গের প্রাদেশিক ছিলেন। অঙ্গ মগধের অংশে পরিণত হবার পরই মগধের উত্থান শুরু হয়।

অংগদ : একটি রাজ্য। কারায়ন ছিল এর রাজধানী।

অংগদ্বীপ : ম্লেচ্ছ অধিকৃত জম্বুদ্বীপের অংশ।

অংগার : এই গ্রামটি হয় মানগ্রাত্তন বা এর প্রতিবেশী সাংগ্রাত্তন।

অঞ্জনবন : এটি সাকেতে অবস্থিত। বুদ্ধ একবার এখানে বাস করেছিলেন।

অন্তরগিরি : সাঁওতাল পরগণার রাজমহলের একটি পাহাড়।

অপর-গয়া : এটি গয়ার কাছে। সুদর্শনের আমন্ত্রণে বুদ্ধ একবার এখানে এসেছিলেন।

আপাপপুরী : পাবাপুরী দ্রষ্টব্য।

অফসদ : আদিত্যসেনের অফসদ বা অফসন্দ লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

অশোকরাম : অশোকের নির্মিত পাটলিপুত্রের একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র। অশোকের সময় এখানে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়। অধ্যক্ষ ছিলেন ধম্মরক্ষিত।

মহাবংশে অশোকরামার একটি জলাশয়ের উল্লেখ রয়েছে। সত্য ধর্মের একটি সংকলন এখানেই প্রস্তুত হয়। এই আরাম থেকে মিত্তিন্ন নামে এক অর্হৎ অনেক ভিক্ষু নিয়ে পাটলিপুত্রে এসেছিলেন।

আউদমবরিকা : জয়নাগের বপ্পঘোশবাত লিপিতে এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ সরকার আউদমবরের উদমবর-এর সঙ্গে বাংলার বর্ধমান জেলার মল্লাসারুল গ্রামের দক্ষিণের সঙ্গে একটি ভৌগোলিক সংযোগ আবিষ্কার করেছেন।

আদিপুর : ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার পঞ্চপির সাব-ডিভিসনের একটি গ্রাম।

আলবি : কোশল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নগরটি শ্রাবস্তী থেকে ৩০ যোজন ও বারাণসী থেকে ১২ যোজন দূরে ছিল। শ্রাবস্তী ও রাজগৃহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত

ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, এটি গঙ্গার তীরে, কেউ আবার উত্তর প্রদেশের নেওয়াল বা নাওয়ালকে চিহ্নিত করেন। আর একদল মনে করেন, এটি এটওয়ার উত্তর পূর্বে আভিওয়া। এখানে আড়ভির কাছে অগ্গাড়ভ নামে একটি মন্দির ছিল। এখানে বুদ্ধ একবার বাস করেছিলেন।

আমগাচি : বাংলার দিনাজপুর জেলার একটি গ্রাম। এখানে তৃতীয় বিগ্রহ পালের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

আম্রগরত্তিকা : এটি মল্লাসারুলের দক্ষিণে আধুনিক অম্বাহুলা বা সিমাসিমি।

আড়ংঘাটা : নদীয়া জেলার রাণাঘাটের উত্তরের একটি গ্রাম। চূর্ণী নদী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে কৃষ্ণ ও রাধার মূর্তি রয়েছে যুগলকিশোর মন্দিরে।

আরাম : এটি ওড়িশার একটি সমৃদ্ধশালী নগর বলে কথিত। সোনপুর শহরের কাছাকাছি এটি অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়।

আড়িয়াখাল : ফরিদপুরের নীচে পদ্মার একটি শাখা নদী।

আত্রেয়ী : এটি ছোট-যমুনার একটি উপনদী। রাজশাহীতে দুটি নদী মিশেছে।

বড়গঙ্গা : দাবোকার ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি ছোট-নদী।

বদাল : এটি দিনাজপুরের একটি গ্রাম। এখানে নারায়ণ পালের একটি স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে। গরুড়ের মূর্তি খোদিত একটি স্তম্ভও পাওয়া গেছে। বদাল স্তম্ভলিপিতে গুড়বমিশ্র উৎকল ও হুণদের খর্ব করার জন্যে দেবপালের প্রশংসা করেছেন।

বড়কামতা : মেঘনার উত্তর তীরে অবস্থিত। কুমিল্লার কাছে অবস্থিত করমান্ত বলেও এটি পরিচিত ছিল। আধুনিক বড়কামতা কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

বহুপুত্ত : বৈশালীর একটি একটি চৈত্য।

বৈদ্যনাথ : এটি-হারদ্দপীঠ ও দেওঘর বলেও পরিচিত। জসিডির দক্ষিণে একটি ছোট শহর। মুসলিম যুগের শেষের দিকে এটি বীরভূম জেলার অংশ ছিল। এটি এখন ঝাড়খণ্ডে। হিন্দু তীর্থ। এখানে রয়েছে ত্রিকূট পর্বত ও বৈদ্যনাথের বিখ্যাত মন্দির।

বলবলভি : ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এর উল্লেখ রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটিকে বাগড়ি বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

বল্লভপুর : এটি হুগলীর শ্রীরামপুরের কাছে। এখানে রাধাবল্লভের একটি মন্দির আছে।

বনসি : মান্দার পাহাড়ের কাছে ভাগলপুরের একটি গ্রাম। ঘর-বাড়ি ইত্যাদির ছড়ানো ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এখানে একটি বড় নগর ছিল। সম্ভবত কালাপাহাড় এই নগর ধ্বংস করেন। মান্দার পাহাড়ের মধুসূদন মন্দির ধ্বংসের পর মূর্তি বনসিতে নিয়ে আসা হয়। এটি এখনও এখানেই রয়েছে। প্রতিবছর পৌষের শেষ দিনে মূর্তিটি পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং উৎসব হয়।

বারবার পাহাড় (খালটিকা) : গয়ার ১৬ মাইল উত্তরে এই পাহাড়ে অনেকগুলি গুহা আছে। সাতঘরা (সাতটি বাড়ি) নামে গুহাগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ প্রান্তের চারটি সবচেয়ে প্রাচীন। ন্যাগ্রোধ গুহাটি দক্ষিণ মুখ করে খোদাই করা হয়েছিল। এখানে এক উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, অশোক আজীবকদের গুহাটি দান করেছিলেন। লোমশ

ঋষির গুহাটি এরই মতো, কিন্তু অসম্পূর্ণ। বারবার জোটের চতুর্থ গুহাটির নাম বিশ্বঝোপড়ি। এখানেও অশোকের দানপত্র উৎকীর্ণ করা রয়েছে।

বরনার্ক : দ্বিতীয় জীতগুপ্তের দেওবরনার্ক লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি শাহবাদ জেলার আরার ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে প্রাচীন বারুনিকা।

বরন্তপুর : ভাগলপুরের মাধিপুরার ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কথিত আছে এটি মহাভারতের বিরাট রাজার দুর্গ। পাণ্ডব ভীমসেন এখানে কীচককে হত্যা করেন। উত্তর গোগৃহ বা উত্তর গোচারণ ক্ষেত্র এই গ্রামের কাছেই ছিল।

বরাকর : এটি বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। মধ্যযুগের কিছু মন্দির রয়েছে এখানে।

বসরা : হাজিপুরের ২০ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই গ্রামটি অবস্থিত। এটিই প্রাচীন বৈশালী বলে চিহ্নিত।

বাণগড় : এটি দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রথম মহীপালের দানপত্র পাওয়া যায়। পুণর্ভবা নদীর পূর্ব তীরে বাণগড় বা বান্নগরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। স্থানটি দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে, গঙ্গারামপুরের দেড় মাইল উত্তরে।

বারিপাদা : এটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে।

বেলুবগাম : এটি বৈশালীর একটি গ্রাম।

বেলওয়া : হিলি স্টেশনের ১৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

ভদদীয়নগর : এটি অঙ্গের একটি নগর। বিশাখা এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাগবানগঞ্জ : দিনাজপুরের দক্ষিণ পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে একটি স্তুপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সম্ভবত এটি হিউয়েন সাঙ বর্ণিত দ্রোণ-স্তুপ। দ্রোণ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধের চিতাভস্ম বন্টন করেছিলেন। এটি পুনপুন নদীর কাছেই।

ভণ্ডগাম : এটি বজ্জিদের রাজ্যে অবস্থিত ছিল।

ভাগিরথী : যোগিনীতন্ত্র ও হরিবংশে উল্লিখিত নদী। ভগীরথ এই নদীকে মর্তে এনেছিলেন বলেই এর নাম ভাগিরথী। ইন্দ্র এই নদীর তীরে ললিতাকে পূজা করেছিলেন। সেন ও চন্দ্রের তাম্রশাসন অনুযায়ী ভাগিরথীই হচ্ছে গঙ্গা। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে দেখা যায়। ভাগিরথীকেই গঙ্গা বলা হয়। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে হুগলী নদী জাহ্নবী।

ভানি : গোবিন্দচন্দ্রের কামাউলি তাম্রশাসনে ভানি গ্রাম দান করার বিষয়টি রয়েছে। এটি মডবত্তলা বা পট্টলায় অবস্থিত ছিল। স্থানটি এখনও চিহ্নিত হয়নি।

ভাটেরা : বাংলাদেশের শ্রীহট্ট থেকে ২০ মাইল দূরে রয়েছে গ্রামটি।

ভাটসাল : দিনাজপুরের ঘোরাঘাট থানার একটি গ্রাম।

ভোজপুর : বক্সার জেলার ডুমরাঁও-এ গ্রামটি অবস্থিত। এখানে ভোজরাজাদের নানান ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

বোধগয়া (বুদ্ধগয়া) : এর প্রাচীন নাম উরুবিল্ব বা উরুবেলা—নদীর বালুকাময় তীরে অবস্থিত। স্থানটি গয়ার ৬ মাইল দক্ষিণে। বুদ্ধগয়া থেকে গয়ার দূরত্ব ৩ গাবুত অর্থাৎ ৬ মাইলের একটু বেশি। এখানে গৌতম বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। (মহানামনের

১৬৯ খ্রি: বোধগয়ার লিপিতে) বোধগয়ার বিখ্যাত বৌদ্ধ স্থানটির উল্লেখ রয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র : এটি অসমের মুখ্য নদী। যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। কালিদাস একে লৌহিত্য এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের পশ্চিম সীমা বলেছেন। জম্বুদীবপন্নতিতে বলা হয়েছে, এই নদীটির উৎস পূর্ব পদ্মসরোবরের থেকে। আধুনিক ভৌগোলিকরা বলেন, মানস-সরোবরের পূর্ব থেকে। ব্রহ্মপুত্রের তিনটি জলধারা রয়েছে। কুপি চেমা, উংদুং ও অংসি চু। এগুলো সবই হিমবাহ থেকে উৎপন্ন। স্বেন হেডিনের মতে, ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি কুপি হিমবাহ। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দের মতে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি চেমা য়ুং দুং হিমবাহ থেকে। দক্ষিণ তিব্বতের মালভূমিতে ব্রহ্মপুত্র সুনপা বলে পরিচিত। অসমের লখিমপুরের কাছে ব্রহ্মপুত্রের এক গভীর দহ রয়েছে। কথিত আছে, ব্রহ্মকুণ্ড নামে এই দহে পরশুরাম তাঁর কুঠার বিসর্জন দিয়েছিলেন। নদীটি যখন পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসছে অথচ চারদিকে পাহাড়ঘেরা সেই রকম এক অঞ্চলে দহটি অবস্থিত।

ব্রাহ্মণী : ওড়িশার বালেশ্বরের এক নদী।

বুরবালং : এটি করকাই-এর নিম্নভাগ। এটি ধলভূমগড়ের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বালেশ্বরের ভেতর দিয়ে গেছে।

বুড়িদিহিং : এটি ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী।

ভদ্দিলপুরা : হাজারিবাগ জেলার কুলুহা পাহাড়ের কাছে ভদিয়া বলে একটি গ্রাম। অরিষ্টনেমী স্থানটি পরিদর্শন করেন।

ভোগনগর : পাবার কাছে স্থানটি অবস্থিত। বুদ্ধ এখানে বাস করেছেন।

চম্পা : নদীটিব পূর্বে অঙ্গ, পশ্চিমে মগধ। সম্ভবত ভাগলপুরেব শহরতলির কাছে চম্পানগর ও নাথনগরের সেই একই নদী। পূর্বে এর নাম ছিল মালিনী। রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে।

চম্পাপুরী : এটি অঙ্গের রাজধানী এবং পূর্বতন মালিনী। জৈন ঔপপাটিকা সূত্রে এটিকে একটি সমৃদ্ধ নগর বলা হয়েছে। এখানে দ্বাদশ জিন বসুপুজ্য জন্মগ্রহণ করেন, কেবলজ্ঞান ও নির্বাণ লাভ করেন। আজীবক গোষ্ঠীর এবং জামালির প্রবক্তা গোশাল এখানে প্রায়ই আসতেন। নগরটি ভাগলপুরের চারমাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। নগরটি মহাভারতে উল্লিখিত। হিউয়েন সাঙ এই নগর পরিদর্শন করেছিলেন। চিনা ভাষায় এটি চেনপো। সঙ্ঘারামগুলি তখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিছু দেবালয় রয়েছিল।

চন্দ্রদ্বীপ : রামপালের শ্রীচন্দ্র দানপত্রে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিঃ ১০ বা ১১ শতকে ত্রৈলক্যচন্দ্র এখানে শাসন করতেন। এই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাখরগঞ্জের কিছু অংশ ছিল। কেউ কেউ বলেন, বাকলা চন্দ্রদ্বীপের কথাই প্রাচীন সাহিত্যে বলা হয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাদা লিপিতে উল্লেখ আছে 'নন্দ্রদ্বীপ'। কেউ বলেন কথাটি কন্দ্রদ্বীপ, ইন্দ্রদ্বীপ এবং চন্দ্রদ্বীপ। সম্ভবত অঞ্চলটি ঘর্ঘরাকাট্টিপাট্টককে নিয়েই ছিল। ঘর্ঘরা একটি নদী যা ১৫ শতকে ফুল্লশ্রী—বাখরগঞ্জের উত্তর পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হোত।

চন্দ্রনাথ : কথিত আছে, শিবের প্রিয় শৃঙ্গ। এখানে সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল। এটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। সীতাকুণ্ডের কাছে রয়েছে চন্দ্রনাথ এবং শম্ভুনাথের মন্দির।

চন্দিমাউ : পাটনা জেলার একটি গ্রাম। বেশ কয়েকটি সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে।

ছত্তিবন্না : (বৃহৎ) : ন্যায় পালদেবের ইরদা তাম্রশাসন দানপত্রে গ্রামটির কথা রয়েছে। এটি মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ছাতনা বলে চিহ্নিত।

ছিন্নমস্তা : হাজারীবাগ জেলার গোলা সাবডিভিশনের একটি গ্রাম। এখানে আগে নরবলি হোত। রামগড় থেকে বাসে যাওয়া যায়।

চোরপপাত : রাজগৃহের একটি পাহাড়।

চ্যবন আশ্রম : বিহারের সাহবাদে অঞ্চলে অবস্থিত। আবার কারোর মতে এই সাতপুরা পর্বতমালার পয়োশনি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

দণ্ডভুক্তি : ন্যায়পালদেবের ইরদা তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে। মনে হয় গ্রামটির নাম ছিল দণ্ড যা একটি ভুক্তির অধীনে ছিল। খুব সম্ভবত এটি বর্ধমান ভুক্তির মধ্যে ছিল।

ডবাক : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট, কামরূপ, কর্ত্রীপুর ইত্যাদির সঙ্গে ডবাকর নাম রয়েছে। আসামের নওগংজেলার আধুনিক ডবোকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফ্লিট বলেন এটি ঢাকার পূর্বনাম। ভি. এ. স্মিথের মতে এটি বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত।

দামোদর : ভাগিরথীর একটি উপনদী। হাজারীবাগের বাগোদরের কাছের পাহাড়ে উৎপন্ন।

দামোদরপুর : দিনাজপুর জেলার ফুলবারির ৮ মাইল পশ্চিমে। গুপ্তযুগের পাঁচটি তাম্রশাসন এখান থেকে পাওয়া গেছে।

দাপনিয়া পাটক : লক্ষণসেনের মাধিনগর তাম্রশাসনে উল্লিখিত গ্রামটি পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির বরেন্দ্রির কান্তাপুরার একটি গ্রাম।

দেহার : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাছে অবস্থিত। এখানে সরেস্বরের একটি ছোট মন্দির রয়েছে।

দেওবরুনারক : এটি মহাদেওপুরের ৬ মাইল উত্তর পূর্বে এবং আবার ২৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানে একটি সূর্য মন্দির আছে। বিষ্ণুরও একটি মূর্তি রয়েছে।

দেওকালি : এই গ্রামটি সীতামারির ১১ মাইল পশ্চিমে। এখানে মহাভারতের দ্রুপদ রাজার দুর্গ ছিল।

দেওপানি : অসমের শিবসাগর জেলার একটি নদী। এর কাছে এক জঙ্গলের মধ্যে একটি বিষ্ণুমূর্তির ওপর খোদিত লিপি পাওয়া গেছে।

দেউলবাড়ি : কুমিল্লার ১৪ মাইল দক্ষিণে একটি গ্রাম।

দেবগ্রাম : ভুবনেশ্বর প্রশস্তি দেবগ্রামের উল্লেখ আছে। এটি নদীয়া জেলায়।

ধলেশ্বরী : ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী।

ধেক্কারী : ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। জটোদা নদীর তীরে চেককারীকে অনেকে বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে ছিল বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেন দুটিই অসমের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় অবস্থিত।

ধ্রুবিলতি : ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। পার্জিটার বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ধুলাটকে চিহ্নিত করেছেন।

দিসরা : পাটকই পাহাড়ে নদীটির উৎপত্তি। এটি ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা জোটের নদী।

দুয়ারবাসিনী : এটি মালদা জেলায় মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

দুর্বাসা-আশ্রম : কথিত আছে খল্লিপাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গে ছিল দুর্বাসা মুনির আশ্রম। গ্রীয়েরসন মনে করেন, এটি গয়া জেলার নওয়াধ সাবডিভিশনের রাজাউলির ৭ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত ছিল।

এটি ভাগলপুর জেলার কোলগংয়ের ২ মাইল উত্তরে এবং পাথর ঘাটার ২ মাইল দক্ষিণে।

একনালা : রাজগৃহের পর্বতমালার দক্ষিণে দক্ষিণগিরিতে ছিল এই ব্রাহ্মণ গ্রামটি। সমুত্তনিকায় পরিস্কার ভাবে বলেছে যে এটি রাজগৃহের বাইরে ছিল।

গগ্গরা : চম্পানগরের অদূরেই ছিল এই জলাশয়, রানী গগ্গরা এটি খনন করিয়েছিলেন। এই জলাশয়ের তীরে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। চম্পানগরের সীমানায় পলি পড়ে বুঁজে যাওয়া সরোবর নামে জলাশয়টিকে চিহ্নিত করা হয়। এই সরোবরের মধ্যে থেকে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে।

গরাই মধুমতী : ফরিদপুর জেলার গঙ্গা থেকে গরাই বেরিয়েছে। তারপর মধুমতী নাম নিয়ে ফরিদপুর আর যশোরের সীমানা নির্দ্ধারণ করেছে। হরিণঘাটা নাম নিয়ে বাখরগঞ্জ জেলায় বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

গরগাঁও : অসমের শিবসাগর জেলার নাজিরার কাছে।

গারো : মেঘলালয় মালভূমির পূর্বদিকের প্রসারণই হচ্ছে গারো পাহাড়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তরে ও পশ্চিমে হঠাৎই পাহাড়টি উঠে তারপর আবার হঠাৎই অসম ও বাংলার দিকে বাঁক নিয়েছে।

গৌড় : হিন্দু-মুসলিম রাজত্বে এটি বাংলার রাজধানী ছিল। জৈন আচরাঙ্গসূত্রে বলা হয়েছে রেশমের পোষাকের জন্য গৌড় বিখ্যাত। আবার কেউ কেউ বলেন, গুড় থেকে গৌড় নামটি এসেছে। এটি গুড়ের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বর্তমান মালদহ শহরের ১০ মাইল দূরে রয়েছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। এটি একটি প্রাচীন নগর—গঙ্গা ও মহানন্দার সংগমে অবস্থিত ছিল। মহাকাব্যে ও পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। পদ্মপুরাণ বলে গৌড়দেশের রাজা ছিল নরসিংহ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এটি ছিল দেবপাল, মহেন্দ্রপাল, আদিশূর, বল্লাল সেন এবং মুসলমান শাসকদের। এটি ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পাল শাসকদের রাজধানী রামাবতীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এটি বর্তমান ধ্বংসাবশেষের অনেক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীর তীরে ছিল। লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক নির্মিত লক্ষ্মণাবতী পরবর্তী কালে গৌড়ের রাজধানী ছিল। সেন ও মুসলমান শাসকেরা এখানে রাজত্ব করতেন। বর্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন রামকেলী। চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন। রাজা বল্লালসেন গৌড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। নাম বল্লালবাদী বা বল্লালভিটা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ শাহদুল্লাপুরে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের সর্ববৃহৎ সরোবর তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত।

রূপ সনাতনের বাসগৃহ। রূপসাগর সরোবর, কদম্ব গাছ, কিছু কুয়া, কিছু মুসলমানীয় স্থাপত্য কীর্তিও এখানে রয়েছে। যেমন সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ, কদমরসুল মসজিদ এবং ফিরোজ স্তম্ভ। এছাড়া মন্দির রয়েছে, গৌড়েশ্বরী, জহুরবাসিনী শিব ইত্যাদি। এই ধ্বংসাবশেষের কাছে খলিমপুর বলে একটি গ্রামে রাজা ধর্মপালের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বে সর্বপ্রথম গৌড় শব্দটি পাওয়া যায় ৫৫৪ খ্রিঃ হরাহা লিপিতে। বলা হয়েছে, মৌখরী বংশের রাজা ঈশ্বরবর্মণ গৌড় এবং গৌড় দেশকে জয় করেছেন। লক্ষ্মণসেনের এক তাম্রশাসনেও গৌড় কথাটি রয়েছে। রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের দেওলী লিপিতে গৌড়ের অধিবাসী এবং রাজাদের হেনস্তা করার কথা রয়েছে। গৌড় কথাটি রয়েছে আদিত্যসেনের অফশাদ লিপিতে (৬৪৫ খ্রিঃ)। দেখা যায় ঐ লিপির খোদাইকারী সূক্ষ্ম শিব গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। কামরূপের বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে গৌড় অধিপতির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের মাধাই নগর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যৌবনে তিনি কলিঙ্গকুমারীদের উপভোগ করতে ভালবাসতেন। নাগপুরলিপিতে দেখা যায় মালবের শাসক পারমার রাজা লক্ষ্যদেব গৌড়ের রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন। অমোঘবর্ষের সঞ্জন দানপত্র বলে, ধ্রুব রাজকীয় ছাতা নিয়ে গঙ্গা-যমুনার পথে পালিয়েছিলেন।

রাজ্যবর্ধনের উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মণের সঙ্গে সন্ধি করেন। কামরূপ রাজার পিতা সুস্থিতবর্মণ মৃগাঙ্কমহাসেনগুপ্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ভাস্কর বর্মণের নিদানপুরের তাম্র শাসন অনুযায়ী ও ভাস্কর বর্মণের চুক্তি গৌড়ের পক্ষে শুভ হয়নি। যখন এই তাম্রশাসন প্রস্তুত হয় তখন ভাস্করবর্মণ গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণপুর অধিকার করেছেন। ভাস্করবর্মণ শশাঙ্ককে নয়, জয়নাগকে উৎখাত করেছিলেন।

গৌতম-আশ্রম : রামায়ণ ও যোগিনীতন্ত্রে কথিত আছে ঋষি গৌতম ও স্ত্রী অহল্যা দীর্ঘদিন তপস্যা করেন। স্থানটি জনকপুরার কাছে ছিল। কেউ বলেন, গোন্ডায়। গৌতম ন্যায়দর্শনের লেখক। বিশ্বামিত্র জনক রাজার প্রাসাদে যাবার পথে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। সেখানে বিশ্বমিত্র গৌতমের অভিশাপে অহল্যার পাষাণ হয়ে যাবার কাহিনী বলেন। কিন্তু সেই দুঃখময় ঘটনার পর আশ্রম ছেড়ে গৌতম চলে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হন। তাই রাম এই আশ্রমকে পরিত্যক্ত পেয়েছিলেন।

গয়া : যোগিনীতন্ত্র ও মহাভারতে এই পবিত্র নগরীর উল্লেখ রয়েছে। গয়া বর্তমানে উত্তরে সাহেবগঞ্জ এবং দক্ষিণে প্রাচীন গয়া নিয়ে গঠিত। এখানে গয়াসুর তপস্যা করে ছিলেন। এখানে এক অক্ষর বট ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে গয়া একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। গয়াই বায়ুপুরাণের গয়াপুরী।

৫ম শতকে ফাহিয়েন পরিদর্শন কালে এই নগরটি শূন্য দেখেছিলেন। কিন্তু ৭ম শতকে হিউয়েন সাঙ বিপরীত চিত্র দেখেন।

অবশ্য অধিবাসীর সংখ্যা নগণ্য। ১০ হাজারের মতো ব্রাহ্মণ পরিবার রয়েছে। শহরের ৫/৬ লী দূরে গয়া পর্বত। ঐ পাহাড়ের মাথায় অশোক নির্মিত ১০০ ফুট উঁচু পাথরের এক স্তূপ রয়েছে। বুদ্ধ গয়া এখান থেকে ৬ মাইল দূরে।

গয়াশিস : গয়াশিস গয়ার প্রধান পাহাড়। আধুনিক ব্রহ্মযোনী। মহাভারত ও পুরাণ

বর্ণিত গয়াশিরাব সমতুল্য। গয়া শহরের দক্ষিণে ৪০০ ফুট উঁচু এক পাহাড় গয়াশিরা। অগ্নি পুরাণে একে তীর্থক্ষেত্র বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবদত্ত এই পাহাড়ে ৫০০ জন ভিক্ষুর সঙ্গে বাস করেছিলেন। এইখানে অবস্থান কালে তিনি বলেছিলেন যে বুদ্ধের শিক্ষা ভুল। তিনিই সঠিক। অজাতশত্রু দেবদত্তদের পুণ্যে এই পাহাড়ে একটি বিহাব নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁদেব খাদ্য সরবরাহ করতেন। হাতির মাথার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্যে গয়াশিরা নাম।

ঘোস্রবান : বিহারের ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এই গ্রামটি অবস্থিত। এটি একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এখানে অনেক ঢিবি রয়েছে। দেবপাল সমর্থিত বীরদেব এখানে একটি মন্দির নির্মাণ কবেন।

গিঞ্জকাবসথ : এটি পাটলিপুত্রের কাছে নাদিকায় অবস্থিত।

গিরিব্রজ : বসু কর্তৃক নির্মিত বলে নাম ছিল বসুমতী। এটি মগধেব পূর্বতন রাজধানী রাজগৃহ বলেও পরিচিত।

গোধগ্রাম : দামোদরে তীরে গোহগ্রামকে চিহ্নিত করা হয়।

গোকুল : বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানের কাছে একটি গ্রাম।

গোদ্রুমা : বারিপদার যাদুঘরে দেবানন্দদেবের এবং অন্যান্য চারটি তাম্রশাসনে গোদ্রমা কথাটির উল্লেখ রয়েছে। মনে হয় কেতুলের সংকশোভর তাম্রশাসন বর্ণিত অষ্টাদশটবিরাজ্য (আঠারটি বন রাজ্য) একই।

গোপিকা : এটি নাগার্জুনী পাহাড়ের সবচেয়ে বড় গুহা, এটি ৪০ ফুট লম্বা ও ১৭ ফুট চওড়া। ৪ ফুট উঁচু ছাদ। দরজার কাছে ছোট্ট এক জায়গায় লেখা রয়েছে, দশরথ (মৌর্য) সিংহাসনে আরোহণ করে আজীবকদের এই গুহা দান করেছেন।

গোরাথগিরি (গোরাধগিরি) : এটি আধুনিক বারবারা পাহাড়। এটি মহাভারতে উল্লিখিত। কেউ কেউ বলেন, পাষাণকাচেতিয়ই এই গোরাথগিরি বা কাছাকাছি অন্য কোনও পাহাড়। উড়িষ্যার খারবেল এই গিরি জয় করে মগধের দিকে এগোন। জৈন নিশিথচুর্ণীতে এই পাহাড়কে গোরাগিরি বলা হয়েছে।

গোসিংগশালবন : নাদিকার কাছে এক বনাঞ্চল।

গোতমক : এটি বৈশালীর একটি চৈত্য।

গোবিন্দপুর : গয়া জেলার নওদা সাবডিভিশনে অবস্থিত। এখানে কবি গঙ্গাধরের একটি উৎকীর্ণ লিপি রয়েছে।

গৃহ্যকূটপর্বত : রাজগৃহকে ঘিরে থাকা পাঁচটি পাহাড়ের একটি। শিখরে শকুনীরা থাকত বলে এইরকম নাম। কানিংহাম বলেন, গৃহ্যকূট শৈলগিরির অংশ। ফাহিয়েনের শকুনী শৃঙ্গ এবং তা রাজগিরির ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। এই পাহাড়ের মাথা থেকে পাথর ছুঁড়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন দেবদত্ত। বুদ্ধের প্রিয় ছিল এই পাহাড়টি।

গুপ্তেশ্বর : শেরগড়ের ৮ মাইল দূরে কাইমুর মালভূমিতে অবস্থিত গুহাগুলি।

হদুবক : পূর্বদেশের গঙ্গদের প্রাপ্ত এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, গঙ্গ গুণার্ণবের পুত্র মহারাজা দেবেন্দ্রবর্মণের পুষ্য-পাঞ্চালী জেলায় এই গ্রামটি পতঙ্গশিবাচার্য নামে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছে।

হাজো : অসমের কামরূপ জেলার একটি গ্রাম। গুয়াহাটি থেকে ১৫ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রে তীরে অবস্থিত। স্থানটি একটি শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

হরিকেল : কেউ কেউ বঙ্গকে হরিকেল বলে চিহ্নিত করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি সমতট ও ওড়িশার উপকূলবর্তী অংশ। আর একদল বলেন, এটি বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার অংশ। আইসিং-এর মতে দুজন চীনা তীর্থযাত্রী হরিকেল পরিদর্শন করেন। তারা দক্ষিণ সমুদ্রপথ দিয়ে এসেছিলেন। তাই মনে হয় হরিকেল এক আভ্যন্তরীন দেশ ছিল। তাম্রলিপ্তির উত্তর থেকে ৪০ যোজন দূরে ছিল। মেঘনা নদীর পশ্চিমাংশ জুড়ে ছিল এর অবস্থান। কর্পূরমঞ্জরী অনুসারে এটি পূর্বভারতে অবস্থিত ছিল।

হত্তিগাম : এটি বজ্জিদের দেশে ছিল। বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে কুশীনারা যাবার পথে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে যান।

হিরণ্যপর্বত : কানিংহামের মতে পাহাড়টি গঙ্গার তীরে ছিল। প্রাচীনেরা এটিকে মহাভারত বর্ণিত মোদাগিরি বলে জানতেন। এটি আধুনিক মুঙ্গেরের মুদ্গলগিরি বলেও পরিচিত ছিল।

ইছামতী : বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্যতম প্রাচীন নদী। এটি ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বয়ে গেছে।

ইন্দকূট : এটি রাজগৃহের একটি পাহাড়। এই পাহাড়ের প্রাগৈতিহাসিক যক্ষ ইন্দকের আবাস ছিল। মনে হয় পাহাড়টি গৃহ্যকূটের বিপরীতে বা পাশে ছিল।

ইন্দশাল গুহা : ভারহূত 'জাতক লেবেল নং ৬-এ' এই গুহার উল্লেখ রয়েছে। গুহার সামনে একটি ইন্দশাল গাছ থাকার জন্যে এই নাম।

ইশিগিলিপশ্‌স : এটি রাজগৃহকে বেষ্টনকারী পঞ্চ পাহাড়ের একটি। মহাভারত একে ঋষিগিরি বলেছে। বুদ্ধ রাজগৃহে এই পাহাড়ে বাস করতেন।

ইটখোরি : চম্পারণ থেকে ১০ মাইল দূরে। এটি হাজারীবাগের অবহেলিত এক জায়গা যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্তি সব ছড়িয়ে রয়েছে। মহেন্দ্রপালের এক লিপি ও তারার একটি মূর্তি পাওয়া গেছে।

জহ্নু-আশ্রম : ভাগলপুরের পশ্চিমে সুলতানগঞ্জে ঋষি জহ্নুর আশ্রম ছিল। জহ্নুমনি তার জঙ্ঘা কেটে গঙ্গাকে নির্গত করে দেন। তাই গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী।

জয়ন্তিয়া : বরেইল পর্বতশ্রেণির পূর্বে এই পাহাড় অবস্থিত। এটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে সুর্মা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

জপ্পা : শোণের তীরে হোসেনাবাদ নামে ছোট্ট পরগণাটি চিহ্নিত।

জয়পুরা : দেবেন্দ্রদেবের বারিপদা যাদুঘরের তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। ওড়িশার নন্দ পরিবারের রাজধানী ছিল। ঢেনকানালের বর্তমান জয়পুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জীবক-আম্রবন : রাজগৃহে জীবকের বাসস্থানের কাছে এক আম্রকুঞ্জ। এটি জীবক বুদ্ধসঙ্ঘকে দান করেছিলেন।

ঝামটপুর : কাটোয়ার ৪ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসস্থান।

কৈলান : সমতটের শ্রীধন রাটের নতুন কৈলান তাম্রশাসনে এই গ্রামটির কথা

উল্লেখ রয়েছে। এটি ত্রিপুরার চান্দিনা থানার অন্তর্গত।

কজঙ্গল : এই পাহাড়ি অঞ্চল অঙ্গ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে কজনজঙ্গল গ্রামে নাগসেন জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ একবার কজনজঙ্গলের বেণুবনে বাস করেন। এটি রাজমহল জেলার কোথাও অবস্থিত ছিল। কেউ এটিকে রাজমহলের ১৬ মাইল দক্ষিণে কাংকজোল বলে চিহ্নিত করেন। গঙ্গা গতিপথ পাল্টাবার আগে জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি ঢোড়মলের ভাড়ার তালিকায় ছিল। এটি পূর্ব দেশের পশ্চিম সীমান্ত রচনা করেছিল। এর দক্ষিণ পূর্বে সাললাবতী বলে একটি নদী ছিল।

কলন্দকনিবাপ : এটি রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধ এখানে বাস করেছিলেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধকে বেণুবন দান করেন।

কলবাড়গাম : এটি মগধের একটি গ্রাম। এখানে মোগ্গল্যায়ন অর্হৎপদ প্রাপ্ত হন।

কালুহা বা কাউলেশ্বরী পাহাড় : হাজারীবাগ জেলার হান্টার গঞ্জ থানার একটি গ্রাম।

কপিল আশ্রম : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। বৃহৎ ধর্মপুরাণেও এর উল্লেখ করেছে। গঙ্গার মোহনায় সাগরদ্বীপে এই আশ্রম।

কর্ণগড় : ভাগলপুর জেলার ভাগলপুর শহরের কাছে একটি পাহাড়। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির রয়েছে।

করতোয়া : এটি ব্রহ্মপুত্রের এক শাখা নদী। পদ্মপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে পবিত্র এই নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে।

কর্ণফুলি : কৈইনচা নামে পরিচিত এই নদীটি চট্টগ্রামের তিনটি প্রধান নদীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ। এই লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রাম পাহাড়কে যুক্ত করেছে। রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকটি ছোট উপনদী এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রাঙামাটি পর্যন্ত এটি নাব্য।

কর্ণসুবর্ণ : নিধানপুর তাম্রশাসন প্রকাশকালে গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের অধীনে ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার পশ্চিম ভাগে রাঙা মাটিতে কর্ণসুবর্ণপুর ছিল বলে মনে করা হয়। হিউয়েন সাঙ ৭ম শতাব্দীতে স্থানটি পরিদর্শন করেন। এখানে কিছু সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির ছিল। দশটির বেশি বিহার এবং ২০০০ এর বেশি ভিক্ষু বাস করত। এখানে কুষাণ ও গুপ্তযুগের বেশ কিছু মুদ্রা এবং ঠাকুরবাড়ি ডাঙা, রাজবাড়ি ডাঙা, সন্ন্যাসী ডাঙা ইত্যাদি জায়গায় ইঁট মাটির কিছু ঢিবি পাওয়া গেছে। আট হস্তবিশিষ্ট একটি মহিষমর্দিনী মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

করুষ : রামায়ণ অনুসারে করুষ দেশ বিহারের সাহবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শোণ ও কর্মনাশার মধ্যবর্তী উত্তর সাহবাদকে বলা হত করুষদেশ। মাসারে আবিষ্কৃত একটি লিপি থেকে এই তত্ত্ব সমর্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে, কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধে এরা কৌরব পক্ষে ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, করুষ দেশের হাতিরা, অঙ্গ ও কলিঙ্গের হাতিদের চেয়ে নিম্নমানের।

কশ্যপকাশ্রম : এটি রাজগৃহে অবস্থিত ছিল।

কৌশিকী : কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের নিধানপুর ঘোষণা পত্রে এর উল্লেখ

রয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, বরাহপুরাণ, এবং পদ্ম পুরাণে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। কালিকাপুরাণ বলেছে, মহাকৌশকী হিমালয় থেকে উদ্ভূত। কুমারসম্ভবে মহাকৌশকীর উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্রীহট্টের কুশিয়ারা নদীটিকে চিহ্নিত করা হয়। হান্টার বলেছেন, কুশি বা কৌশকী পূর্বে করতোয়ার সঙ্গে মিশত। পরে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে।

কাদম্বরী : চম্পার কাছে একটি বন। এর কাছে কালি বলে একটি পাহাড় ছিল। এখানে কালিকুণ্ড বলে এক সরোবরের কাছে পার্শ্বনাথ চারমাস ধরে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন।

কালশিলা : ঋষিগিরির ঢালে কালো রঙের এক পাহাড়। এই পাহাড়ে গোধিক ও বক্ক আত্মহত্যা করেছিল। মনে হয় এটি জৈন উবাসগদশাও-এর গুণশিলচৈত্য।

কালনা : বর্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি পবিত্র স্থান। এটি বিখ্যাত বৈষ্ণব সূর্য-দাস, গৌরী দাস, জগন্নাথ দাস এবং ভগবান দাসের আবাস ভূমি। এটি অম্বিকা কালনা বলেও পরিচিত।

কামরূপ : উত্তর ভুটান, পূর্বে দরং ও নওগং জেলা, দক্ষিণে খাসি পর্বতমালা এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া। মধ্যবর্তী এই অঞ্চল কামরূপ। একে প্রাগজ্যোতিষ ও বলা হত। এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপিতে একে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাইরে এক সীমান্তবর্তী দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর বা আধুনিক গুয়াহাটি। প্রাচীন কামরূপ করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যোগিনীতন্ত্র অনুসারে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যোগিনীতন্ত্র অনুসারে, সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যতা, রংপুর ও কোচবিহার, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, পশ্চিম অসম, এবং মৈমনসিং ও শ্রীহট্টের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। বৈদ্যদেবের কামাউলি দানপত্রে যে গ্রামটি দান করা হয়েছিল—সেটি কামরূপ মণ্ডলে এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তিতে অবস্থিত ছিল। কামরূপের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন। একাদশ শতাব্দীর সিলিমপুর লিপিতে দেখা যায়, কামরূপের রাজা জয়পাল বরেন্দ্রীর এক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন। দেওপাড়া এবং মাধাইনগরের তাম্রশাসনে দেখা যায়, বিজয় সেন ও লক্ষ্মণ সেন কামরূপ জয় করেছিলেন। ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে আমরা দেখি, রাজা বজ্রবর্মণ কামরূপের রাজার শক্তি খর্ব করেন। কামরূপকে প্রাগজ্যোতিষ বলা হলেও রঘুবংশে একে পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয়েছে। ১৯১২ সালে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের গ্রাম নিধানপুরে কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলিতে দেখা যায়, কর্ণসুবর্ণপুর থেকে কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মণ এক ব্রাহ্মণকে কিছু জমি দান করেছেন।

হিউয়েন সাঙ কামরূপকে বলতেন কিয়া-সো-লিউ-পো। এটি পুণ্ড্রবর্ধনের ৯০০ লী (১৫০ মাইল) দূরে ছিল। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল না। অনেক দেবমন্দির ছিল। কামরূপ সম্ভবত অশোকের ধর্ম প্রচারের বাইরে ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে ভাস্করবর্মণের মৈত্রী ছিল। ভাস্করবর্মণের পিতা সুস্থিতবর্মণমৃগাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল কামরূপ জয় করেন। এটি পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কামাখ্যা : এটি আসামের একটি তীর্থস্থান। প্রাচীনকালে গুয়াহাটি কাছে শিবের স্ত্রী

শক্তির মন্দির বিখ্যাত ছিল। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে নরক প্রাগজ্যোতিষপুর নির্মাণ করেন। নরকের পুত্র ভগদত্ত দুর্যোধনের মিত্র ছিল। পুরাণ মতে শক্তি বা সতীর যোনিদেশ পড়েছিল কামাখ্যায়।

কামতাপুর : কুচবিহার শহরের ১৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এটি এখন ধ্বংসাবশেষ, বিখ্যাত কামতেশ্বরী মন্দিরটি পাঠানের ধ্বংসা করে।

কেদারপুর : বাংলাদেশের ফরিদপুরের পালং পুলিশ থানার একটি গ্রাম। শ্রীচন্দ্রদেবের একটি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গেছে। তাম্রশাসনটিতে একটি ধর্মচক্র এবং তার দুপাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা হরিণের মূর্তি খোদাই করা আছে।

কেন্দুলী (কেন্দুবিল্ব) : এটি বীরভূম জেলায় অজয় নদীর তীরে সুরি সাব-ডিভিশনের একটি গ্রাম। এটি সংস্কৃত কবি জয়দেবের জন্মস্থান (দ্বাদশ শতক)। এখানে জয়দেবের মন্দির আছে। মন্দিরটি বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ বাহাদুরের মা নির্মাণ করান। প্রতি বছর এখানে একটি মেলা বসে।

কেরকেরা : খিচিং এর ১২ মাইল দূরে আদিপুর পরগণার একটি গ্রাম।

কেশিপুর : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

খড়দহ : ব্যারাকপুরের কাছে হুগলী নদীর তীরে এটি অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যের প্রধান শিষ্য নিত্যানন্দ এখানে কিছুকাল বসবাস করেন।

খালটিক পাহাড় : গয়া জেলার আধুনিক বারাবার পাহাড়। এখানকার গুহায় অশোকের উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায় যে তিনি চারটি গুহা আজীবকদের দান করেন। খালটিকে (টাক মাথা) পাহাড়ের পরবর্তী এক লিপিতে দেখা যায়, গোরাথগিরি এবং এরও পরবর্তীকালে এর নাম হয়েছে প্রবরগিরি। বারাবার পাহাড়ের সাতঘরা এবং নাগার্জুনী গুহাগুলি অশোক ও তাঁর দৌহিত্র দশরথের সময়কার। পাটনা-গয়া রেল লাইনের বেলা স্টেশনের ৭ মাইল দূরে। পাহাড়ের পাদদেশের দক্ষিণে সাতটি খোদাইকরা গুহা রয়েছে—নাম সাতঘরা। এই সাতটি গুহার তিনটি নাগার্জুনী পাহাড়ে।

খণ্ডজোতিক : বর্ধমান জেলার মল্লসারুল ও গোহ গ্রামের মধ্যবর্তী খণ্ডজুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

খড়গপুর পাহাড় : মুঙ্গের শহরের দক্ষিণে একটি পাহাড়মালা রয়েছে। এই পাহাড় গুলি বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর ভাগেরই গজিয়ে ওঠা একটি অংশ—লম্বায় ৩০ মাইল।

খাসিয়া : গারো পাহাড় দেখুন।

খাড়ি : দ্বাদশ শতকের সেন তাম্রশাসনে খাড়িবিষয় ও খাড়ি মণ্ডলের উল্লেখ রয়েছে। খাড়িকে ডায়মন্ড হারবার সাব ডিভিশন বলে চিহ্নিত করা যায়।

খালিমপুর : মালদা জেলার গৌড়ের কাছে। এখানে ধর্মপাল দেবের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

খানুমত : রাজা বিম্বিসারের দান করা মগধে একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এখানে একটি বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দানটি দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে। বাৎসরিক এখানে প্রচুর পশুবলি হত।

খেতুর : রাজশাহী জেলার এই গ্রামটি শ্রীচৈতন্য ১৬ শতকে পরিদর্শন করেন।

তাঁর আগমনকে সম্বর্ধিত করার জন্যে এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়।

কিরাতদেশ : রঘুবংশে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব-উপত্যকায় অবস্থিত ছিল কিরাত দেশ। টলেমির মতে এটি ছিল উত্তরাপথে। তবে পূর্বদেশেও তাদের আবাসস্থল ছিল। কিরাতদের দেশকে টলেমি বলেছেন কিরহদিয়া। শ্রীমদভাগবতে বলা হয়েছে এটি আর্য রাজ্যের বাইরে ছিল।

কোলহুয়া : বসরার সিংহ লাঞ্ছিত স্তম্ভের ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপ।

কোলিকগাম : নালন্দা বিহারের ৯ লী (১$\frac{১}{২}$ মাইল) দূরে অবস্থিত সারিপুত্তের সঙ্গে গ্রামটি জড়িত। এই গ্রামে মোদগল্লায়ন জন্মেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন।

কোল্লাগ : কুণ্ডপুরার এক শহরতলি। এখানে মূলত ন্যায় বা জ্ঞাত্রী গোষ্ঠী বসবাস করত। মহাবীর এই গোষ্ঠীর লোক ছিলেন।

কোটিগাম : বজ্জিদের একটি গ্রাম। বুদ্ধ রাজগৃহ থেকে কুশিনারা যাবার পথে এই গ্রামের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন।

কোটিশিলা : মগধের একটি তীর্থস্থান।

কোটিবর্ষবিষয় (জৈন— কোড়িবরিষ বা কেড়িবরিষিয়া) : এটি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি মহকুমা বলে কথিত। সেন ও পাল রাজাদের যুগে এই নামটি প্রায়ই এসেছে। এটি অংশত বা সমগ্র দিনাজপুর নিয়ে ছিল। বাণগ্রাম বা আধুনিক বাণগড়—কোটিবর্ষের প্রধান নগর ছিল। জৈন আবশ্যকনিরুক্তিতে বলা হয়ছে কোটিবর্ষের রাজা চালিয় জৈন সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। দিনাজপুরের ১৮ মাইল দূরে গঙ্গারামপুরের দেড় মাইল উত্তরে পনর্ভবা নদীর পূর্ব তীরে রামগড়ের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গঙ্গারামপুরকে বেষ্টনকারী অঞ্চলটিতে কোটিকপুরা বা প্রাচীন দেবকট অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, দৈত্য বাণের দুর্গ শহর বাণগড়, তাঁর রানী কালোরানী গঙ্গোরামপুরে কালো দীঘি বলে এক জলাশয় খনন করেছিলেন। রামগড়ে মহীপালের (প্রথম) তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। বুধগুপ্ত ও জয়দত্তের সময়কার দামোদরপুর দানপত্রে দেখা যায়, ডোঙা নামে একটি গ্রাম পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ববিষয়ের হিমবচ্ছিখারতে (অর্থাৎ, হিমালয়ের শৃঙ্গে) অবস্থিত ছিল। রামগড়ে অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে।

কোট্যাশ্রম : বারিপাদার ৩২ মাইল দূরে কুটিংকে বশিষ্ঠের আশ্রম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কৌঞ্চস্বভ্র : ধর্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত দান করা একটি গ্রাম। একটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ব্যাঘ্রতটিমণ্ডলের মহান্তপ্রকাশ জেলায় অবস্থিত ছিল।

কৃনিল : সমুদ্রগুপ্তের নালন্দা তাম্রশাসনে এই বিষয়টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দেবপালের মুঙ্গের দানপত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে এটি শ্রীনগরভুক্তি বা পাটনাভুক্তিতে অবস্থিত ছিল।

কৃপা (কুপা) : পূর্ব ভারতে বাবলার উপনদী কোপা চিহ্নিত।

কুক্কুটপাদগিরি (গুরুপাদ গিরি) : স্টেইন এটিকে সোভনাথ পাহাড়ে অবস্থিত বলে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ আবার এটিকে বোধগয়ার ১০০ লী পূর্বে গুরুপাদ

পাহাড়টিকে চিহ্নিত করেছেন। মহাকাশ্যপ এই পাহাড়ে বসবাস করতেন।

কুক্কুটরাম : এই বিহারটি পাটলিপুত্রে ছিল।

কুলঞ্চ : এই শহরটির পত্তন করেন ঋষি কাচর বা কোলাঞ্চ, ক্রোদাঞ্চি, ক্রোদাঞ্চ-এর সমতুল। এই স্থানটি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের অধিকারে ছিল। আদিশূরের আহ্বানে এই কোলাঞ্চ থেকে এদেব পাঁচজন পূর্বজ বঙ্গে এসেছিলেন যাগযজ্ঞ করার জন্যে। স্থানটি গঙ্গার তীরে ছিল।

কুলুহা পাহাড় : হান্টার গঞ্জের ছ'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু মন্দির আছে।

কুমারী : মানভূম জেলার আধুনিক কুমারী নদীটিকে চিহ্নিত করা হয়।

কুম্ভীনগর : বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কুম্ভীরকে চিহ্নিত করা হয়।

কুণ্ডপুরা : মহাবীররের জন্মস্থান বৈশালীর শহরতলির ক্ষত্রিয়কুণ্ডগ্রাম বা আধুনিক বসুকুণ্ড বলে চিহ্নিত করা হয়।

লক্ষ্যা : যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে লক্ষ্যা সংগম। ঢাকা জেলার লক্ষ্যা একটি সুন্দর নদী। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তিনটি শাখা নদী থেকে এর উৎপত্তি। মদনগঞ্জে এটি ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশেছে।

লম্বেব : উড়িষ্যার নরসিংহপুরের লিম্বু চিহ্নিত হয়েছে।

লট্ঠিবন : গয়া জেলার তপোবনের দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। বুদ্ধঘোষ বলেছেন এটি একটি তালবন। এখানে বুদ্ধ বিম্বিসারকে দীক্ষিত করেন। এটি রাজগৃহ নগরের বাইরে ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এটি একটি পাহাড়কে ঘিরে ঘন বাঁশের জঙ্গল। এর ১০ লী দূরে দুটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল।

লৌহিত্য : ব্রহ্মপুত্র দেখুন।

লৌরিয়-নন্দনগড় : চম্পারণ জেলার বেতিয়ার ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে গণ্ডক উপত্যকার একটি গ্রাম—অশোক স্তম্ভের জন্য বিখ্যাত। নেপাল সীমান্তে যাবার দুটি পথের মিলনস্থল ছিল। প্রাচীনকাল এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

লোহিত : সাদিয়া জেলার ব্রহ্মপুত্রে এক বড় উপনদী লোহিত বা লৌহিত্য। এই নদীটি প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ-এর সীমারেখা রচনা করেছিল।

লুপচুরা : উড়িষ্যার পাটনার লিপতুংগাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ বা বলেন, এটি উড়িষ্যার বোলাঙ্গিরের লেপতা।

লুসাই : মণিপুর রাজ্য থেকে দক্ষিণে প্রসারিত লুসাই পর্বতমালা।

মচল গাম : মগধের এই গ্রামে সূর্য ও চন্দ্র দেবতার পুজো হত। বুদ্ধের অনেক পূর্বে এটি একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল।

মদ্দকুচ্ছি-মিগদায় (মিগদাব) : রাজগৃহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৃগ উদ্যান।

মগধ : মগধের প্রতিশব্দ কিকাট। যাস্কের মতে এটি অনার্যদের দেশ। জিমারেরও একই অভিমত। ওয়েরার বলেন, কিকাটরা আর্য-ই—মগধে বাস করত। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে এর উল্লেখ রয়েছে। দশকুমারচরিতে বলা হয়েছে। মগধরাজ মালবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। রঘুবংশে জানা যায়, রাজা দিলীপের মগধ

রাজপরিবারে সুদক্ষিণা নামে এক বিবাহিত স্ত্রী ছিল। কালিদাস বলেছেন, মগধের রাজধানী পুষ্পপুরা। অশোকের ভারবু শিলালিপিতে এবং ভাগবতপুরাণে মগধের উল্লেখ রয়েছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভূগোলে মগধ পূর্বদেশে নয়—মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল।

খারবেল মগধ আক্রমণ করেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরই মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত মগধের স্থানে স্থানে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। এর পরবর্তী সময়ে আদিত্য সেন মগধ ও মধ্যদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ৮ম শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ের পাল বংশীয় রাজা গোপাল মগধ জয় করেছিলেন।

মহাদেব : হিউয়েন সাঙের মতে এটি একক দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট ছোট একটি পাহাড়। অনেকের মতে এটি হিরণ্যপর্বতের পশ্চিম সীমান্তে ছিল।

মহানদী : যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত মহানদী উড়িষ্যার বৃহত্তম নদী। এটি কটক শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।

মহাস্থান : শুঙ্গযুগেব পোড়ামাটির এক দেবী মূর্তি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে। একটি নালা খোঁড়বার সময় এটি উদ্ধার হয়। মহাস্থান বাংলাব অন্যতম প্রাচীন নগরসভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিচিত যা দ্বিতীয় খ্রিঃ পূঃ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ছোট বেলে পাথরের ওপর তৃতীয় খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের ব্রাহ্মী অক্ষরে এক লেখা থেকে সমর্থিত হয় যে মহাস্থানই পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন ছিল। কানিংহাম আগেই একথা বলেছিলেন।

মহাবন : বৈশালীর বাইরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত এক বনভূমি।

মহাবন-বিহার : বজ্জি দেশে মহাবনের একটি বৌদ্ধ বিহার। ফা-হিয়েন এর উল্লেখ করেছেন।

মৈনামতী : রণবনকমল্ল হরিকালদেবের শক ১১৪১ ময়নামতী তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এই ময়নাবতী পাহাড় কুমিল্লা শহরের ৫ মাইল দূরে। তাম্রশাসনটি কেবলমাত্র ময়নামতী পাহাড়ের উল্লেখ করেছে। লালমাইয়ের নয়। ১০/১৬ শতকে বাংলার শাসক চন্দ্রবংশের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ময়নামতী। রানী এবং তাঁর পুত্র গোপিচন্দ্রের বাংলার লোকসঙ্গীতে এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রানী সম্ভবত গোরখনাথের শিষ্যা ছিলেন এবং পুত্র কোনও নিম্নজাতের সিদ্ধপুরুষের শিষ্য। ত্রিপুরার একটি গ্রাম যার নাম এখনও পাটিকারা বা পৈতকারা ময়নামতী পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। ৮ম শতাব্দীতে পট্টিকেরা বলে একটি রাজ্য ছিল। ময়নামতীতে অনেক প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে। পট্টিকেরক বিহার পালযুগে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন জৈন তীর্থঙ্করের নগ্নমূর্তি প্রমাণ করে এখানে জৈন ধর্মেরও প্রভাব ছিল। গণেশ, হরগৌরী বাসুদেবের মূর্তি হিন্দু প্রভাবের কথা বলে। বুদ্ধের ছোট ছোট কয়েকটি ব্রোঞ্জমূর্তিও পাওয়া গেছে। প্রাপ্তমুদ্রায় পাটিকেরা নাম রয়েছে।

মকুলপর্বত : বুদ্ধগয়ার ২৬ মাইল দক্ষিণে কলুহা পাহাড়টিকে চিহ্নিত করা হয়। এখানে প্রচুর বৌদ্ধপ্রত্ন ও বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁর ষষ্ঠ বর্ষা ঋতু এই পাহাড়ে অতিবাহিত করেছিলেন।

মল্লপর্বত : এটি হাজারীবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়। এটি গ্রিকদের ম্যালিয়ুস পাহাড়। এটি সমেতশিখর, সমিদগিরি ও সমাধিগিরি নামেও পরিচিত।

মল্লসারুল : দামোদর নদীর উত্তর তীর থেকে দেড় মাইল দূরের একটি গ্রাম। এখানে বিজয় সেনের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

মন্দার পাহাড় : এটি মান্দারগিরি বা মান্দারাচলম নামেও পরিচিত। কালিকা পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। শিবের কাছে এটি পবিত্র পাহাড়—এখানে পৃথু মাঁরা যায়। এটি ভাগলপুরের বংকা সাবডিভিশনে অবস্থিত। ৭০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়। সীতাকুণ্ড নামে জলাশয়টি ১০০ ফুট লম্বা ৫০০ ফুট চওড়া। মেগাস্থিনিস ও এরিয়ান একে মল্লুস বলেছেন। এখানে বৌদ্ধ বিহার এবং মূর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

মন্দারন : এটি হুগলী জেলার একটি গ্রাম। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

মনগ্রওন : বক্সার জেলার একটি গ্রাম। এখানে বিষ্ণুগুপ্তের (১৭ খ্রিঃ) সময়কার লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

মর্কট হ্রদ : বুদ্ধ বৈশালীতে থাকার সময় মর্কট হ্রদের তীরে কূটাগারশালায় বাস করতেন। মহাবস্তুতে এর উল্লেখ রয়েছে।

মশার : আরার পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। প্রাচীন নাম মহাসার। হিউয়েন সাঙের মো-হো-সো-লো।

মেঘনা : ঢাকা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সূর্মা নদীর নাম মেঘনা। এই নদীটি সূর্মা, বরাক ও পুইনি নদীর মিলিত ধারা।

মেসিকা : দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন দানপত্রে উল্লিখিত গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে। কৃমিল জেলার শ্রীনগরভুক্তির অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম।

মেহার : বাংলাদেশের চাঁদপুর সাবডিভিশনের একটি গ্রাম। এখানে দামোদরদেবের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এটি মেহারগ্রাম নামেও পরিচিত। দামোদরদেবের মেহার তাম্রশাসনে মেহার গ্রামটিকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সমতটমণ্ডলের পারলায়িবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে।

মিশমি : অসমের উত্তর সীমান্তের পর্বতমালার একটি অংশ।

মিথিলা : বিদেহর রাজধানী ছিল। একে তীরভুক্তি বলা হত (আধুনিক ত্রিহুত)। রামায়ণ অনুযায়ী এটি রাজধানী ও দেশ। নেপাল সীমান্তের জনকপুরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদেহর রাজা জনকের সময় অযোধ্যা থেকে মিথিলায় পৌঁছতে বিশ্বামিত্রের ৪ দিন সময় লেগেছিল। রিজ ডেভিসের মতে, এটি বৈশালীর ৩৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। ভবিষ্যপুরাণ অনুযায়ী নিমির পুত্র মিথি এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। নগরটির জন্মদাতা বলে তিনি জনক নামে পরিচিত হন। জনকের কন্যা সীতাকে অযোধ্যার দশরথের পুত্র রাম বিবাহ করেন।

মিথিলা বর্ধমান, মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের পদধূলি ধন্য।

মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র বাংলার নদীয়ায় বহু চর্চিত ছিল। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। তিনি বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার বৈষ্ণব কবিদের পথিকৃৎ।

মোর : মোর নদী আধুনিক ময়ূরাক্ষী। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। উত্তর রাঢ়ের মধ্যে দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয়ে এটি পূর্ববাহী হয়েছে।

মোরানিবাপ : এটি সুমাগধা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি রাজগৃহে।

মুদ্গাগিরি : ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। স্যার চার্লস উইলকিনসন এটি আধুনিক মুঙ্গের বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ এটি দেবপালের রাজ্যের মধ্যে ছিল। মুদ্গাগিরি, মুদ্গালশ্রম বলেও পরিচিত ছিল।

মহাভারতে মুদ্গালদের উল্লেখ রয়েছে। ভীম যুদ্ধে মোদাগিরির প্রধানকে নিহত করে। ১০ শতকে এখানে এখানে পাল রাজাদের এক রাজকীয় নিবাস বা সৈন্যাবাস ছিল।

মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) : মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগিরথীর তীরে অবস্থিত। স্বাধীন বাংলার রাজধানী ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খান এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নগরভুক্তি : ধর্মপালদেবের নালন্দা তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক পাটনাকে চিহ্নিত করা হয়। ঐ তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি, নগরভুক্তির মধ্যে গয়া ও রাজগৃহবিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নন্দপুর : নন্দপুরার তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১৬৯) বুধগুপ্তের রচিত। এটি মুঙ্গেরের একটি গ্রাম।

নবদ্বীপ : এটি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে। রেল স্টেশন নবদ্বীপ ঘাট। ভাগিরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমের বিপরীতে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৫ খ্রিঃ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংস স্তূপ রয়েছে মায়াপুরের উত্তরে। একদা এটি সংস্কৃত চর্চার বিশাল কেন্দ্র ছিল।

নবগ্রাম : নবগ্রাম ছিল দক্ষিণ রাঢ়ে। হুগলী জেলার ভুরসুট পরগণায় একই নামের গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে। অমরেশ্বর মন্দিরে হলায়ুধ স্তোত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

নাগবন : এটি বজ্জিদের দেশে অবস্থিত ছিল।

নাগা পাহাড় : নাগা পাহাড় অসমের পূর্ব সীমান্ত রচনা করেছে।

নাগার্জুনী পাহাড় : অনন্তবর্মণের নাগার্জুনী গুহার লিপি অনুসারে এটি বিন্ধ্যপর্বতের একটি অংশ। এটি গয়ার ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

নালক গ্রাম : মগধের এই গ্রামে সারিপুত্ত মারা যান। রাজগৃহের অদূরে নালগামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জাতক অনুযায়ী সারিপুত্তের জন্মস্থানের নাম নাল। এবং এক-ই জাতকে বলা হয়েছে, তিনি বরকা গ্রামে মারা যান।

নালন্দা : মগধের রাজগৃহের উপকণ্ঠে অবস্থিত নালন্দা। নালন্দার জমিটি আসলে ছিল একটি আম্রকুঞ্জ। ৫০০ জন শ্রেষ্ঠী দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রায় তা ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধের মৃত্যু পরপরই শক্রাদিত্য নামে দেশের এক পূর্বতন রাজা বিহারটি নির্মাণ করেন।

বুদ্ধ তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় নালন্দার পাভারিক আম্রবনে কাটিয়েছিলেন। তিনি সারিপুত্র, উপালী সহ বহুজনের সঙ্গে এখানে আলোচনা করেছেন। জৈন সন্ন্যাসী দীর্ঘ তপস্বীর সঙ্গেও তাঁর এখানে আলোচনা হয়। এখানে মকখলী গোশালার সঙ্গে মহাবীরের

সাক্ষাৎ হয়। মহাবীর নালন্দার উপকণ্ঠের এক স্থানে চৌদ্দটি বর্ষা ঋতু ব্যয় করেন। তাঁর সন্ন্যাস জীবনের বেশির ভাগ সময়ই এখানে ব্যয়িত হয়। এখানে মহাবীরের একটি জৈন মন্দির আছে।

বালাদিত্যের প্রস্তর লিপিটি একটি মন্দিরের দ্বারদেশে পাওয়া যায়। নালন্দায় বুদ্ধের জন্য তিনি এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। বিষ্ণু গুপ্তের পোড়া মাটির সিলমোহরটি নালন্দা বিহারের ১ নং অবস্থানে পাওয়া গেছে। এখানে মৌখারীদের শিলমোহর পাওয়া গেছে। শাহপুরের আদিত্য সেনের প্রস্তরমূর্তিলিপি নালন্দার উল্লেখে বলে, এটি বাণপুরের কাছে। কানিংহাম আধুনিক বড়াগাওকেই শাহপুর বলে চিহ্নিত করেছেন।

নালন্দার ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গেছে, বাগীশ্বরী প্রস্তরমূর্তি লিপি। এতে দেখা যায় গোপালদেবের রাজত্বের প্রথম বছরে এক বাগীশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর পাঁচজন রাজা—শক্রাদিত্য, বুধগুপ্ত তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য এবং বজ্র নালন্দায় পাঁচটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫০ খ্রিঃ রাজানুকুল্য লাভ করে। তিব্বতীয় তথ্য অনুসারে যে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারটি ছিল তার নাম ধর্মগঞ্জ। এখানে তিনটি সুন্দর অট্টালিকা নিয়ে এটি গঠিত ছিল। ১. রত্ন সাগর ২. রত্নদধি, ৩. রত্নরঞ্জক। রত্নদধি ৯তলা উঁচু বাড়ি। এখানে ছিল প্রজ্ঞামারমিতা ও সমাজগুহ্য নামে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের পাণ্ডুলিপি। কাঞ্চিপুরের অধুনা কাঞ্চিভরমের ধর্মপাল এখানে পড়াশোনা শেষ করেন সম্মানের সঙ্গে এবং পরে তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন।

সমতট থেকে এসেছিলেন শীলভদ্র। তিনি ধর্মপালের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনিও অধ্যক্ষ হন। চিনা পরিব্রাজক আই সিং ৬৭১ খ্রিঃ যাত্রা করে ৬৭২ খ্রিঃ তাম্রলিপ্তিতে পৌঁছান। তিনি নালন্দায় বেশ কয়েক বছর বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন। হিউয়েন সাঙও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখানে ১০,০০০ ছাত্র ছিল। মহাযান পথের প্রবর্তক নার্গাজুন এখানেই বসবাস করতেন।

নান্যমণ্ডল : রামপালের শ্রীচন্দ্র তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনে ছিল।

নেহকাষ্ঠি : রামপালের শ্রীচন্দ্র তাম্রশাসন এটিকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির নান্যমণ্ডলে অবস্থিত একটি গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নেরঞ্জরা (নৈরঞ্জনা। চিনা—টি-নি-লিয়েন-ছান) : এটি ফল্গু নদী। গ্রিকেরা বলত, এর হেন্যিসিস। দুটি ধারা নিরঞ্জনা এবং মোহনার মিলিত নাম ফল্গু। হাজারীবাগে সিমেরিয়া এর উৎস। কাছেই বুদ্ধগয়া।

উরুবেলার সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত নিরঞ্জরার জল পরিষ্কার-স্বচ্ছ। এখানে অনেকগুলি স্নানের ঘাট ছিল। সুপ্পতিত্থিত একটি এমনই ঘাট। বুদ্ধত্ব লাভের দিন বুদ্ধ এই ঘাটে স্নান করেন। এর তীরে ছিল একটি বড় শালের বন। এখানে হরিণ পাওয়া যেত। নিরঞ্জরার উরুবেলা বিভাগে ছিল সেসানি গাম (বর্তমান উরেল) ও নাল গ্রাম। নাল গ্রাম বুদ্ধঘোষের জন্মস্থান।

বোধিসত্ত্ব অবস্থায় সিদ্ধার্থ এই নদী পরিদর্শন করেন। যে সোনার থালায় সুজাতা

তাকে পরমান্ন খেতে দিয়েছিল—বোধিসত্ত্ব তা এই নদীর তীরে রাখেন। নদীতে স্নান করেন। খাওয়ার শেষে থালাটি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আজ আমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই তবে থালাটি যেন নদীর স্রোতের বিপরীতে যায়।

এই নদীর তীরে এক ঘন জঙ্গল ছিল। বোধিসত্ত্ব একবার দিবা ভাগ এখানে কাটান। এই নদীর তীরে বাস করার সময় পাঁচজন সাধু তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এখানে বোধি বৃক্ষের তলায় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভের পর কিছু সময় কাটান। বিখ্যাত জটিল ভ্রাতৃদ্বয়কে সেই সময় তিনি ধর্মান্তরীত করেন। এই নদীর তীরে উরুবেলার অজপাল বোধিবৃক্ষের নীচেও বুদ্ধ কিছুকাল বাস করেন।

নিগ্রোধরাম : রাজগৃহের এক বৌদ্ধ বিহার।

নিশ্চীরা : বরাহপুরাণে এটি নিশবীর। এটি সম্ভবত কৌশিকী নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ওল্লাদ্দ : এটি উড়িষ্যার কেওনঝর জেলার দেলাং।

পলাশি : নদীয়া জেলার একটি গ্রাম। পলাশ গাছ থেকে এর নাম পলাশি। ব্রিটিশদের কাছে এখানে সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

পলাশিনী : ছোটনাগপুরের পরাস নামে কোয়েলের উপনদীটিকে চিহ্নিত করা হয়।

পঞ্চুপালী : কেওনঝর জেলার পঞ্চুপালী গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়।

পাণ্ডুয়া : এটি হুগলী জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন নাম প্রদ্যুম্ন নগর।

পরিব্বাজকারাম : উদুমবরদেবী কর্তৃক পরিব্রাজকদের জন্যে নির্মিত রাজগৃহ ও গৃহ্যকূটের বিশ্রামাগার।

পশ্চিম-খাটিকা : লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। বর্তমান হুগলী নদী দুটি খাটিকের সীমারেখা নির্দেশ করে—পূর্ব এবং পশ্চিম।

পাটকই পাহাড় : অসমের লখিমপুর জেলায় অবস্থিত পাহাড়শ্রেণি। গড় উচ্চতা ৪০০০ ফুট। এই পাহাড়ের মধ্যেকার পথই মায়নামার ও অসমের সংযোগের রাস্তা।

পটিভানকূট : গৃহ্যকূটের আশপাশের একটি পাহাড়, বুদ্ধ ঘোষের মতে এটি সীমানা রচনাকারী বড় পাথরের একটি চাঁই। এটিকে পাহাড়ের মতো দেখাত।

পট্টিকেরা : পট্টিকেরা শহরে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের জন্য বেজখণ্ড গ্রামের কিছু জমি দান করা হয়। ময়নামতী তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে।

পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি : পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রকদের নাম অনেকবার মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে। একবারই মাত্র তাদের বঙ্গ ও কিরাতদের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। আর একবার উড্র, উৎকল, মেকল, কলিঙ্গ, এবং অন্ধ্রদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ঐতেরিয় ব্রাহ্মণে এদের উল্লেখ রয়েছে; দশকুমারচরিতে বলা হয়েছে বিশালবর্মার সেনারা একবার পুণ্ড্রদেশ আক্রমণ করেছিল। সেই সময় উত্তরবঙ্গের বেশির ভাগ অংশই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ছিল এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ৪৪৩ খৃঃ থেকে ৫৪৩ খৃঃ পর্যন্ত। ভানুগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসনে জানা যায় (৫৩৩-৩৪খৃঃ) অযোধ্যার এক সম্ভ্রান্ত মানুষ স্থানীয় কোটিবর্ষের প্রশাসক শম্ভুদেবের (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে) কাছে তাঁকে যেন করহীন কিছু পতিত জমি দান করা হয়—এবং তা তাম্রশাসনের

মাধ্যমেই যেন করা হয় এরকম এক আবেদন করেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। পুন্ড্রবর্ধন হিউয়েন সাঙের পুন-না-ফা-তান-না। পার্জিটার মনে করেন, আধুনিক সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম এবং হাজারিবাগের উত্তর ভাগ পুন্ড্রদের একদা অধিকারে ছিল। প্রাচীনকালে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বলতে বোঝাত প্রায় উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র। পুন্ড্রবর্ধনের ভুক্তি মনে হয় সমস্ত বাংলাকে নিয়েই ছিল। ধর্মপালদেবের খালিমপুর দানপত্র, দেবপালের নালন্দালিপি এবং লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত ব্যাঘ্রতটি (বাতাদি) গ্রামটি বাংলার অন্যতম একটি ডিভিশন ছিল। আনুলিয়া তাম্রশাসনে বলা হয়েছে, পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ব্যাঘ্রতটির সীমার মধ্যে ভূমিখণ্ডটি দান করা হয়েছে। পাল রাজাদের তথ্যে পুন্ড্রবর্ধনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে, দেবপালের নালন্দা দানপত্রে, প্রথম মহীপালের বাণগড় দানপত্র, বিগ্রহ পালের (তৃতীয়) আমগাছিয়া দানপত্রে, মদনপালের মানহলি দানপত্রে। সেনরাজাদের বিজয়সেনের ব্যারাকপুর দানপত্রে, আনুলিয়া, তর্পণ দীঘি, মাধাই নগর, এবং লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনে, কেশব সেনের আদিলপুর তাম্রশাসন, বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া ও সাহিত্য পরিষদের তাম্রশাসনে পুন্ড্রবর্ধনের উল্লেখ রয়েছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল তাম্রশাসন, ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসন, শ্রীচন্দ্রের ধূল্লা তাম্রশাসনে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির জায়গায় পুন্ড্রভুক্তি লেখা রয়েছে। রাষ্ট্রকুট রাজা চতুর্থ গোবিন্দের সাংলি তাম্রশাসনে পুন্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি ঘাট তাম্রশাসনে বরেন্দ্রীকে পুন্ড্রবর্ধনের ভেতর দেখানো হয়েছে।

বৈদ্যদেবের কামাউলি তাম্রশাসন, দেওপারার বিষ্ণুমূর্তিলিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ করা হয়েছে।

পালযুগে (৭৩০-১০৬০ খৃঃ) পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি নিশ্চয় একটি বড় অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল এবং সেনদের সময় এটি আরও বড় অঞ্চল ছিল। এই দুই রাজবংশের তথ্যে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল : কোটিবর্ষবিষয় (দিনাজপুর), ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল (মালদা) খাড়িবিষয় (২৪ পরগণা ও সুন্দরবন), বরেন্দ্রী (প্রায় রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং দিনাজপুর) এবং বঙ্গ (ঢাকা বিভাগ)। ঐ পুন্ড্রবর্ধনে যে বরেন্দ্রী ও গৌড়ও (মালদা, দিনাজপুর) অন্তর্ভুক্ত ছিল তা ১১ শতকের পুরুষোত্তমের 'লেক্সিকোন' থেকে প্রমাণিত। এখানে বলা হয়েছে, বরেন্দ্রী ও গৌড়দেশ পুন্ড্রের অন্তর্গত। সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১ শতক) রামচরিতম থেকে মনে হয় শ্রীপুন্ড্রবর্ধনপুরা বরেন্দ্রীতে অবস্থিত ছিল। কারণ বলা হয়েছে পূর্বদেশে বরেন্দ্রী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গা এবং পুন্ড্রবর্ধনপুরা তার শিরোভূষণ, গৌড় সাম্রাজ্যের এটাই সবচেয়ে বড় অঞ্চল। দামোদরপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত এই দেশ প্রসারিত ছিল।

বর্তমান মহাস্থান বা মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের আধুনিক বগুড়া শহরের ৭ মাইল উত্তরে। কানিংহাম এই স্থানটিকে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধননগর বলে চিহ্নিত করেছিলেন।—যা বাংলার দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী এবং বগুড়া ও রংপুরের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। করতোয়া নদী এখনও জলপাইগুড়ি ও পূর্ণিয়ার সীমারেখা রচনা

করে। এই নদী এখনও মহাস্থানের পাশ দিয়ে বয়ে যায় এবং পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিকে আরও পূর্বে আমাদের প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন। তাঁর মতে এর আয়তন ছিল ৪০০০লী এবং রাজধানী ছিল ৩০লী। দ্বাদশ শতকের তৃতীয় ভাগে এই শহরটি গুরুত্ব হারায়। কারণ, সেনরাজারা তাঁদের রাজধানী প্রথমে রাজশাহীর দেওপারায় নিয়ে যান, পরে নিয়ে যান মালদার গৌড়ে। ১৩ শতকের শেষপাদে এবং ১৪ শতকের প্রথম পাদে মুসলিমরা পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করে।

পাহাড়পুর : দিনাজপুর জেলার পাহাড়পুরকে সোমপুরা বলে চিহ্নিত করা হয়। ৮০ ফুট উচ্চতার ইঁটের বিশাল ঢিবি থেকেই বোধহয় পাহাড় নামটা এসেছে। সোমপুরা বা পাহাড়পুরে ধর্মপালের নামে একটি বিহার ছিল। ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত বিহারগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়। ৮ম শতকে পালরাজারা এটি নির্মাণ করেন। রাজশাহীর রেলস্টেশন জামালগঞ্জের তিনমাইল উত্তরে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বরবুদরের বিশাল বিহার, জাভার প্রামবনাম বিহার বা কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটের মতোই বিশাল ছিল পাহাড়পুর বিহার। কথিত আছে তিব্বতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই সোমপুরা মহাবিহারে দীর্ঘকাল তাঁর গুরু রত্নাকর শান্তির অধীনে বসবাস করেছিলেন।

পালামক : দেবপালের নালন্দা দানপত্রে গ্রামটিকে গয়াবিষয়ে অবস্থিত বলা হয়েছে।

পাণ্ডুয়া : পোড়ো নামে পরিচিত স্থানটি হুগলী জেলায় অবস্থিত। মালদহের পাণ্ডুয়া থেকে এটি আলাদা। ১৫ শতকে গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফ শা পাণ্ডুয়া জয় করেন। একটি সূর্যমন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। একটি ১২৭ ফুট উঁচু মিনার ও জোড়াপুকুর ও পীরপুকুর বলে দুটি পুকুর আছে।

মালদহের পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ মহানন্দার পূর্বে। মুসলমানী যুগের অনেক নিদর্শন এখানে রয়েছে।

পাণ্ডবপর্বত : রাজগীরের বিপুলগিরিকে চিহ্নিত করা হয়।

পাপহারিনী : বিহারের একটি পাহাড়ের নাম। এখানে একটি সুন্দর জলাশয় আছে। আদিত্যসেনে পত্নী কোনাদেবী এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। আদিত্যসেন হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ৭ম শতকে মগধের স্বাধীন রাজা ছিলেন।

পার্শ্বনাথ : এটি হাজারীবাগ জেলায় জৈন তীর্থক্ষেত্র। পাহাড়টির উচ্চতা ৫০০ ফুট। এখানে অনেক কিছুর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

পাটলিপুত্র : আধুনিক পাটনা। রাজগৃহের পর মগধের রাজধানী। এটি কুসুমপুরা বা পুষ্পপুরা বলেও পরিচিত ছিল। গ্রিকেরা একে বলত, পলিবোথরা। চিনারা বলত, পা-লিন-তাউ কালিদাসের মতে পুষ্পপুরা অজ-এর সময়েও ছিল।

জৈনমতে দর্শকের পুত্র উদয় এই নগরীর নির্মাতা। মগধরাজ অজাতশত্রু এর শুরু করেন। মগধ থেকে বৈশালী যাবার পথে বুদ্ধ অজাতশত্রুর এক মন্ত্রীকে একটি নগরের পরিমাপ করতে দেখেছিলেন।

পাটলিপুত্র আসলে মগধের পাটলিগ্রাম নামে একটি গ্রাম। এটি গঙ্গার তীরে কোটিগ্রামের বিপরীতে ছিল। পাটলিপুত্রের দুর্গীকরণ বুদ্ধের সময় অজাতশত্রুর দুই মন্ত্রী

বর্ষকারও সুনীথ করেছিলেন। তাই অজাতশত্রুই এর প্রকৃত নির্মাতা। পাটলিপুত্র গঙ্গা-শোণ আর গণ্ডকের সঙ্গমে নির্মিত হয়েছিল। এখন শোণ পিছিয়ে গেছে। পরিখা বেষ্টিত নগরটিতে ৫৭৪টি রক্ষীস্তম্ভ, ৬৪টি দ্বার ছিল। অশোক এখান থেকে প্রতিদিন ৪ লক্ষ কহাপন রাজস্ব আদায় করতেন। ফাহিয়েন ৫ম শতকে নগরটিকে দেখে মুগ্ধ হন।

পাটলিপুত্রে হর্যঙ্ক বংশ, শিশু নাগবংশ, নন্দবংশ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার মৌর্য ও অশোক রাজত্ব করেন। সমুদ্রগুপ্তের বিজয়ের পর এটি রাজকীয় আবাসস্থলে পরিণত হয়। রাজধানী চলে যায় উজ্জয়িনীতে। ৭ম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজা হর্ষবর্দ্ধন এই নগরীটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন নি। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক এখানকার বহু বৌদ্ধ স্মৃতি ধ্বংস করেন। পরম পরাক্রান্ত ধর্মপালদেব এই নগরীর গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগ যা উদ্ধার করেছে : (১) কাঠের নগর প্রাকারের কিছু অংশ। বুলন্দিবাগ, মহারাজগঞ্জ এবং মাংলের পুকুর। (২) গোলকপুরে পাওয়া ছাপমারা মুদ্রা। (৩) দিদারগঞ্জ মূর্তি (৪) দারুকিয়া দেবী ও পারসো-আইওনিক 'ক্যাপিটাল' (৫) শুঙ্গ সময়ের রেলিং (৬) কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা ইত্যাদি।

পাথরঘাটা : ভাগলপুরে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়। পাহাড়ে কিছু ভাস্কর্য্য ও গুহা রয়েছে যা বিক্রমশীলা বলে চিহ্নিত।

পাবাপুরী : আধুনিক পাপা বা অপাপপুরী। এটি বিহারের একটি গ্রাম। এখানে পাবার ষষ্ঠীপালের প্রাসাদে মহাবীর মারা যান। এখানেই বুদ্ধ কর্মকার চুন্দের গৃহে শেষ ভোজন করে আমাশয় আক্রান্ত হন। পাবার অবস্থান নিয়ে কিছু মতদ্বৈততা রয়েছে। কেউ বলেন গণ্ডক নদীর তীরে গোরখপুর জেলার কাসিয়া গ্রামটিই প্রকৃত পাবা।

পাবারিক আম্রবন : এটি নালন্দার শ্রেষ্ঠী পাবারিকের একটি আম্রকুঞ্জ। তিনি বুদ্ধের বাসের জন্যে এখানে একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।

ফল্গু : লক্ষীসরাইয়ের উত্তর পূর্বে মুঙ্গের জেলায় গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফল্গু। নৈরঞ্জনা ও মহানদ নামে দুটি পাহাড়ি নদীর যুগ্ম ধারা ফল্গু।

ফল্গুগ্রাম : বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া দানপত্র ও এদিলপুরের কেশবসেনের দানপত্র ফল্গুগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ফুলিয়া : শান্তিপুরের ৪ মাইল দূরে নদীয়া জেলার একটি গ্রাম ফুলিয়া। বাঙালীকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। বাঙলায় রামায়ণ তিনিই রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান শিষ্য যবন হরিদাস এখানে ধর্মীয় আচার আচরণ অভ্যাস করেছিলেন।

পিনজোকাস্টি : বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া দানপত্রে এই গ্রামের নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুর বিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রাম।

পিপ্পলগুহা বা পিপ্পলিগুহা : এটি রাজগৃহের বৈভারগিরির উত্তর মুখে অবস্থিত। মহাকশ্যপের প্রিয় স্থান। মহাকশ্যপ অসুস্থ হয়ে পড়লে বুদ্ধ এই গুহায় আসেন। গুহা মুখে একটি পিপুল গাছ ছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলে, এটি বরাহ পর্বতে অবস্থিত। চিনা বিবরণে এটি গৃধ্রকূট পাহাড়ে।

পিপ্পলিবন : এটি মোরীয়দের রাজধানী যা হিউয়েন সাঙ বর্ণিত ন্যাগ্রোধবন। দুলবর দেওয়া তিব্বতীয় বিবরণেও একই কথা বলা আছে। অনেকের মতে এটি নেপালী তরাইয়ের রুমিনদেই ও গোরখপুর জেলার কাসিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময় মোরীয়রা একটি গণতন্ত্রী গোষ্ঠী ছিল। তারা বুদ্ধের চিতাভস্মের একটি অংশলাভ করে তার ওপর একটি স্তূপ নির্মাণ করে। মহাবংশ অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই মোরীয় গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রভাসবন : এটি রাজগৃহের গৃহ্যকুট পাহাড়ে অবস্থিত ছিল।

প্রবরগিরি : বারবার পাহাড়ের অনন্তবর্মণের লিপিতে প্রবরগিরির উল্লেখ রয়েছে। গয়ার ১৪ মাইল উত্তর-পূর্বে পানাড়ি গ্রামের উত্তর অংশে অবস্থিত ছিল।

প্রাগজ্যোতিষ : দুটি মহাকাব্য অনুযায়ী প্রাগজ্যোতিষ এক বিখ্যাত দেশ। কৃষ্ণ এখানে এসেছিলেন। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে এখানকার রাজা ছিলেন নরক। মনে হয়, শুধু কামরূপ নয়, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অংশ এবং উত্তর বিহারও এর অন্তর্গত ছিল। অধুনা গৌহাটিকে প্রাগজ্যোতিষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালিদাসের মতে এটি লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ছিল। কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষ শাসনে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদ্যদেবের কামাউলির দানপত্রে কামরূপমণ্ডল এবং প্রাগজ্যোতিষবিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ প্রাগজ্যোতিষ প্রশানিক দিক দিয়ে কামরূপের চেয়ে বড় ছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে আধুনিক গৌহাটিই প্রাগজ্যোতিষপুর। রাজা ছিলেন ইন্দ্রপাল যিনি মহারাজধিরাজ উপাধি নিয়েছিলেন। রত্নপালের বরগাঁও দানপত্রে বলা হয়েছে। প্রাগজ্যোতিষ অভেদ্য নগরী এবং লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদী একে সুন্দর করে তুলেছে। মহাভারতে একবার বলা হয়েছে, এটি ম্লেচ্ছদেশ, ভগদত্ত এর রাজা। আবার আর এক জায়গায় একে অসুরদেশ বলা হয়েছে। মনে হয় দেশটি কিরাত এবং চিনাদের দেশের সীমান্তে ছিল। রঘুবংশ অনুযায়ী এটি ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ছিল।

হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামনিতে বলা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষ কামরূপ। পুরুষোত্তম বলেছেন প্রাগজ্যোতিষই কামরূপ। বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী কামাখ্যা বা গৌহাটি। কাব্যমীমাংসায় একে পূর্বদেশ বলা হয়েছে। হর্ষচরিতে দেখা যায়, প্রাগজ্যোতিষের রাজপুত্র ভাস্করদ্যুতি বলে একজনকে হর্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিলহর্ণের মতে, ঐ রাজকুমারের নাম, কুমার।

প্রেতকুট : গয়া মাহাত্ম্যে এটিকে একটি শৃঙ্গ বলা হয়েছে। পাহাড়টি গয়ার ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। পাহাড়ের মাথায় গ্রানাইট পাথরের একটি চাঁইকে বসে থাকা হাতির মতো দেখায়। পাহাড়ের পাদদেশে প্রেতকুণ্ড বা ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড রয়েছে।

পুনপ্পুন : এটি পুনপুন নদী পাটনার নীচে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে। ডালটনগঞ্জ জেলা এর উৎস।

পূর্বখাটিকা : মনে হয় পশ্চিম সুন্দরবনের একটি বিশাল অংশ।

পুষ্করণ : চন্দ্রবর্মণের শুশুনিয়া লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। বাঁকুড়া জেলার দামোদরের তীরে পোখরান চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুষ্করামবুধি : লুডারের তালিকায় নং ৯৬১—একটি দেশ।

রাঢ় : ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে এই প্রদেশের উল্লেখ রয়েছে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লিপিতে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় বলে দুটি জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে। ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসন ও বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বলা হয়েছে এটি বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। গণ্ডরাদিত্যদেবের কোন্নপুর তাম্রশাসন ও ভারতীয় যাদুঘরের গঙ্গ দেবেন্দ্রবর্মণের (৩৯৮ খৃঃ) তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়কে মুর্শিদাবাদ জেলা সহ'বাঙলার অংশ বলা হয়েছে। মনে হয় রাঢ় প্রদেশ হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের বেশির ভাগটা নিয়েই গঠিত ছিল। আচারাংগ সূত্র বলেছে রাঢ় এক দিশাহীন দেশ। এর দুটি ভাগ আছে। শুভভূমি (সম্ভবত সুম্ভ) এবং বনজভূমি (সম্ভবত আধুনিক মেদিনীপুর জেলা)। অধিবাসীরা কর্কশ এবং সাধারণত সাধুসন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে। তারা গ্রামের কাছে এলে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়।

রাজগহ (রাজগৃহ) : মহাভারতে এবং লুডারের তালিকায় ১৩৪৫ নং-এ রয়েছে। এটি মহাবীর কর্তৃক পরিদর্শিত উশবপুরা বলেও পরিচিত ছিল। প্রাচীন মগধের রাজধানী-এর গিরিব্রজ কুসুমপুরা নামেও পরিচিত। পাঁচটি পাহাড় বেষ্টিত নগরী জরাসন্ধের রাজধানী। শাসনবংশ অনুসারে এটি মান্ধাতা কর্তৃক নির্মিত। বুদ্ধের অনেক প্রখ্যাত শিষ্য এই নগরে বাস করতেন। এই নগরে বুদ্ধের কর্মব্যস্ততা ছিল প্রচণ্ড। বিশতম তীর্থঙ্করের জন্মস্থান এই নগর। প্রখ্যাত চিকিৎসক জীবক রাজা বিম্বিসারের সভাসদ ছিলেন। আকাশগোত্তা নামেও একজন চিকিৎসক এই নগরে বাস করতেন। বুদ্ধ-ইতিহাসে রাজগৃহের নাম অনন্য। রাজা অজাতশত্রুর সময় ৫০০ জন অর্হৎ মহাকশ্যপের নেতৃত্বে মিলিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে সব স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নগরে বুদ্ধ তাঁর প্রখ্যাত দুই শিষ্য সারিপুত্ত এবং মোদগালায়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন।

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ীভদ্র বুদ্ধের শিখরে উঠেছিল। অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ী-ভদ্র বুদ্ধের মৃত্যুর ২৮ বছর পর পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরীত করার পর রাজগৃহের গৌরব অস্তমিত হয়।

রাজমহল পর্বতমালা : এই পর্বতমালা আসলে বিহারের সাঁওতাল পরগণার পাহাড়শ্রেণি। এখানে মহাভারতে বর্ণিত অন্তরগিরয়েরা বসবাস করত। ভাগলপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীরা ছিল অন্তরগিরয়। পতঞ্জলীর মতে স্থানটি কালকবন বলেও পরিচিত।

রাক্ষসখালি : হুগলী নদীর মোহনায় সাগরদ্বীপের ১২ মাইল পূর্বে একটি দ্বীপ।

রামকেলি : মালদহের ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত গ্রামটিতে শ্রীচৈতন্য একবার এসেছিলেন।

রামপূর্ব : মালদহের ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এখানে ১৮৭৭ সালে কার্লাইল অশোক স্তম্ভ আবিষ্কার করেছিলেন।

রানিপুর ঝরিয়াল : উড়িষ্যার টিলাগড়ের ২১ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম। এখানে কয়েকটি লিপি পাওয়া গেছে।

রেবতিকা : সমুদ্রগুপ্তের গয়া তাম্রশাসনে দেখা যায় যে গয়াবিষয়ের এই গ্রামটি

এক ব্রাহ্মণকে দান করেছেন।

রোহিতাগিরি : মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের রোহতাসগড়ের পাথরের সিলমোহরে রোহতাসগড় দুর্গের কথা বলা হয়েছে। সাসারামের ২৪ মাইল দক্ষিণে স্থানটি অবস্থিত। রামপালের শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখা যায়. চন্দ্রেরা রোহিতাগিরি তথা রোহিতাগড়ের তথা রোহতাসগড়ের শাসক ছিলেন।

রোহতাসের প্রাচীন গিরিদুর্গ রোহতাসগড় রাজা হরিশচন্দ্রে পুত্র রোহিতাশ্বের নামে হয়েছিল। জনৈক তুঙ্গ পরিবার সম্পর্কিত ওড়িশায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখা যায়, ওড়িশায় তুঙ্গেরা এবং পূর্ব বাংলার চন্দ্রেরা রোহিতাগিরি থেকে এসেছিল।

ঋষিগিরি : রাজগৃহের কাছে একটি পাহাড়।

ঋষ্যশৃংগ আশ্রম : ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম ছিল ভাগলপুরের ২৮ মাইল পশ্চিমে ঋষিকুন্ডে। এটি মাইরা পাহাড়ের এক গোলাকার উপত্যকায় ছিল। এখানে একটি জলাশয় ছিল। এই জলাশয়ের উত্তরদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তাঁর পিতা বিভণ্ডক ধ্যান করতেন। কাজরা রেল স্টেশন থেকে ৮ মাইল দূরে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতকেই অনেকে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম বলে মনে করেন। মহাভারত বলে, আশ্রমটি কুসি নদীর (প্রাচীন কৌশিকীর) অদূরেই ছিল। স্থানটি চম্পা থেকে ২৪ মাইল দূরে।

রূপনারায়ণ : এই নদীটি হাওড়া ও মেদিনীপুরের (পূর্ব) সীমা রেখা। এটি মানভূমে উদ্ভূত হয়ে তমলুকের কাছে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

সালন্দি : কেওঞ্জর জেলায় উদ্ভূত হয়ে রামেশ্বর জেলার বৈতরণীর ওপর ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

সমতট : সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে বলা হয়েছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজগুলির মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের কাছে বশ্যতা স্বীকারকারী দেশ হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। এটি বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। অনেকে মনে করেন, দেশটির পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণে সমুদ্র। এবং উত্তরে বুড়িগঙ্গা। বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে এবং মনে হয়, এটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রে বদ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব অনুযায়ী এটি ত্রিপুরা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং বরিশালের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ন্যায়পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন, প্রথম মহীপালের বগুড়া লিপি, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর দানপত্র, বীরেন্দ্রভদ্রের বুদ্ধগয়ার লিপি এবং আসরফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সমতটের উল্লেখ রয়েছে। দামোদরদেবের মেহেরগ্রাম তাম্রশাসনে নিশ্চিত ভাবে পাওয়া যায় যে সমতটমণ্ডল পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির অধীনে ছিল। দেববংশের রাজার ১৩ শতকে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন।

৬৪০ খ্রিঃ হিউয়েন সাঙ যখন এই দেশ পরিদর্শন করেন, তখন সমতট একটি গুরুত্ব পূর্ব দেশ ছিল। এখানে অনেক বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দির ছিল। হিউয়েন সাঙ ও সেংছির সময় সমতট সম্ভাব্য খঙ্গ বংশের অধীন ছিল। চন্দ্ররাজবংশ সম্ভবত সমতট সহ সমগ্রবঙ্গের অধিপতি ছিল। ১১ শতকে বর্মণেরা চন্দ্রদের পতন ঘটায় এবং ১১ শতকের শেষ ভাগে তারা আবার সেনদের জায়গা ছেড়ে দেয়।

সপ্পসোনড়িক-পব্বহার : এটি সাপের ফণার মতো দেখতে। রাজগৃহের সীতাবনের

কাছে অবস্থিত ছিল।

সপ্পিনী : রাজগৃহের আশপাশের একটি ক্ষুদ্র নদী। পঞ্চান নদীই সম্ভব, প্রাচীন সপ্পিনী নদী।

সপ্তগ্রাম : আগে এটি বলতে সাতটি গ্রামের কথা আনত—বাঁশবেড়িয়া, কেষ্টপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বকোর ও বালাঘাটি। বর্তমান আদিসপ্তগ্রাম স্টেশনের কাছে প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গঙ্গার ধারে রাঢ়ের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। রাজা প্রিয়ব্রতের সাত ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে এখানে তপস্যা করেছিলেন। সরস্বতী নদীর বুকে পলি জমায় এই বন্দর গৌরব হারায়। ৯ শতকে সপ্তগ্রামে এক বৌদ্ধ রাজা ছিলেন—শ্রীশ্রী রূপনারায়ণ সিংহ। ১৩ শতকে মিশরীয় পর্যটক ইবন বতুতা এখানে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে জাফর খাঁ স্থানটি অধিকার করে। তাঁর সমাধি এখনও ত্রিবেণীতে রয়েছে। গৌড়ে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে এখানে সরকারীভাবে মুদ্রা প্রস্তুত করা হত। ১৬ শতকে রাজীবলোচন নামে এক হিন্দুরাজা এটি অধিকার করেন। তখন গৌড়ের সুলতান সুলেইমান। বঙ্কিমচন্দ্রে কপালকুণ্ডলা ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে থেকে আমরা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু জানতে পারি। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য উদ্ধব দত্তের বাস ভূমির জন্য এটি বৈষ্ণবদের কাছে পবিত্র স্থান। মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত শ্রীনিত্যানন্দ এখানে অনেকদিন বসবাস করেছিলেন।

সতট পদ্মাবতী : ১১ শতকের শ্রীচন্দ্রের আদিলপুর তাম্রশাসনে এই জেলাটির উল্লেখ আছে।

সানবত্য : মহাভারতে উল্লিখিত দেশটি গয়া জেলায়, কেউ কেউ একানকার অধিবাসীদের সাঁওতাল বলেছেন, তা সম্ভবত ঠিক নয়।

সত্তপন্নি গুহা : অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈভার পাহাড়ে প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—তারই পাশে ছিল এই গুহা। এক সপ্তপর্ণ লতার নামে এই গুহা। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন।

সালিনদিয় : রাজগৃহের পূর্বে একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম।

শালমলি : মহাভারত উল্লিখিত গয়া জেলার একটি দেশ।

শান্তিপুর : নদীয়া জেলার গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এখানে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও ভক্ত অদ্বৈতাচার্য বাস করতেন।

সাবথিদেশ : এটি সম্ভবত উত্তর বগুড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

সেনানি গ্রাম : মগধের একটি গ্রাম।

সেনাপতি গ্রাম : এটি উরুবিল্বে অবস্থিত। বুদ্ধ এখানে ছ'বছর গভীর ধ্যান করেছেন।

শাহপুর : আদিত্যসেনের শাহপুর প্রস্তরমূর্তি লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

শিবসাগর : এটি প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অংশ। ব্রহ্মপুত্র ও ধানসিঁড়ি এখানকার দুটি বিখ্যাত নদী। এখানে অহোম রাজারা অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন।

সিধলা : ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপি এবং ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়ের এই গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে। বীরভূম জেলায় আহমদপুরের সিধলা গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শীলা-সংগম : এই পাহাড়ে বহু প্রাচীনকালের সাতটি খোদাই করা গুহা রয়েছে। হিউয়েন সাঙ ৭ম শতাব্দীতে এটি পরিদর্শন করেন। কেউ কেউ এটিকে পাথুরঘাটা পাহাড় বলে চিহ্নিত করেন।

সিলিমপুর : এটি বাংলাদেশের বগুড়া জেলায়। জয়পালদেবের লিপি সম্বলিত একটি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে।

সিলুয়া : বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় অবস্থিত। এখানে একটি নীচু ঢিবি রয়েছে—তাতে রয়েছে বিশাল এক মূর্তির ভগ্ন অংশ। ভিত্তি ভূমিতে ২য় খ্রিঃ পূঃ-এর একটি লিপিও রয়েছে।

সিংহপুর : সিংহপুরা ঠিক মতো চিহ্নিত করা যায় না। মহাবংশ অনুযায়ী লাঢ় (রাঢ়) দেশে এটি অবস্থিত। ভোজবর্মণের বেলায় তাম্রশাসন প্রমাণ করে যে সিংহপুরার শাসক ছিল বর্মণেরা।

সিংগটিয়া : বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে এই নদীটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম খণ্ডয়িল্লার পাশ দিয়ে এটি প্রবাহিত হত। মুর্শিদাবাদ জেলার আধুনিক খারুলিয়াকে চিহ্নিত কবা হয়েছে।

সিতাহাটি : এটি বর্ধমান জেলার কাটোয়াতে অবস্থিত। সিতাহাটি ও নৈহাটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে বল্লাল সেনের তাম্রশাসন দানপত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সীতবন : এটি একটি মৃতদেহ রাখার জায়গা। ঘেরা এই জায়গায় মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত যাতে মাংসাহারী জীবেরা ও প্রকৃতি দেহগুলির গতি করে। রাজগৃহের বেণুবনের পিছনে বৈভার পাহাড়ের উত্তর মুখে এটি অবস্থিত ছিল।

সীতাকুণ্ড : চট্টগ্রাম শহরের ২৪ মাইল দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। এটি সীতাকুণ্ড নামে একটি পাহাড়শ্রেণী যার সীতাকুণ্ড গ্রামের কাছে উচ্চতা ১১৫৫ ফুট। কিংবদন্তী, রামসীতা বনবাসকালে এই পাহাড়ের ওপর ভ্রমণ করেছিলেন এবং কাছের এক কুণ্ডে সীতা স্নান করেছিলেন। কুণ্ডটি নেই। পরিবর্তে রয়েছে শম্ভুনাথের মন্দির।

মুঙ্গেরের ৪ মাইল পূর্বে সীতাকুণ্ড বলেও একটি গ্রাম রয়েছে। এখানে একটি উষ্ণকুণ্ডও রয়েছে। রামায়ণের কিংবদন্তীও এখানে রয়েছে।

সোমপুরা : পাহাড়পুর দেখুন।

শ্রীহট্ট : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। সুর্মা নদীর নিম্ন উপত্যকায় শ্রীহট্ট অবস্থিত। বরাক এখানকার প্রধান নদী।

শ্রীনগরভুক্তি : দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। স্যার চার্লস উইলকিলসন একে পাটনা বলে চিহ্নিত করেছেন।

শৃঙ্গরেরা : রাজশাহী জেলার নাটোরের সিংরা পুলিশ থানাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুহ্ম : পরবর্তীকালে রাঢ় বলে পরিচিত অঞ্চলের একটি অংশ ছিল সুহ্ম। মনে হয় সাভবভূমিই ছিল সুহ্ম দেশ। বঙ্গ ও পুন্ড্র থেকে এটি পৃথক। মহাভারতে ভীমের পূর্বদেশ অভিযানে সুহ্মকে বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি থেকে আলাদা করে দেখান হয়েছে। মহাভারতের ভাষ্যকার নীলকণ্ঠের মতে সুহ্ম ও রাঢ় একই। পাণ্ডু এবং কর্ণ দুজনেই সুহ্ম জয় করেছিলেন। বুদ্ধ সুহ্মে অবস্থান কালে জনপদকল্যাণীসূত্র ব্যাখ্যা করেন। রঘুর

বশ্যতা স্বীকার করে সুহ্মবাসীরা নিজেদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর অনেক দেশের সঙ্গে সুহ্মের নাম করেছেন। হর্ষচরিত অনুসারে সুহ্মরাজ দেবসেন দেবকী কর্তৃক নিহত হন।

দশকুমারচরিতে সুহ্মে দামলিপ্তি বলে এক নগরের কথা বলা হয়েছে। নগ্নরের বাইরে বিশাল এক উৎসবে সুহ্মরাজ তুঙ্গধনবা পার্বতীর কাছে দুটি সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন।

শুক্তিমত পর্বতমালা : ছত্তিশগড়কে বস্তার থেকে পৃথক করা সেহোয়া ও কঙ্করের দক্ষিণের পাহাড়টিকে কানিংহাম চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত অবস্থান নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।

সুলতানগঞ্জ : ভাগলপুর জেলায় গঙ্গার কাছাকাছি এই গ্রামটিতে প্রচুর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এখানে গ্রানাইটের দুটি বড় পাহাড় রয়েছে। একটির মাথায় রয়েছে গৌরনাথ মহাদেবের মন্দির।

সুমাগধা : রাজগৃহের কাছাকাছি একটি জলাশয়।

সান্তু : রাজধানী সেকত সহ সান্তুদের দেশ। কেউ কেউ এটিকে আধুনিক মেদিনীপুর বলে চিহ্নিত করে। স্থানটি অনিশ্চিত। বুদ্ধ এখানকার এক বনে বাস করেছিলেন।

সুন্দরবন : সুন্দরবনের বনাঞ্চল পূর্বে সমতট বা বাগড়ী (ব্যাঘ্রতটি)-র সঙ্গে যুক্ত ছিল। হিউয়েন সাঙ ৭ম শতকে এখানে অনেক হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন মন্দির দেখেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে কিছু অলংকৃত ইঁট, পাথর, ভাস্কর্যের কিছু টুকরো, হুবিষ্ক ও স্কন্দগুপ্তের কিছু মুদ্রা, সূর্য মূর্তি এবং পাথরের টুকরোর ওপর খোদিত নবগ্রহ মূর্তি পাওয়া গেছে।

সুর্মা : অসমের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনার ওপরদিককার নাম সুর্মা।

শুশুনিয়া পাহাড় : বাঁকুড়া জেলার একটি পাহাড়ের নাম।

সুবর্ণপুরা : তেল ও মহানদীর জঙ্গলে আধুনিক সোনপুর শহর।

সুবর্ণরেখা : মানভূম জেলায় উৎপন্ন এক নদী। জামসেদপুর, ধূলভূম, মেদিনীপুর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

তারকেশ্বর : এটি হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বরের মন্দিরের জন্য এটি বিখ্যাত।

তর্পণদীঘি : দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

তর্পণঘাট : দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মিকী তর্পণ করেছিলেন।

তাম্রলিপ্তি : এটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক। রূপনারায়ণ ও হুগলীর সঙ্গমের ১২ মাইল দূরে। এখন এটি রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রূপনারায়ণ শিলাই (শিলাবতী) ও দালকিশোর (দ্বারিকেশ্বরী)-র মিলিত ধারা। রঘুবংশ 'অনুসারে এটি কপিশা (কাঁসাই) নদীর তীরে অবস্থিত। মহাভারত অনুযায়ী তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম দুটি পৃথক দেশ। টলেমি বলেছেন তামলিতেস ৬ শতকে একটি সুহ্মের রাজধানী ছিল। এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। দশকুমারচরিতের লেখক দণ্ডিণ (ষষ্ঠ শতক) বলেছেন, এখানে বিন্দুবাসিনীর মন্দির আছে যা ৫ম শতকে ফা-হিয়েন দেখে গেছেন।

ফা হিয়েন বলেছেন, চম্পা থেকে পূর্বে ৫০ যোজন দূরে সমুদ্রতীরে ছিল তাম্রলিপ্তি বন্দর। ৭ম শতাব্দীতে আইসিং তাম্রলিপ্তির এক বিখ্যাত বিহার বরাহে বসবাস করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ এখানে এসেছিলেন। তাঁর মতে এখানে ১০টির বেশি বৌদ্ধ বিহার এবং এক হাজারের মতো ভিক্ষু ছিলেন। কিংবদন্তী, তাম্রলিপ্তির রাজা ছিলেন ময়ূরধ্বজ। তাঁর পুত্র তাম্রধ্বজ কৃষ্ণ ও অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বায়ুপুরাণ বলেছে—তাম্রলিপ্তির মধ্যে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হত। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত বর্গভীমার মন্দির যা আজও আছে। এটি আসলে একটি একটি বৌদ্ধবিহার। মহাবংশ-এ জানা যায়, অশোক তাম্রলিপ্তি থেকেই ধর্মপ্রচারকদের সিংহলে পাঠিয়ে ছিলেন।

১৯৪০ সালে তমলুকে খনন চালানো হয় এবং বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কার হয়।

তারাচণ্ডী : বিহারের সাহবাদ জেলার সাসারামের কাছে। একটি পাহাড়ের গায়ে খোদিত একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

তেত্রাবান : দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে অনেকগুলি ঢিবি রয়েছে।

তেজপুর : আসামের দরংজেলার সদর শহর। এখানে বল্লভদেবের পাঁচটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

তীরভুক্তি (ত্রিহুত) : এটি আধুনিক চম্পারণ জেলা, মুজাফরপুর, দারভাঙ্গা এবং নেপাল তরাইয়ের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। কানিংহাম মনে করেন, ছোট গণ্ডকের উপত্যকা এবং বাগমতী নদী এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তোসাড্ড : এটি পাটনার তোসারা গ্রাম।

ত্রিস্রোতা : কালিকা পুরাণে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে।

ত্রিবেণী : এটি মুক্তবেণী বলেও পরিচিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশনের ৫ মাইল দূরে। এটি সরস্বতী ও ভাগিরথীর সঙ্গম। স্থানটি প্রাচীন। কারণ, ধোয়ীর পবনদূত এবং কালিদাসের রঘুবংশে এর উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম যুগে এটি একটি উল্লেখযোগ্য নগর ও বন্দর ছিল। এটি একদা সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রও ছিল। প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম ত্রিবেণীকে একটি পবিত্রস্থান বলেছেন। সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফরখানের সমাধি এখানে রয়েছে। সমধিটি একটি হিন্দু মন্দিরের ওপর বানানো হয়েছিল।

উদেন : বৈশালীর পূর্বে একটি চৈত্য।

উদামবরপুর : মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উল্লিখিত মগধ-জনপদের একটি নগর।

উক্কাচেলা : বজ্জিদেশে গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল পরে সারিপুত্র ও মৌদগলায়ন এখানে অনেক ভিক্ষু নিয়ে বসবাস করেছেন।

উপতিস্সগাম : রাজগৃহের অদূরে একটি গ্রাম।

উপ্যালিকা : গ্রামটি কৌশাম্বীতে অবস্থিত ছিল।

উরেন : কাজরা রেল স্টেশনের ৩ মাইল পশ্চিমে মুঙ্গের জেলায় গ্রামটি অবস্থিত ছিল। এখানে বহু বৌদ্ধ প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে।

উরত্তিবিষয় : ওড়িশার কেওঞ্জরের একটি গ্রাম।

উরুবেলা (উরুবিল্ব) : এটি মগধে অবস্থিত ছিল। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের অভিপ্রায়ে এই স্থানটি নির্বাচন করেন। বুদ্ধত্বলাভের ঠিক পরেই বুদ্ধ নিরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল

বটবৃক্ষের নীচে বাস করেছিলেন। এরপর কিছুদিন ইসিপতনে কাটানোর পর আবার এখানে ফিরে আসেন। উরুবেলায় আসার পথে তিনি কাপ্পাসিয় কুঞ্জে তিরিশজন ভদ্দবগ্গীয় রাজকুমারকে ধর্মান্তরিত করেন। উরুবেলায় পৌছে তিনি তিনজন জটিলা ভাইকে তাঁদের শিষ্য সমেত গয়াশিরায় ধর্মান্তরিত করেন। বোধগয়ার কাছে উরেল গ্রামটিকে উরুবিল্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বদথিক : গয়ার কাছে নাগার্জুনী পাহাড়ের অন্যতম একটি গুহা। এখানে দশরথের (মৌর্য) একটি লিপি রয়েছে।

বহিয়কা : গয়ার কাছে নাগার্জুনি পাহাড়ের একটি গুহা, এখানে দশরথের (মৌর্য) লিপি রয়েছে।

বৈভারগিরি : এটি রাজগৃহেকে পরিবেষ্টনকারী একটি পাহাড়। জৈন বিবিধতীর্থকল্পে এটিকে একটি পবিত্র পাহাড় বলা হয়েছে।

বৈশালী : লিচ্ছবীদের রাজধানী। পূর্বভারতে একটি শক্তিশালী জাতি (৬ষ্ঠ খ্রিঃ পূঃ)। কানিংহাম মজফরপুর জেলার বসরা গ্রামটিকে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই অতীতের গৌরবশালী বৈশালী দাঁড়িয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকাজ এই তথ্যকে সমর্থন করেছে।

বিশাল বলে এই নগরীর নাম বৈশালী। রামায়ণ অনুসারে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ও অলম্বুসা নামে এক অপ্সরার সন্তান এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তার নাম ছিল বিশাল। তাই থেকে বিশালা—বৈশালী, বিষ্ণুপুরাণ ঐ রাজার নাম বলেছে তৃণবিন্দু।

ফাহিয়েন ৫ম শতকে বৈশালী পরিদর্শন করেন। তিনি বলেছেন, নগরীর উত্তরে একটি বন ছিল। সেখানে একটি বিহার ছিল। হিউয়েন সাঙ ৭ম শতকে বৈশালী পরিদর্শন করেন। এটি ছিল প্রাসাদময় নগরী। ফুলফলে সুশোভিত। তিব্বতীয় বিবরণে জানা যায়, নগরীর তিনটি বিভাগ ছিল। প্রথম বিভাগে স্বর্ণচূড়ামণ্ডিত ৭০০০টি বাড়ি ছিল। দ্বিতীয় বিভাগে ১৪০০ রৌপ্যচূড়া মণ্ডিত এবং তৃতীয় বিভাগে তাম্রচূড়া মণ্ডিত ২১০০০ গৃহ ছিল। উত্তম, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক এই তিনটি বিভাগে বাস করতেন। বুদ্ধের সময় এই নগরী তিনটি প্রাকার বেষ্টিত ছিল।

বৈশালীর প্রাচীন ইতিহাস জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তকদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত।

জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর বৈশালীর নাগরিক ছিলেন। বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রাম ছিল তাঁর জন্ম স্থান। তিনি তাঁর সন্ন্যাস জীবনে ১২টি বর্ষাঋতু বৈশালীতে অতিবাহিত করেন। বুদ্ধও এই নগরীর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এখানে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়।

বৈতরণী : ভারতের অন্যতম পবিত্র নদী। সিংভূম জেলার দক্ষিণ ভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করেছে।

বক্কটক : বর্ধমান জেলার দামোদর নদীর উত্তর-তীরে আধুনিক বকতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বক্কটকবিথী বর্ধমানভুক্তির একটি অংশ ছিল।

বমকা : এটি রাজগৃহের একটি পাহাড়। প্রাচীন নাম বেপুল্ল।

বংশাবতী : এটি হুগলী জেলার একটি গ্রাম। এখানে হংসেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির

রয়েছে। বাসুদেব মন্দিরও প্রাচীন। আসলে এখানে তিনটি মন্দির রয়েছে এবং প্রাচীনতম বিষ্ণু মন্দিরটি।

বঙ্গ : বাংলার প্রাচীন নাম। ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, যোগিনীতন্ত্র এবং পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ীতে বঙ্গ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভাগবতপুরাণ এবং কাব্যমীমাংসা একে দেশ বলে উল্লেখ করেছে। কালিদাস বলেছেন, বঙ্গ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপে অবস্থিত। ১১শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই প্রস্তরলিপি এবং চেদি কর্ণদেবের গোহারওয়া তাম্রশাসনে বঙ্গদেশকে বাঙ্গালা দেশম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩ শতকে মুসলমান আমলে একে বাঙলা বলা হয়। তিরুমালাই লিপি বঙ্গকে উত্তর রাঢ়। (উত্তিল রাঢ়ম) ও দক্ষিণ রাঢ়ম (তক্করাঢ়ম) থেকে পৃথক করেছে। প্রথম প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন হচ্ছে রাজা চন্দ্রের মেহেরাউলির লৌহস্তম্ভ লিপি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজা চন্দ্রকে এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির চন্দ্রবর্মণ বলে চিহ্নিত করেছেন। মহাকূট স্তম্ভলিপিতে বলা হয়েছে ৬ষ্ঠ শতকে চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ বঙ্গ, অঙ্গ ও মগধকে জয় করেছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেব সমতট সহ সমস্ত বঙ্গে রাজত্ব করতেন।

বঙ্গাল : রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালাই লিপি অনুসারে সম্ভবত এটি পূর্ববঙ্গ।

বর্ধমানভুক্তি : মল্লাসারুল তাম্রশাসন বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ করে। তাম্রশাসনটি পাওয়া নিয়েছিল বর্ধমান জেলার গলসীর কাছে এক গ্রামে। নৈহাটী তাম্রশাসন অনুযায়ী বর্ধমানভুক্তি গঙ্গার পশ্চিম তীরে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৯ শতকের কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে বর্ধমানপুরার উল্লেখ রয়েছে। ন্যায়পাল দেবের ইরদা তাম্রশাসনে এক ব্রাহ্মণকে বর্ধমানভুক্তির দন্ডভূতিমণ্ডলে একখণ্ড ভূমিদানের কথা আছে। বর্ধমানভুক্তি বর্তমান বর্ধমানের সমতুল্য।

বর্ধমানপুরা : আধুনিক বর্ধমান। মহাবীর এখানে এসেছিলেন। এখানে বিজয়বর্দ্ধমান বলে একটি উদ্যান ছিল।

বরেন্দ্র : এটি বরেন্দ্রী নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের এই নাম ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এর উল্লেখ আছে।

বসন্তপুর : এটি মগধের একটি গ্রাম। কেউ কেউ পূর্ণিয়া জেলার বসন্তপুরকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে জিয়সত্তু তার রানী ধারিণীকে নিয়ে রাজত্ব করতেন।

বটুম্বী : পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির আবৃত্তি বশৎশের একটি অংশ।

বাল্লাহিত্থ : বর্ধমানভুক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডলের স্বালপদকশিণবিথিতে অবস্থিত একটি দান করা গ্রাম। বর্তমান নৈহাটির পশ্চিমে বর্ধমানের উত্তর সীমান্তে বালুটিয়া গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বালুকারাম : কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালীর বালুকারাম-এ দ্বিতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বানিয়গাম : মজফরপুরের বসরার কাছে বানিয়া বলে গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহাবীর এখানে প্রায়ই আসতেন।

বারহকোনা : সাঁইথিয়া রেল স্টেশন থেকে ১$\frac{১}{৪}$ মাইল দূরে সুরীর আধুনিক বারকুণ্ডাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বারকমগুলবিষয় : রাজা ধর্মাদিত্যের ফরিদপুর তাম্রশাসনে বারকামগুলবিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এটি বর্তমান গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ সাবডিভিশন।

বাতস্বন : দক্ষিণ বিহারের বাথান পাহাড়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বেভার : এটি রাজগৃহের বৈভারগিরি।

বেদথিকা : গয়ার কাছে নাগার্জুনী পাহাড়ের একটি গুহা।

বেদিয়ক : কানিংহাম গিরিয়েক পাহাড়টিকে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই রয়েছে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রশাল গুহা।

(বেলুবন / বেণুবন) : এটি রাজগৃহের একটি বাঁশবন। এটির প্রকৃত অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙের মতামত মিলিয়ে মিশিয়ে নিলে দেখা যাবে, এটি রাজগৃহের ভেতরদিকের দ্বারের ১লী দূরে, শ্মশানের ১/২ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। পিপ্পল গুহার ৩০০ পা দূরে, কলন্দ হ্রদের ২০০ পা দূরে অবস্থিত ছিল।

বেপুল্ল : মগধের এই পর্বতটির প্রাচীন নাম ছিল প্রাচীনবংশ। পরবর্তীকালে নাম বনকক। এরপরে নাম হয় সুপস্স। এবং পরবর্তীকালে হয় বেপুল্ল, রাজগৃহকে বেষ্টন করে থাকা পঞ্চ পাহাড়ের একটি। এই পাহাড়ের মাথায় যেখানে বুদ্ধ শিক্ষা দিতেন সেখানে একটি স্তুপ ছিল। দিগম্বর জৈনেরা এই পাহাড় পরিদর্শনে আসতেন। এটি গৃহ্যকূটের উত্তরে অবস্থিত ছিল।

বেথদীপ : হিউয়েন সাঙ দ্রোণস্তুপ বা বেথদীপের অবস্থান নির্দিষ্ট করেন। এটি বর্তমান মশার মহাসার-এর ১০০লী দক্ষিণ পূর্বে এবং আরার ছ'মাইল পশ্চিমে একটি গ্রাম। কেউ কেউ আবার চম্পারণ জেলার কাসিয়া ও বেতিয়াকে চিহ্নিত করেন। বেথদীপ ব্রাহ্মণ দ্রোণের আবাস স্থল ছিল।

বেত্রগত্তা : এটি বর্ধমানভুক্তির একটি অংশ বক্কট্টোকবিথির মধ্যে অবস্থিত ছিল।

বিড্ডারশাসন : এটি একটি গ্রাম। গ্রামের পূর্বসীমান্তে গঙ্গা। হাওড়া জেলার বেতড়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিদেহ : এটি রঘুবংশে উল্লিখিত। এটি একটি রাজ্য ও রাজধানী। বিদেহ দেশ আর্য অধিকৃত ভূভাগের সর্ব পূর্বে অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী মিথিলা।

বিক্রমপুর : ঢাকার মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে অবস্থিত। এর একটি অংশ ফরিদপুর জেলায়। বিক্রমপুর বলতে সেই দেশটুকুকে বোঝায় যার উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্বে মেঘনা এবং পশ্চিমে পদ্মা। বিক্রম নামে এক রাজার নাম অনুসারে এই নাম। বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল মুন্সীগঞ্জের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বল্লালসেনের সিতাহাটি তাম্রশাসনে শ্রীবিক্রমপুর কথাটি দেখা যায়। চন্দ্রবংশের শ্রীচন্দ্রদেবের একটি তাম্রশাসন এখানে পাওয়া যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের জন্মভূমি রামপাল একদা হিন্দুরাজাদের পূর্বভারতের প্রধান ঘাঁটি ছিল। বল্লালবাড়ি, নানান জলাশয়, পাল যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবতাদের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে। রামপালের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল বজ্রযোগিনী গ্রাম। এখানে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (১০ শতক)। শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর তাম্রশাসন, কেশবসেনের এদিলপুর তাম্রশাসন, বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন, লক্ষ্মণসেনের

আনুলিয়া তাম্রশাসন, এবং ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ রয়েছে এবং এটি আজও এই নামে পরিচিত। বর্মণেরা এখানে খুব অল্প সময়ের জন্যে রাজত্ব করেন। ব্যারাকপুর তাম্রশাসন থেকে মনে হয় এটি বিজয়সেনের অন্যতম রাজধানী বা বাসস্থান জাতীয় কিছু ছিল। কারণ, সেনরাজাদের প্রায় সমস্ত দানপত্র বিক্রমপুর থেকেই প্রচারিত হয়েছে।

বিক্রমশীলা : এটি বিহারের ১৬ শতকের এক প্রখ্যাত বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিক্রমশীলা বর্ধিষ্ণু ছিল। কিন্তু আক্রমণকারীরা এটিকে পুড়িয়ে দেয়। পাথরঘাটাকে প্রাচীন বিক্রমশীলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তন্ত্র ও তান্ত্রিকচর্চার কেন্দ্র ছিল। জায়গাটি খুবই প্রশস্ত ছিল। একসঙ্গে প্রায় ৮০০০ জন এখানে জড়ো হতে পারত।

বিনঝাটবী : মনুষ্যহীন একটি জঙ্গল। এরই মধ্যে দিয়ে ছিল পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তি যাবার পথ।

বিষ্ণুপুর : স্থানটিও বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। রাজপরিবারের দেবতা বিষ্ণু থেকেই এই নামকরণ। দীর্ঘদিন ধরে মল্লরাজারা এখানে শাসন করেছেন। রাজ্যের নাম রেখেছেন মল্লভূমি। সমগ্র আধুনিক বাঁকুড়া এবং পার্শ্ববর্তী বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংভূমের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। আদিমল্ল প্রথম মল্লরাজা, মল্লযুদ্ধ ও তীরন্দাজীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ। মুসলমানদের আগমনের অনেক পূর্বে পশ্চিমবাংলার এক বিশাল অংশের শাসক ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজারা। রাজারা ছিলেন শিব উপাসক। মল্লেশ্বর মহাদেবেরে মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। এরপর এক সময়ে রাজারা শক্তির একরূপ মৃন্ময়ীর ভক্ত হন। মৃন্ময়ীর মন্দিরটি আজও আছে। রামাই পণ্ডিত প্রবর্তিত ধর্মের পূজা এখানে একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়। বাঙালী গণিতবিদ শুভঙ্কর রায় এখানে বাস করতেন। শ্যামরাই মন্দিরটিও খুব প্রাচীন। ১৬ শতকে হাম্বির রাসমঞ্চ মন্দির নির্মাণ করেন। এখানকার দলমাদল কামানটি বিখ্যাত।

বিষ্ণুপুরের মন্দির ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুগুলি আজও দর্শনীয় স্থান।

বিশ্বামিত্র-আশ্রম : বিহারের বক্সার জেলায় অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন কৌশকী বা অধুনা কোসী নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল। রামায়ণ অনুযায়ী বক্সারের চরিত্রবনই বিশ্বামিত্রের আশ্রম। মহাভারত অনুযায়ী সরস্বতীর তীরে অবস্থিত ছিল এই আশ্রম। রামচন্দ্র এখানেই তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন।

ব্যাঘ্রতটি : বাংলার প্রচলিত চারটি ভাগের একটি বাগড়ি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল।

যষ্টিবন : গীয়ারসন বলেছেন, গয়া জেলার সুপতীর্থের কাছে তপোবনের উত্তরে স্থানটি অবস্থিত ছিল। রাজগৃহ থেকে ১২ মাইল দূরে। বুদ্ধঘোষ অনুযায়ী এটি একটি তালকুঞ্জ ছিল। এটি বিম্বিসারের রাজকীয় উদ্যান। গয়াশিরা থেকে রাজগৃহে আসার পথে বুদ্ধ ধর্মান্তরিত জটিলা ভাইদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন। বুদ্ধের সময় এটি সুপতীখ চৈত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এটি বাঁশের এক ঘন জঙ্গল ছিল। মধ্যে একটি পাহাড় ঢাকা পড়েছিল এবং ১০লী দক্ষিণ পশ্চিমে দুটি উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল।

যতোদভব : এটি ব্রহ্মপুত্রের এক উপনদী যতোদা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

পশ্চিম ভারত

অবলূর : এটি মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার কোদের ২ মাইল পশ্চিমে একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম অব্বলূর।

অদ্রিজা : মহাভারতে উল্লিখিত একটি নদী। এটি ঋক্ষ ও বিন্ধ্যপর্বত থেকে উদ্ভূত।

অগস্ত্য-আশ্রম : নাসিকের পূর্বে অকোলায় অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, নাসিকের ২৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অগস্তিপুরীতেই ছিল ঐ আশ্রম। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে এটি মলয় পর্বতমালায় বা মলয়কূট যা শ্রীখণ্ডাদ্রি বা চন্দনাদ্রি নামেও যা পরিচিত সেখানে অবস্থিত ছিল। আর একমতে এটি বৈদূর্যপর্বত বা সাতপুরা পর্বতে অবস্থিত ছিল। ঋষি অগস্ত্য অগস্ত্যসংহিতার প্রণেতা এবং দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতার প্রচারকারী। তাঁর সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার দেখা হয় এবং তিনি রামচন্দ্রকে তাঁর দৈব ধনুক ও নানান অস্ত্র উপহার দেন। এই আশ্রম থেকে ৭ মাইল দূরে ছিল পঞ্চবটী বন।

অলন্দাতীর্থ : সাতারা ৩৫ মাইল উত্তরে বা ভোরের ৫ মাইল উত্তর পূর্বে আধুনিক আলুন্দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অলিনা : শিলাদিত্য (৭ম) এর অলিনা তাম্রশাসনে (৪৪৭ খ্রিঃ) এই গ্রামটিব কথা বলা হয়েছে যা গুজরাটের নাদিয়াদে অবস্থিত ছিল।

অমলকটক : এটি আমতির ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আমোদ।

অম্বরনাথ : কল্যাণের কাছে ৯ শতকের একটি সুন্দর মন্দির।

অম্বাপাটক : এটি নৌশরীর ৫ মাইল দূরে পূরবী বা পূর্ণার তীরে অবস্থিত আমদপুর। কয়েক শতাব্দী আগে গ্রামটিকে আম্রপুরা বলা হোত।

অমরেলি : কাথিয়াওয়াড়ের দক্ষিণে বরোদায় একই নামে একটি জেলার সদরদপ্তর ছিল। ঘরগ্রহের (প্রথম) তাম্রশাসন এর প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

অণস্তু : বরোদার কারজানের উত্তরে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে দুটি তাম্রশাসন দানপত্র পাওয়া গেছে।

অঞ্জানেরী : মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার একটি গ্রাম। এখানে পৃথ্বিচন্দ্র ভোগশক্তির দানপত্র পাওয়া গেছে।

অম্তিকা : বরোদার আধুনিক আমতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনুপনিবৃত : অনূপ দেশ। সৌরাষ্ট্র ও অনর্তের কাছে এই দেশ ছিল। পুরাতত্ত্ব প্রমাণ বলে, এই দেশ সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ থেকে নর্মদার তীরে মাহিষ্মতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। গৌতমী বালশ্রীর নাসিক লিপি থেকে জানা যায় যে তাঁর পুত্র অন্যান্য দেশের সঙ্গে অনূপ দেশও জয় করে। রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি বলে এই ভূভাগ তাঁর অধীনে ছিল। কালিদাস তাঁর রঘুবংশে রাজধানী মাহিষ্মতি সহ এই দেশের কথা উল্লেখ করেছেন।

অপরান্ত : সমগ্র পশ্চিম সমুদ্র উপকূল জয় করার জন্যে রঘুর বাহিনী এখানে এসেছিল।

অসিক : প্যারস্যের পার্থিয়ান শাসক আরসক বা অরসসিদাদের নামের সঙ্গে এর একটি মিল রয়েছে। নাসিক লিপি বলে গৌতমীপুত্র এই দেশেরই শাসক ছিলেন।

অসিতমাসা : ভারহুত লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। কানিংহাম বলেন, এটি তমসা বা টোন নদীর তীরে কোথাও ছিল। বামন পুরাণ বলে, আসিনীল ও তমসা পশ্চিম ভারতের দেশগুলির অন্যতম।

অশোকতীর্থ : মহাভারতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি সুপারক বা আধুনিক সোপারার কাছে অবস্থিত ছিল।

অয্যাপোলিল : তামিল অয্যাবোলের প্রতিশব্দ, এটি বিজাপুরের আইহোল—বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল।

আভির দেশ : পশ্চিমী ক্ষত্রপ বা শক শাসকেরা অবিরিয়া বা আভির দেশ শাসন করত। শকরাজ রুদ্রসিংহের গুণ্ডা লিপিতে জানা যায়, তাঁর শাসনকালে রুদ্রভূতি বলে এক আভির সেনাপতি এক জলাশয় খনন করান। এর কিছুকাল পরে এক আভির দেশজ—ঈশ্বরদত্ত মহাক্ষত্রপের স্থলাভিষিক্ত হন এবং তৃতীয় শতকে সাতবাহন শাসকদের হাত থেকে মহারাষ্ট্রের একটি অংশ অধিকার করে নেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে আভির দেশকে বলা হয়েছে পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের একটি উপজাতীয় দেশ। তারা তাঁকে কর দিত এবং তার রাজ্যসীমার বাইরে আধা স্বাধীন দেশ ছিল। কেউ আবার বলেন, পার্বতী ও বেতয়ার মধ্যবর্তী আহিরওয়াড়া ছিল আভির দেশ। আভিরেরা শূদ্র ছিল এবং এরাই সম্ভবত গ্রিক ঐতিহাসিকদের সোদ্রাই বা সোগদই—বিষ্ণুপুরাণে যাদের একেবারে পশ্চিমের দেশ বলে উল্লেখ করেছে। সঙ্গে রয়েছে সৌরাষ্ট্র, শুদ্র, অর্বুদ, কারুষ, মালব—এরা সবাই পারিপাত্র পর্বতমালায় বসবাস করত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ আবার তাদের বাল্‌হিক, বাটধান, শুদ্র, মদ্রক, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধুসৌরীরদের জোটভুক্ত করে পশ্চিম ভারতের বা অপরান্তকের বাসিন্দা বলেছে। মহাভারতের মতে রাজস্থানের যেখানে সরস্বতী অদৃশ্য হয়—সেইস্থানই ছিল আভির দেশ। ২য় খ্রিঃ পূঃ মধ্যভাগে ব্যাকট্রিয়ান গ্রিকেরা তাদের জয় করে নিয়েছিল—কারণ, মনে হয় তারা সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল অধিকারে করেছিল যাকে টলেমি বলেছেন, ইন্দোস্কাইথিয়া—আবেরিয়া বা আবিরিয়া এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আলুর : মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার গডকের একটি গ্রাম।

আনন্দপুর : ধারসেনের (দ্বিতীয়) মালিয় তাম্রশাসনে এর উল্লেখ রয়েছে। এর বর্তমান নাম আনন্দ।

আনন্দপুর বা বেদনগর : একে নগরও বলা হয়। গুজরাটের নগর ব্রাহ্মণদের আদি নিবাস। কুমারপাল একটি প্রাচীর দিয়ে নগরটি ঘিরে দেন।

আর্নত্ত : উত্তর কাথিয়াওয়াড়ের একটি দেশ। দেশটি শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর কাছ থেকে পুনরায় অধিকার করে নিয়েছিলেন। স্কন্দ পুরাণ বলে এখানে একটি আশ্রম ছিল যা সব সময় বেদমন্ত্র পাঠে পূর্ণ থাকত।

আশত্রি গ্রাম : নাভসরীর সাতমাইল দক্ষিণপূর্বে অষ্টগামটি চিহ্নিত হয়েছে।

আটবীকরাজ্য : ফ্লিট বলেন, আটবীক রাজ্য বা বনরাজ্যের সঙ্গে ডবাল অর্থাৎ জব্বলপুর অঞ্চল জড়িত। সমুদ্রগুপ্ত আটবীক রাজাদের ভৃত্যে পরিণত করেন। আটবীকরা সম্ভবত আদিবাসী ছিল এবং মধ্যভারতের জঙ্গলই তাদের বাসস্থান ছিল।

বদরিকা : দন্তিদুর্গের ইলোরা তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। স্থানটি দক্ষিণ গুজরাটে।

বহাল : তদানিন্তন খান্দেশ জেলার চল্লিশগাঁও সাবডিভিশনে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে যাদবরাজ সিংঘনার (শক ১১৪৪) একটি লিপি পাওয়া গেছে।

বলেগ্রাম : নাসিক জেলার ইগাতপুরীতে আধুনিক বেলগামের তারালহ গ্রাম।

বলিস : অল্লাশক্তির একটি দানপত্রে এই গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে। সৈনদ্রক রাজকুমার অল্লাশক্তি গ্রামটি দান করেছিলেন। সুরাট জেলার বারদোলী তালুকে ওয়ানেকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বালসাণে : পশ্চিম খান্দেশ জেলার পিমপলনের তালুকে অবস্থিত। স্থানটি চালুক্য রীতিতে তৈরি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

বংকাপুর : মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার বাংকাপুর তালুক। প্রাচীন নগর মালে বাংকাপুর আধুনিক শহরটি থেকে ২ মাইল দূরে।

বরগাঁও : জব্বলপুর জেলার মুরওয়ারা তহশিলের ২৭ মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে একটি ভাঙ্গা পাথরের চাঁইয়ের ওপর একটি উৎপীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

বামণী : এই গ্রামটি কাগলের ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শিলাহার রাজবংশের বিজয়াদিত্যের একটি প্রস্তর লিপি পাওয়া গেছে।

বাসুরবিষয় : ধারওয়ার জেলার হাভেলী তালুকের দক্ষিণী অংশ ও ১৪০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত।

বেলভোল : অমোঘবর্ষের (শক ৮২৮) বেঙ্কটপুর লিপিতে এই স্থানের উল্লেখ রয়েছে। এটি আধুনিক গডগ, রোন ও নবলগন্দ তালুক নিয়ে গঠিত ছিল।

ভদ্রকসত : এটি কান্যকুব্জ বা কনৌজ। বারাণসীর রাজ পরিবারের সঙ্গে ভদ্রকসতের রাজা মহেন্দ্রকর সঙ্গে এক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল।

ভদ্রারক : আমতীর ২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভদরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভৈরনমট্টি : তদানিন্তন বিজাপুর জেলার বাগালকোটের ১০ মাইল দূরে এই গ্রাম। এখানে একটি প্রস্তরলপি পাওয়া গেছে।

ভরবা : কাথিয়াবাড়ের জামনগরের কচ্ছ উপসাগরের এক সমুদ্রবন্দর খামবলিয়ার কাছে একটি গ্রাম। একটি প্রস্তর লিপি এখানে পাওয়া গেছে।

ভরুকচ্ছ (ভৃগুকচ্ছ) : আধুনিক ব্রোচ বা ভারোজ এবং টলেমির বায্যগজা। আধুনিক ব্রোচ কাথিয়াবাড়ে। হিউয়েন সাঙের সময় চীনা ভাষায় এর নাম ছিল পো-লু-কা-চেহ-পো। ভারুকচ্ছের সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ অর্থাৎ উচ্চ তীরভূমি। বৃহৎসংহিতা ও যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ আছে। মথুরায় হুবিষ্কের মূর্তিলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণে এটিকে নর্মদার উত্তর তীরে বলা হয়েছে। টলেমি অনুযায়ী বায্যগজা একটি বড় নগর। সমুদ্র থেকে ৩০ মাইল দূরে নর্মদার উত্তর দিকে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে একে বেন্বা নদীর ধারে অবস্থিত বলেছে। দিব্যাবদানে ভৃগুকচ্ছকে একটি সমৃদ্ধশালী নগর বলেছে। হিউয়েন সাঙ এই বন্দর নগর পরিদর্শন করেন।

আর্যেরা সম্ভবত কাথিয়াবাড় থেকে জাহাজে ভৃগুকচ্ছে এসেছিল এবং সেখান থেকে সুপারকে (সোপারা) গিয়েছিল। খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ভৃগুকচ্ছ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রগামী

বন্দর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনীর সমস্ত স্থানীয় ব্যবহার্য জিনিস ভৃগুকচ্ছ দিয়ে আসা হত। পেরিপ্লাস লক্ষ্য করেছেন যে ওনিক্স পাথর বায্যগজায় আনা হত। টলেমির ভাষায় পশ্চিম ভারতে এটি সবচেয়ে বড় বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

ভাজ : মুম্বাই—পুণা রোডের ২½ মাইল দক্ষিণে এবং মালব্রি রেল স্টেশন থেকে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। গুহা-১ প্রাকৃতিক। পরবর্তী গুহাগুলি বিহার। গুহা-৬ একটি বিহার কিন্তু ধ্বংসপ্রায়। এই গুহাগুলি ২০০০ খ্রিঃ পূঃ-এর আগেকার।

ভান্দুপ : মহারাষ্ট্রের থানে জেলার সলমেট্টি তালুকের একটি গ্রাম। এখানে চিত্তরাজদেবের তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

ভেটালিকা : পঞ্চত্রি জেলায় এই গ্রামটি অবস্থিত।

বিলবিশ্বর : কীর্তিরাজার সুরাট তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। পলসেনার ২ মাইল উত্তরে বালেশর বা বালেশ্বর ছোট শহরটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্রহ্মগিরি : এটি নাসিক জেলার ত্রম্বকের কাছে একটি পাহাড়। এটি গোদাবরীর উৎস।

ব্রহ্মপুরী : এটি কোলহাপুরের একটি অংশের স্থানীয় নাম।

ব্রাহ্মণবাদ : এই ছোট্ট দেশটিকে গ্রিকরা বলত পতলেন। সম্ভবত রাজধানী পট্টল থেকে এই নাম। সিন্ধুর বদ্বীপকে পতলেন বলে চিহ্নিত করা হয় এবং রাজধানী পতল (সং—প্রস্থল)। সম্ভবত এটি আধুনিক ব্রাহ্মণবাদের কাছেই ছিল। গ্রীক ডিওডোরাসের মতে 'স্পার্টা'-র অনুরূপই ছিল এই দেশের সংবিধান। বয়স্কদের এক সংগঠনের ওপর শাসন পরিচালনার ভার ছিল। স্ট্রাবো বলেছেন, আলেকজান্ডারের অনেক পরে পতলেন ব্যাকট্রিয়ার গ্রিকদের অধিকারে যায়। পরে এটি শক বা ইন্দো-স্কাইথিয়ানদের হাতে আসে।

কডিজ : মহারাষ্ট্রের উরানের কাছে গজ্ঞকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক্যাম্বে : এটি গুজরাটের খইরা কালেক্টরেট। একটি জৈন মন্দিরে একটি প্রস্তর লিপি পাওয়া গেছে। স্তম্ভতীর্থ হচ্ছে আধুনিক কাম্বে।

চম্পক : এটি আধুনিক চম্পানের। চম্পকপুরা নামেও এটি পরিচিত।

চন্দ্রপুরী : অঞ্জনেরীর ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দ্রচি মেটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চম্পানক : গুজরাটের ঘুমলিতে পাওয়া সৈন্ধব তাম্রপত্রে এই গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। জুনাগড়ের ১৫ মাইল উত্তরে চাবন্ডকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিকুলা : ভারহুত লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। চিকুলা সম্ভবত মুম্বাইয়ের কাছে চাউল।

চিপলুন : মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার চিপলুন তালুকের প্রধান শহর। এখানে দ্বিতীয় পুলকেশীর দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

চিত্রকূটবন : কালিদাসের রঘুবংশ অনুসারে দণ্ডকারণ্যের অংশ এবং চিত্রকূটের কাছে একটি বন।

দধিপদ্র : কুমারপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দোহাদ। জয়সিংহের লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

দধিপদ্রক : তদানিন্তন কাথিয়াবাড়ের পঞ্চত্রি জেলায় অবস্থিত।

দণ্ডকবন : রামায়ণ প্রসিদ্ধ দণ্ডকবন সম্ভবত বুন্দেলখণ্ড থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু মহাভারত একে মহানদীর উৎসে আটকিয়ে রেখেছে। কালিদাস বলেছেন কলিঙ্গের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত দণ্ডক একটি বড় বন। এর মাঝখান দিয়ে একটি নদী ছিল। একটি গুহাও ছিল। জনস্থানের পশ্চিমে এই বন চিত্রকুঞ্জ বট বলেও পরিচিত ছিল। হর্ষচরিতে এর উল্লেখ আছে। মিলিন্দপঞ্হোতেও এই বনের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্বতের লাগোয়া দণ্ডকাবণ্য মঝিঝম দেশ থেকে দক্ষিণাপথকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। রঘুবংশ অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ জনস্থান।

দাশপুর : বৃহৎসংহিতা একে নগর বলেছে। মেঘদূতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি রাজপুতানা—মালওয়া রেলপথের শাখায় এক সুপরিচিত স্থান। পশ্চিম মালওয়ার মান্দাসোরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাণের কাদম্বরী অনুযায়ী এটি মাওয়ার—উজ্জয়িনীর অদূরে। প্রাচীন দানাপুর শিপ্রার উপনদী মিওয়ানার তীরে উপস্থিত ছিল। যশোধর্মনের মান্দাসোর স্তম্ভ শিলালিপিতে মান্দাসোর বা দাসোরের উল্লেখ রয়েছে। বন্ধুবর্মণের মান্দাসোর শিলালিপিতে লাট এবং দাশপুরার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম কুমার গুপ্তের লিপিতে যে দাশপুরার উল্লেখ রয়েছে তা সম্ভবত মালবগণের বা পশ্চিম মালবের প্রধান নগর ছিল এটি স্বাধীনরাজা নরবর্মণ ও তাঁর পুত্র বিশ্ববর্মণ শাসন করতেন। এটা প্রমাণিত যে সাতবাহনরা প্রথম দিকে ক্ষহরাট ক্ষত্রপ নহপানের হাত থেকে দশপুরা, নাসিক, সূর্পারক, ভৃগুকচ্ছ এবং প্রভাস আদি স্থান ছিনিয়ে নিয়েছিল। ক্ষহরাট ক্ষত্রপ নহপানের রাজত্বের সময় তাঁর জামাই উশবদাত অশোকের মতোই দশপুরায় অনেক জনহিতকর কার্য করেছিলেন। দশপুরা ও বিদিশা এ দুই প্রতিবেশী নগর গুপ্তযুগে উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধিতে হিংসা করত। গুপ্ত শাসনের যুগে দশপুরায় মালব বা 'কৃত' বৎসর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। মালবেরা সম্ভবত মান্দাসোর অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। এই মান্দাসোরে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরদের সব তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। অঙ্গুত্তর নিকায়তে কথিত, অবন্তী মহাজনপদ এবং রুদ্রদমনের জুনাগড় প্রস্তর লিপিতে উল্লিখিত অবন্তী ও জৈন ভগবতী সূত্রের মালব্য অঞ্চলকেই মান্দাসোর অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা যায়। মান্দাসোরেব রাজারা ৫৮ খ্রিঃ পূঃ শুরু হওয়া কৃত বৎসর ব্যবহার করতেন। মান্দাসোরের যশোবর্মণের প্রস্তর স্তম্ভলিপিতে জানা যায় যে মালবের রাজা যশোবর্মণ আক্রমণকারী হুণ নায়ক মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। আবার ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মালব বিতাড়িত হুণদের অধিকারে চলে যায়। প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে মান্দাসোরে একটি সূর্য মন্দির নির্মিত হয়। কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মণের মান্দাসোরের শিলালিপিতে নগর হিসাবে দানপুরীর এক ঘটনা রয়েছে। রেবানদী থেকে পারিপাত্র পর্বত ও নিম্ন সিন্ধুর উপত্যকায় বিস্তৃত রাজকীয় ভূমির কাব্যিক বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে ঐ লিপিতে।

দাভিগ্রাম : উত্তর গুজরাটের ডাভিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেবল : মধ্যযুগে এটি সিন্ধুর একটি বন্দর ছিল। এটি করাচির কাছে বা করাচি ও থাথ-এর মধ্যে অবস্থিত ছিল। এটি বঘার নদীর তীরে বা লারি বন্দরের কাছে ছিল।

দেবরাষ্ট্র : মহারাষ্টের সাতারা জেলার একটি গ্রাম।

ধমভিক : মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার একটি গ্রাম।

দেওয়ান : নাসিক জেলার ইয়েল তালুকের একটি গ্রাম।

ধণকতীর্থ : তদানিন্তন কাথিয়াবাড়ের পাচ্ছত্রি জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ঘুমলীর ক'মাইল দূরে গোণ্ডালের ধানককে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধানক একই নামে এক পাহাড়ের ধারে অবস্থিত জৈন তীর্থ।

ধুলিয়া : এটি তদানিন্তন খান্দেশ জেলায় অবস্থিত। এখানে কারক-রাজার তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

দোহাদ : বরোদার ৭৭ মাইল উত্তর পূর্বে পঞ্চমহল সাব-ডিভিশনের দোহান্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বারাবতী : এটিকে কুশস্থলীও বলা হয়। এটি যাদবদের রাজধানী ছিল। দ্বারাবতী কৃষ্ণ-বলরামের বাসভূমি ছিল। রেবত এটি নির্মাণ করে। কৃষ্ণ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

এরান্ডপল্ল : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। তদানিন্তন খান্দেশ জেলার এরান্ডলকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরান্ডি : এটি নর্মদার উপনদী উরি।

এরুথন : কীর্তিরাজার সুরাট তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। বালেসরার ২ মাইল উত্তর পশ্চিমে আধুনিক এরাথনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গদগ : মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার গদগ তালুকের প্রধান নগর। এখানে রয়েছে ত্রিকুলেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির গাত্রের একটি স্তম্ভে একটি লিপি পাওয়া গেছে। এই লিপিটি হোয়সল রাজ দ্বিতীয় বীরবল্লালের ভূমিদান বিষয় সংক্রান্ত। যাদব ভিল্লমা-র একটি লিপিও ত্রিকুলেশ্বর মন্দিরে পাওয়া যায়।

গামধারিকাভূমি : এটি কল্যাণের উপকণ্ঠে।

গাধিপুর : অর্থাৎ কনৌজ।

গাভলাগ্রাম : এটি উত্তর গুজরাটে, সম্ভবত দিলমলের কাছে।

ঘরপুরী : এটি মুম্বাইয়ের অদূরে এলিফান্টার একটি দ্বীপ। এলিফান্টা নামটি পর্তুগীজদের দেওয়া। কারণ তারা বড় গুহাটির প্রবেশ পথে একটি হাতির মূর্তি দেখেছিল। এলিফান্টার গুহাগুলিতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হলঘরের দেওয়ালে দেখা যায়।

ঘুমলি : এটি কাথিয়াবাড়ের নয়া নগর। এখানে দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে। এর প্রাচীন নাম ভূতামবিলিকা। কথিত আছে যে ভূতামবিলিকা জেথ্ব রাজপুতদের রাজধানী ছিল। এদের বংশধরেরা হচ্ছে পোর বন্দরের রাণারা।

গিরিনগর (গির্নার) : এটি লুডারের তালিকায় নগর বলে উল্লেখ রয়েছে। জৈন অনুযোগ দ্বারায় বলা হয়েছে, গিরিনগর উরজয়ন্ত পর্বতের কাছে অবস্থিত। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বলা হয়েছে জুনাগড় জুনাগড় রাজ্যের প্রধান নগর। এটি গিরিনগর বা গিরনার বলেও পরিচিত। উরজয়ন্তও বলা হয়েছে লিপিতে। অশোকের সময় যবনরাজ তুশাস্ফ সৌরাষ্ট্রের প্রাদেশপাল ছিলেন এবং গিরিনগর তাঁর রাজধানী ছিল। রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি থেকে একথা জানা যায়। গুজরাটের কাছে গিরনার বা রৈবতক পাহাড়। এখানে জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথ জন্মেছিলেন। সুবর্ণরেখা (পলাশিনী) নদী এর পাদদেশ

দিয়ে বয়ে যায়। গোবিন্দদাসের কড়চা থেকে জানতে পারি শ্রীচৈতন্য গিরিনগরে এসেছিলেন।

গির্না : সহ্য বা পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

গোপালপুর : জব্বলপুর জেলার ভোরঘাটের দক্ষিণ-পূর্বে এই গ্রামটি অবস্থিত। এটি নর্মদার দক্ষিণ তীরে।

গোবর্ধন : যোগিনীতন্ত্র অনুযায়ী দৈত্যকেশির দেহাস্থি থেকে এই পাহাড়। হরিবংশ বলেছে, এটি সুউচ্চ এবং মান্দার পর্বতের মতো এর একটি শৃঙ্গ রয়েছে। এটি আধুনিক নাসিকের কাছে, এটি গোবর্ধনপুর বলেও পরিচিত। নহপান এবং পুডুমাভির সময়ে স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে বড় আধুনিক গ্রাম গোবর্ধন—গঙ্গাপুর চিহ্নিত করা হয়েছে।

গুর্জর : হিউয়েন সাঙের ভাষায় কিউ-চে-লো। এটি বল্লভীর ৩০০ মাইল উত্তরে বা উজ্জয়িনীর ৪৬৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা আগে পাঞ্জাবে ছিল। সেখান থেকে কাথিয়াবাড়ে চলে আসে এবং তাদের থেকেই নাম হল গুজরাট।

হরিশচন্দ্রগড় : মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায় অকোলার কাছে একটি দুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফুট উঁচুতে।

হরিসেনানক : প্রাচীন স্বর্ণমঞ্জরী জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত। এটি সম্ভবত আধুনিক গ্রাম হরিয়াসন।

হস্তবপ্র (হস্তকবপ্র) : কাথিয়াবাড়ের ভবনগরে আধুনিকগ্রাম হাথাব। এটি ব্রোচ জেলার বিপরীতে। অনেক গুলি প্রাপ্ত বল্লভী-তাম্রপত্র-সনদে (৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) একে একটি জেলার সদর কার্যালয় বলা হয়েছে।

হুল্লুমগুর (হুলগুর) : মহারাষ্ট্রের ধারওয়ার জেলার বাংকাপুর ডিভিশনে অবস্থিত। এখানে বিক্রমাদিত্য (৬ষ্ঠ্য)-র লিপি পাওয়া গেছে।

ইনটয়া : জুনাগড়ের পাহাড়ের কাছে এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছিল ইনটয়া। এখানে অশোক, রুদ্রদমন ও স্কন্দগুপ্তের লিপি পাওয়া গেছে।

জরক : এটি হাইদেরাবাদ ও থথের মধ্যবর্তী সিন্ধুর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। এটিই এখন মধ্যসিন্ধু ও নিম্নসিন্ধুর সীমারেখা।

জরখেড (জরখেভ) : মহারাষ্ট্রের তদানিন্তন খান্দেশ জেলার শতদল তালুকে একটি গ্রাম। এটি তাপ্তীর উপনদী গোমীর তীরে অবস্থিত।

জয়পুর : এটি আধুনিক জিতপুর। মহারাষ্ট্রের নানদেদের ৬ মাইল পূর্বে।

জীর্ণদুর্গা : এটি জীনাগড়ের একটি দুর্গ। দামোদর ঘাটের কোলে এবং গির্নারের ঢালে অবস্থিত। দুর্গটি জীর্ণদুর্গা নামে পরিচিত।

জুনাগড় : গির্নার দেখুন।

জুন্নিনগর : পুণার ৫৫ মাইল উত্তরে জুন্নারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কচ্ছ : পশ্চিম ভারতের একটি দেশ। কচ্ছ বা মরুকচ্ছকে চিহ্নিত করা যায়। পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ীতে এর উল্লেখ আছে।

কালিয়ানগ্রাম : এটি উত্তর গুজরাটের কালিয়না।

কল্লিবন : এটি নাসিক জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশের কলবন।

কনহেরি : মুম্বাইয়ের ২০ মাইল উত্তরে কানহেরি নামে এক গুচ্ছ গুহা রয়েছে। বহু বছর ধরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই গুহায় বসবাস করেছিলেন। এটি থানার কাছে। একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি পাহাড় খোদাই করে গুহাগুলি নির্মিত (৮ম/৯ম খ্রিঃ)। একটি গুহা পাওয়া গেছে যা ৮৬ ফুট লম্বা ও ৩৯ ফুট চওড়া। ৩৪টি থাম রয়েছে। দুটি বিরাটাকারের বুদ্ধমূর্তি ও দাঁড়িয়ে থাকা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রয়েছে।

করহকট (করহাটনগর বা করহাট) : ভারহুত লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার আধুনিক করহাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

কর্দম-আশ্রম : গুজরাটের সিদ্দাপুরে ছিল কর্দম ঋষির আশ্রম।

কালয়হান : একটি শহরের নাম।

কলহন (কল্যাণ বা কালয়ন) : একটি শহরের নাম।

কানহাইরি : খান্দেশের চল্লিশ গাঁও-এর আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কানহেরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কারলি : মুম্বাই-পুণের মধ্যবর্তী ভোরঘাট পাহাড়ের কারলি আর ভাজা বলে দুটি বৌদ্ধ গুহামন্দির রয়েছে। এ দুটি খ্রিস্টাব্দ শুরু হবার সময়কার। কাছাকাছি রেল স্টেশন মালবলি। গুহা লিপিতে নহপান এবং রাজা ধুক্তপানের নাম উল্লেখ রয়েছে।

কেলোড়ি (কেঢ়ওয়াড়ি) : তদানিন্তন বিজাপুর জেলার প্রধান শহর বাদামির ১০ মাইল উত্তরে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে সোমেশ্বর (প্রথম) এর একটি লিপি পাওয়া গেছে (১০৫৩ খ্রিঃ)

খরজুরিকা : মালব প্রদেশের বা আশেপাশে এই গ্রামটি অবস্থিত। উজ্জয়িনীর চারপাশে এই এই নামের গ্রাম খুবই সাধারণ।

খানাপুর : সাতারা জেলার খানাপুর তালুকের প্রধান নগর।

খেদা : হিউয়েন সাঙের মতে দেশটি মালবের ৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

খেটক : এটি গুজরাটের আধুনিক খেরা।

কোডাবল্লি : কোল্হাপুরের ৭ মাইল পূর্বে কোডলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোল্লাপুর : আধুনিক কোল্হাপুরের প্রাচীন নাম।

কোল্লাগিরি : বৃহৎ সংহিতায় উল্লিখিত আধুনিক কোল্হাপুর।

কোলূর : এই গ্রামটি ধারওয়ার জেলার করাজগি তালুকে।

কোটিনারা : সৌরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

কুকুর : উত্তর কাথিয়াবাড়ের অনর্তের কাছে একটি দেশ। ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত কুকুররা সম্ভবত দ্বারকা অঞ্চল অধিকার করেছিল। বৃহৎসংহিতায় একে পশ্চিম ভারতে বলা হয়েছে। গৌতমী বালশ্রীর নাসিক লিপিতে জানা যায়, তাঁর পুত্র সুরথ, মুলক, অপরান্ত, অনুপ এবং বিদর্ভদের জয় করেছিল। রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপিতে দেখি, তিনি কুকুরদের জয় করেছিলেন।

কুলেনুর : ধারওয়ার জেলায় অবস্থিত এই গ্রামটি। এখানে জয়সিংহ দ্বিতীয়ের লিপি

পাওয়া গেছে।

কুম্ভারোটকগ্রাম : এটি উত্তর ও মধ্য গুজরাট। মোদাসার ১৩ মাইল পূর্বে কামরোদকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কুশস্থলপুর : এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি দ্বারকার প্রাচীন নাম। এটি অনর্তের রাজধানী কাথিয়াবাড়।

কুশাবর্ত : যোগিনীতন্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। নাসিক থেকে ২১ মাইল দূরে গোদাবরীর উৎসের কাছে একটি পবিত্র জলাশয়।

লক্ষমেশ্বর : এটি ধাওয়ার জেলার লক্ষমেশ্বর তালুকে। এখানে যুবরাজ বিক্রমাদিত্যের স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে।

লাট : বন্ধুবর্মণের মান্দাসোর লিপিতে আমরা লাটের উল্লেখ পাই। অনেকে মনে করেন, লাট হচ্ছে দক্ষিণ গুজরাট সঙ্গে রয়েছে খান্দেশ। মাহী ও নিম্ন তাপ্তীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এটি গুজরাটের ও উত্তর কোঙ্কনের প্রাচীন নাম। কর্ণের রেওয়া শিলালিপি অনুযায়ী মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাটই হচ্ছে লাট অঞ্চল। লাটরাষ্ট্র ও লাটরাজ্য একই এবং দীপবংশে বলা হয়েছে সিংহপুরা (সীহপুরা) এর রাজধানী। সম্ভবত টলেমিই এই দেশের কথা সর্বপ্রথমে বলেন। তাঁর মতে লারিকে ইন্দো-স্কাইথিয়ার পূর্বে সমুদ্র উপকূল ঘেঁসে অবস্থিত ছিল। সিংহলের পালি গ্রন্থে বলা হয়েছে এই লাট থেকেই যুবরাজ বিজয়ের নেতৃত্বে আর্যেরা সিংহলে অভিবাসী হয়েছিল। কিন্তু এই লাট আর বাংলার রাঢ় নিয়ে দুই জাতেরই বিতর্ক রয়েছে। গুপ্তযুগের প্রথমদিকে লাটদেশ একটি প্রশাসনিক বিভাগে পরিণত হয়েছিল।

লোন : ভিয়ান্দির একটি গ্রাম লোনদকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহল্লালাট : বৃহত্তর লাট। আমরৌতি জেলার মোরসির লাড়কিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহেনজোদারো : এটি সিন্ধের লারকানা প্রদেশে অবস্থিত। এখানে খ্রিঃ পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের একটি নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই নগর সভ্যতা ছিল বিস্ময়কর।

মহাবল : সাতারা জেলার মহাবালেশ্বরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহী : মহতী, মহীতা এবং রোহী একই। নদীটি পারিপাত্র পাহাড় থেকে উৎপন্ন এবং কাম্বেতে সাগরে পড়েছে।

মমজরবাটক : সাতারা জেলার গ্রাম মামজরদেকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মনগোলি : এটি তদানিন্তন বিজাপুর জেলার একটি গ্রাম।

মান্দাসোর : দাশপুর দেখুন।

মনকনিকা : বরোদা জেলার মামকানিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ময়ূরেয়পল্লিকা : নাসিকের তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে মোরওয়াড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ময়ূরখণ্ডি : গোবিন্দ (তৃতীয়)র অঞ্জানবতী তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটদের সময় এটি তাদের রাজধানী ছিল। বুম্বার নাসিক জেলার বানির উত্তরে

এবং সপ্তশৃঙ্গির কাছে সাতমালা বা অজন্তা পর্বতমালার ময়ূরখণ্ডি বা মোরখণ্ড নামে একটি শৈলদুর্গকে চিহ্নিত করেছেন।

মিন্নাগর : ২য় শতকে এটি নিম্ন সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী ছিল। টলেমি এটিকে বিনগর বলেছেন। 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী'র লেখক বলেছেন, রাজা মামবারুস (কেউ বলেন নহপান)-এর রাজধানী মিন্নাগর ছিল এরিয়েকে অর্থাৎ অপরান্তিক-এ।

মিরাজ : মহারাষ্ট্রের মিরাজে জয়সিংহ (দ্বিতীয়)-এর (১০২৪ খ্রিঃ) তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

মিরিঞ্চি : মিরাজ।

মোহাডবাসক : হরশোলা দানপত্রে এর উল্লেখ আছে। আমেদাবাদ জেলার আধুনিক গ্রাম মোহদশাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোটা মাচিয়ালা : এউরেলির ৭ মাইল উত্তর পূর্বে একটি গ্রাম।

মুকুড়শিবয়িবা : এটি কল্যাণের একটি এলাকা।

মূলবাসর : এটি দ্বারকার ১০ মাইল দূরে ওখামণ্ডলে অবস্থিত। এখানে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদমন (প্রথম)-এর (২০০ খ্রিঃ) একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

মূলগুণ্ডা : ধারওয়ার জেলার আধুনিক মূলগুণ্ডা গ্রাম।

মুসিক : এরা আলেকজাণ্ডারের ঐতিহাসিকদের জানা উত্তরের মুসিকনোসদেরই একটি অংশ। আধুনিক সিন্দের বিশাল এক অংশে এরা বাস করত। সিখুর জেলার আলোরকে রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এরিয়ান বলেছেন, এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণরা খুব প্রভাবশালী ছিল। এই ব্রাহ্মণেরাই আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে মুসিকনোসদের উৎসাহিত করে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার হঠাৎ আক্রমণে তাদের পর্যুদস্ত করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত মুশিকরাই সম্ভব মুসিক বা মুসক। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যের মুসিকাররা সম্ভবত মুসিকই।

নন্দীবর্ধন : মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলার রামটেকের কাছে নগরধন বা ননদারধনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষ্ণ (তৃতীয়)র দেওলি তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

নরবন : রত্নগিরি জেলার গুহাগড় পেটার সমুদ্রতীরে একটি গ্রাম। এর ৪ মাইল দূরে রয়েছে আধুনিক চিন্দ্রবল।

নরেন্দ্র : গ্রামটি ধারওয়ার জেলায় অবস্থিত।

নাউসারি : নাগসারিকা দেখুন।

নবপত্তলা : যে জেলায় এটি অবস্থিত ছিল সম্ভবত তা আধুনিক নয়াখেরা অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। নয়াখেরা তিখারীর ৮ মাইল পশ্চিম অবস্থিত।

নাগসারিকা : করক্করাজ সুবর্ণবর্ষের সুরাট তাম্রপত্রে দেখা যায়, সুরাটের ২০ মাইল দক্ষিণে আধুনিক নৌসারি। এখানে ৪২১ খ্রিষ্টাব্দের শিলাদিত্যের তাম্রপত্র পাওয়া গেছে। এটি নবরাষ্ট্র বা টলেমির ব্রোচ জেলার নোয়াগ্রাম্ম বলেও পরিচিত।

নাগুম : উরানের দুমাইল দক্ষিণ পশ্চিমে—আধুনিক নওগাঁও।

নান্দীপুরবিষয় : গুর্জ্জর জয়ভট্ট (তৃতীয়)-এর অঞ্জেরী তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। রাজাপিপলের করজান নদীর তীরে নামদোদকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নাসিক : নাসিক গুহার দুটি প্রাচীনতম লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ভারহুতের 'ভোটিভ লেবেল' নং ৩৮এ নাসিকের উল্লেখ রয়েছে। এটি পুরাণের নৈসিক বা নাসিক এবং রামায়ণের জনস্থান। বৃহৎ সংহিতার নাসিক্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে এটি নর্মদার তীরে অবস্থিত ছিল। লক্ষণ কর্তৃক সূর্পনখার নাক কাটার জন্য এই নাম। অন্ধ্রে সাতবাহন রাজাদের আমলে নাসিক ভদ্রযানী বৌদ্ধ মতের এক দৃঢ় কেন্দ্র ছিল। নাসিক শহরের তিনটি অংশ এবং পুরনো নাসিক বা পঞ্চবটিবন গোদাবরীর তীরে। মধ্যনাসিক ন'টি পাহাড়ের মাথায় গোদাবরীর ডানতীরে। আধুনিক নাসিক পঞ্চবটির পশ্চিমে গোদাবরীর ডানতীরে অবস্থিত।

নাসিকের বৌদ্ধগুহাগুলি সুপরিচিত। রাস্তা থেকে ৩০ ফুট উঁচুতে গুহাগুলি নির্মিত। এখানে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি আছে—ধর্মচক্রমুদ্রায় এবং ধ্যানমুদ্রায়।

নিডগুণ্ডি : কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলার বাংকাপুর তালুকের একটি গ্রাম। এখানে বিক্রমাদিত্য (৬ষ্ঠ)র একটি লিপি পাওয়া গেছে।

নিডগুণ্ডিপত্রক : এটি আধুনিক নাগরবাড়—দাভোই থেকে ১২ মাইল দূরে।

নিসাদ : রুদ্রদমনের জুনাগড় শিলালিপিতে প্রথম উপজাতীয় রাজ্য নিষাদদের উল্লেখ পাই। রুদ্রদমন পূর্ব ও পশ্চিম মালব, প্রাচীন মাহিষ্যতি অঞ্চল, গুজরাটের দ্বারকার চতুর্দিকের জেলাগুলি, সৌরাষ্ট্র, অপরান্ত, সিন্ধুসৌভির এবং অন্যান্য দেশ সমেত নিষাদ রাজ্য জয় করেন। নিষাদ দেশটি লুডারের তালিকায় ৯৬৫ নং। মোকালর চিত্রগড় লিপি (বিক্রমাব্দ ১৪৮৫) বলে, মোকাল নিষাদদের উপজাতি রাজ্য সহ অঙ্গ, কামরূপ, বঙ্গ, চিনস এবং তুরুশকদের জয় করেন। পরবর্তীকালের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণগুলিতে সর্বপ্রথম নিষাদদের উল্লেখ করা হয়। পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে এরা ছিল বন্য শিকারী ও জেলে। পারজিটার বলেছেন, তারা নিম্নসংস্কৃতির লোক এবং ভূমিজ ছিল। এরা আর্যসংস্কৃতির বাইরে অবস্থান করত। রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ গুহ এমনই ছিল। মনু বলেছেন, নিষাদরা ব্রাহ্মণপিতা ও শুদ্র মাতার সন্তান। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে মনে হয় নিষাদের বাসস্থান ছিল বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার পাহাড়গুলিতে যেগুলি ঝালয়ার ও খান্দেশের সীমারেখা রচনা করেছিল। রামায়ণ অনুসারে গঙ্গার উত্তর দিকে প্রয়াগের বিপরীতে শৃঙ্গভেরপুরা ছিল নিষাদদের রাজধানী। বিশাল এই দেশটি গুহক শাসন করতেন। ইনি রামচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে নিষাদ দেশ পশ্চিমী ক্ষত্রপদের অধিকারে আসে।

ওস্সাদিওই : সেন্ট মার্টিনের মতে ওস্সাদিওই এবং মহাভারত বর্ণিত বশাস্তিরা শিবি ও সিন্ধুসৌবীরদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই উপজাতিদের সঠিক বাসস্থান জানা যায় না।

ওসুমভল : আধুনিক উমবেলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অল্লাশক্তির একটি দানপত্রে এই গ্রামের একটি ভূমিদানের কথা লেখা রয়েছে।

পচ্ছত্রি : এটি আধুনিক পছতরদি—গুমলির ৬ মাইল পশ্চিমে।

পড়িবস : এটি হয় উরানের প্রায় ২ মাইল উত্তর পূর্বের ফুন্ডা বা উরানের তিন মাইল উত্তরে পাঞ্জা গ্রাম।

পলাশবনক : কীর্তিরাজের সুরাট তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। সুরাট জেলার আধুনিক পলসনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পম্পা : এটি তুঙ্গভদ্রার একটি উপনদী। এটি ঋষ্যমুখ পর্বতে উৎপন্ন।—অনগণ্ডি পাহাড় থেকে ৮ মাইল দূরে। এই নদীর তীরে রামের সঙ্গে হনুমানের দেখা হয়।

পঞ্চবটি : এটি হয় জনস্থানে অথবা তার সীমানায় অবস্থিত আধুনিক নাসিক। জনস্থানের অধিবাসিনী—রাবণের ভগ্নী সূর্পনখার নাক-কান এখানেই লক্ষ্মণ কর্তৃক কর্তিত হয়। গোদাবরী নদীর কাছে অগস্ত্য আশ্রম থেকে স্থানটি দূরে নয়। এখানে এক পর্ণকুটিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কিছুকাল বাস করেছিলেন।

পঞ্চাপসর : পঞ্চবটি ও চিত্রকূটের মধ্যবর্তী এক হ্রদ। সতকর্ণীর প্রিয় হ্রদ ছিল এটি।

পানধারপুর : ভীমা নদীর ডানতীরে শহরটি অবস্থিত। এখানে বিথবের বিখ্যাত মন্দির রয়েছে।

পলাসিনী : উরজয়ত পর্বত (উরজয়ন্ত) থেকে নির্গত একটি নদী। কেউ কেউ ছোটনাগপুরের কোয়েলের উপনদী পরাসকে চিহ্নিত করেন।

পলিতানা : এটি কাথিয়াবাড় জেলায় অবস্থিত। এখানে সিংহাদিত্যের দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

পট্টদাকল : তদানিন্তন বিজাপুর জেলার বাদামির আট মাইল দূরে একটি গ্রাম। এখানে দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের সময়কার একটি স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে।

পানাড : মহারাষ্ট্রের কোলাবা অঞ্চলে আলিবাগের ৮ মাইল দূরে পেইনাদ।

পারশিক : থানের কাছে কোনও দ্বীপ। কেউ বলেন এটি পারস্য উপসাগরের ওরমুজ দ্বীপ।

পাবকদুর্গ : পঞ্চমহাল জেলার বরোদার ২৯ মাইল পূর্বে পাবাগড় পাহাড়ি দুর্গ।

প্রভাস : নহপানের সময় (১১৯-১২৪ খ্রিঃ) নাসিক লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি কাথিয়াবাড়ে। এটাই প্রসিদ্ধ প্রভাস-পাটন বা সোমনাথ পাটন। একে প্রভাসতীর্থ বলা হয়। ভাগবত পুরাণে এই পবিত্র ভূমিকে সমুদ্রকূলে অবস্থিত বলে বলা হয়েছে। মহাভারত, কূর্মপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র, পদ্মপুরাণে এই প্রভাসতীর্থের উল্লেখ রয়েছে।

প্রায়েস্টি অঞ্চল : অক্সিকানোসের অধিবাসীরা প্রায়ষ্টি বলে পরিচিত ছিল। মহাভারতের প্রোশথরা এরাই। কানিংহামের মতে এই প্রায়েষ্টি দেশ সিন্ধুনদের পশ্চিমে লারকানার চারধারের সমতল ভূমিতেই ছিল। অক্সিকানোসরা আলেকজাণ্ডারের বিরোধীতা করে ব্যর্থ হয়।

পুরন্ধর : পুণার দক্ষিণ পশ্চিমে একটি পাহাড়ি দুর্গ। এখানে কিছু অচিহ্নিত গুহা রয়েছে। গুহাগুলি এমনই যা ভারতে দেখা যায় না।

পুরাবি : পূরাবী হচ্ছে নদী পূর্ণা। এরই তীরে রয়েছে নৌসারী।

রৈবতক পাহাড় : রৈবতক বা গির্নার পাহাড় দ্বারকার কাছে। জুনাগড়ের কাছাকাছি। প্রভাসও এর কাছে। মহাভারতে বলা হয়েছে। এই পাহাড়ে এক উৎসবের সময় দ্বারকাবাসীরা সমবেত হয়েছিল। জুনাগড়ে স্কন্দগুপ্তের লিপিতে জানা যায় রৈবতক পাহাড়

উর্জয়ত বিপরীতে। ঈশান বর্মণের জৌনপুর শিলালিপিতে বলা হয়েছে, এটি বিন্ধ্য পর্বত সংলগ্ন। ফ্লিট গিরনারের দুটি পাহাড়ের একটিকে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু আসল গির্নারকে নয়। মহামুদার দোহাদ শিলালিপিতে বলা হয়েছে, রৈবতক পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মন্দির ছিল এবং সেটাই আধুনিক গির্নার। গিরনার রাজা দত্তাত্রেয়র গুরু নেমিনাথের জন্মভূমি। সুবর্ণরেখা নদী গির্নারের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত। নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দির রয়েছে এখানে। বৃহৎসংহিতায় গির্নারকে বলা হয়েছে গিরিনগর। অশোক, স্কন্দগুপ্ত এবং রুদ্রদমনের লিপিতেও বিখ্যাত এই গির্নারদের। স্কন্দগুপ্ত ও রুদ্রদমনের শিলালিপিতে জানা যায় যে গির্নার, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও গুপ্তরাজাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বাসস্থান।

রংপুর : আমেদাবাদ জেলার লিমদির ২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

রামতীর্থ : এটি সোপারগে অবস্থিত। মুম্বাইয়ের ৪০ মাইল উত্তরে বেসিনের কাছে সোপারায় একটি পবিত্র জলাশয়। উশবদাতের এক দানপত্রে দেখা যায়, এটি তিনি এক সন্ন্যাসীকে দান করেছিলেন।

রামতীর্থিকা : এটি সম্ভবত রামতীর্থই।

রাষ্ট্রিক : অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

রায়গড় : মহারাষ্ট্রের কোলাবা অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বিজয়াদিত্যের তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

রেট্টুরক : সাতারা জেলায় কারহাদ তালুকের রেটারেককে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৃষ্ণার দুইতীরে একই নামে দুটি গ্রাম রয়েছে।

রোন : ধারওয়ার জেলার আধুনিক রাউ।

রোরুকা : দিব্যাবদান অনুযায়ী এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল। আদিত্ত জাতকে উল্লিখিত সৌবীর দেশের রাজধানী। কানিংহাম কাম্বে উপসাগরের মাথার দিকে গুজরাটের এডার জেলাকে চিহ্নিত করেছেন। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় এখানকার এক বিখ্যাত রাজার নাম রয়েছে—রোরুকার রুদ্রায়ন। রাজা রুদ্রায়ন মগধের বিম্বিসারের সমসাময়িক এবং তাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রোরুক ও রাজগৃহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

সবরবতী : এই নদীর উৎস পারিপাত্র পাহাড়। কাম্বে উপসাগরে পড়েছে।

শকদেশ : পাণিনীর অষ্ট্যাধ্যয়ীতে এর উল্লেখ রয়েছে। বৃহৎ সংহিতা বলেছে এটি শকদের দেশ।

শম্ভু (স্যামবোস) : প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মতে মুসিকানোদের রাজ্যের সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে ছিল শম্ভুদের রাজ্য। এই দুই জাতের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ ছিল। এর রাজধানী ছিল সিনদিমান যা সেওয়ান বলে চিহ্নিত। শম্ভুরা আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

সমুদ্রপাট : জব্বলপুরের ৪ মাইল দূরে সামাদ পিপারিয়াকে চিহ্নিত করা হয়।

সরভপুর : রাজা মহান্ত দেবরাজের রায়পুর তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

শত্রুঞ্জয় বা সিদ্ধাচল : কাথিয়াবাড়ের পঞ্চ পাহাড়ের মধ্যে এটিই জৈনদের কাছে পবিত্রতম। পূর্বে রয়েছে পালিতন এবং ৭০ মাইল দূরে সুরাট। কুমার পালের গুজরাটের শাসনকর্তা বাগভট্টদেব এখানকার শত্রুঞ্জয় মন্দিরের সংস্কার করান। শত্রুঞ্জয় বা সিদ্ধক্ষেত্র

পাহাড়ে জৈন মন্দিরে কয়েকটি লিপি পাওয়া গেছে। এই পাহাড়ের চৌমুখ মন্দিরটি সর্বোচ্চ। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তি এখানে এসেছিলেন। গ্রীমদ ঋষভের উত্তরে পাণ্ডব প্রতিষ্ঠিত গুহাটি এখনও রয়েছে।

সালোটগি : বিজাপুর জেলার ইনদি তালুকের একটি বড় গ্রাম।

সাতোদিক : সৌরাষ্ট্রের একটি নদী। রাজপুরোহিতের পুত্র তক্ষশিলায় শিক্ষিত জেটিপাল সন্ন্যাসী হয়ে এই নদী তীরে বাস করতেন।

সেরিব : জাতকে এর উল্লেখ রয়েছে। সেরিয়ার একটি সমুদ্র বন্দর শহর—ভাহুতে স্তুপের একটি 'ভোটিভে' এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি শ্রীরাজ্য বা মহিশূরের পরবর্তী গঙ্গরাজ্য। বরুয়া এবং সিনহা ঠিকই বলেছেন যে সূর্পারক এবং ভৃগুকচ্ছের মতই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল সেরিয়াপুট। ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সেরিবকে চিহ্নিত করা হয়।

সিগ্নাবে : ধারওয়ার জেলার সিগগাঁওকে চিহ্নিত করা হয়।

সিহরগ্রাম : এটি গুজরাটে অবস্থিত দেলভাদের ৮ মাইল উত্তরপূর্বের সের।

সেরিয়াপুট : ভারহুত-এর উৎকীর্ণ লিপিতে এই নামটি রয়েছে। মনে হয় পশ্চিমে সুপ্পারক বা ভৃগুকচ্ছের মতোই একটি বন্দর ছিল। সেরিবের বনিকেরা তেলবাহ নদী পেরিয়ে অন্ধপুরে আসত।

সিন্ধুসৌবীর : পাণিনী তাঁর অষ্ট্যাধ্যয়ীতে সৌবীর ও সিন্ধু নাম দুটি উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলীর মহাভাষ্যেও এর উল্লেখ রয়েছে। সিন্ধু-সৌবীর নাম থেকে মনে হয় এটি সিন্ধু ও ঝিলম নদীর মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ছিল। সৌরীবদের প্রায়ই সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় যার থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী সময়ে এরা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সিন্ধুর পাড়ে বসতি গড়ে তুলেছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপিতে দেখা যায়, (১৫০ খ্রিঃ) মহাক্ষত্রপ সিন্ধুসৌবীর সহ পূর্বাপরা কারাবন্তী, অনূপনিবৃত, আনর্ত, সৌরাষ্ট্র, শ্ববর, মরু, কচ্চ, কুকুর, অপরান্ত এবং অন্যান্য দেশ জয় করেছিলেন। লুডারের তালিকায় এর নং ৯৬৫। বৃহৎ সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে।

ভাগবতী সূত্রে দেখা যায়, সৌবীরে রাজা উদয়নের পর রাজা হন তাঁর ভাগ্নে কেসী। তিনি তাঁর পুত্রকে বঞ্চিত করেন। মনে হয় সৌবীরে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা ছিল।

সম্ভবত ক্ষত্রপেরা কুষাণদের কাছ থেকে সিন্ধুসৌবীর ছিনিয়ে নিয়েছিল। ক্ষত্রপদের পরে এটি যায় গুপ্তদের হাতে। তারপর বল্লভীর মৈত্রকদের অধিকারে। গুজরাট চালুক্যদের নৌসারী তাম্রপত্রে দেখা যায়, পুলকেশীরাজ (৮ম শতক)—তাজিকদের (আরব বলে চিহ্নিত) পরাজিত করেন। এতে লেখা আছে তাজিকরা সৌন্ধবদের, কচ্ছেলদের, সৌরাষ্ট্রদের, চাবোটকদের, গুর্জরদের এবং মৌর্যদের পরাজিত করে। এ ঘটনা চালুক্যরাজাদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটার পূর্বেকার।

কানিংহাম গুজরাটের এডারকে সৌবীর বলে চিহ্নিত করেছেন। এর রাজধানী ছিল বোরুক।

শিরিশ পদ : শ্রীশ আর শিরিশ একই। গুর্জর লিপিতে শিরিশপদ্রক বলে একটি

গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

সিরুর : সিরিবুরের প্রাচীন নাম। ধারওয়ার জেলার গড়গ তালুকের একটি গ্রাম।

শিবপুর : সোরকোট লিপিতে উল্লিখিত শিবিপুরা। ডঃ ভোগেল মনে করেন সোরকোটের টিবিই ছিল শিবিদের নগর।

সোগাল : বেলগাঁও জেলার পরসগড তালুকের একটি গ্রাম।

সোমনাথদেবপট্টন : এটি কাথিয়াবাড়ের আধুনিক ভেরাওয়াল। এখানে একটি মূর্তিলিপি পাওয়া গেছে।

সোমনাথ : এটি জুনাগড়ে। এটিকে চন্দ্রপ্রভাসও বলা হয়। এটি জৈনদের এক পবিত্র তীর্থ। সোমনাথের চতুর্দিকে অনেক পবিত্র স্থান রয়েছে। যেমন ভালকতীর্থ যেখানে কৃষ্ণ তীরের আঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। এখানে পায়ে তীরবিদ্ধ কৃষ্ণের এক বসা মূর্তি আছে।

সোন্নালিগে : আধুনিক সোলাপুরের অংশ।

সোন্নে : অধুনা শাস্ত্রী নদী নরবনের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত।

শ্রীমত-অনহিলপুর : উত্তর গুজরাটের অন্নভাডা।

সুদর্শন : গিরিনগর বা গির্নারের অদূরে একটি হ্রদ। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের এক প্রশাসক বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত এই হ্রদ নির্মাণ করেন।

সুদি : ধারওয়ার জেলার রোম তালুকের প্রাচীন শুণ্ডিগ্রাম।

শূদ্র দেশ : মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী শুদ্রদের দেশ অপরান্ত বা ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ছিল। মহাভারত অনুযায়ী সরস্বতী যেখানে অন্তর্হিত হয়ে যায় সেখানেই ছিল শুদ্র দেশ। অর্থাৎ পশ্চিম রাজস্থানে 'বিনাশন'।

শূলিক : গুজরাটের সোলাকি বা সোলাংকি। কেউ কেউ বলেন এরা চালুক্য। ঈশ্বরবর্মণ মৌখারীর হারাহা লিপিতে এদের উল্লেখ রয়েছে।

সুনক গ্রাম : উত্তর গুজরাটের সুলক গ্রাম। উনঝা রেল স্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে।

সুরথা : কূর্ম, বরাহ ও ভাগবত পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। সুরসা নামেও পরিচিত। ঋক্ষ এবং বিন্ধ্য পর্বতে এর উৎপত্তি।

সুরাষ্ট্র : প্রাচীন ভারতের সুরাষ্ট্রেরা ছিল খুবই বিখ্যাত ছিল। সুরাষ্ট্র দেশের কথা রামায়ণে ও পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে উল্লেখ রয়েছে। লুডারের তালিকায় নং ৯৬৫। পদ্মপুরাণ বলেছে, এটি গুর্জরে। এটি আধুনিক কাথিয়াবাড়। হিউয়েন সাউ অনুযায়ী দেশটি আয়তনে ৪০০০ লী এবং পঞ্চাশটি বিহারে ৩০০০ মহাযান পন্থী ভিক্ষু বাস করত। ভাগবত পুরাণ ও বৃহৎ সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মতে সৌরাষ্ট্রের হাতিরা বঙ্গ-কলিঙ্গের হাতির চেয়ে নিকৃষ্টতর। পিঙ্গল নামে এক রাজা মৌর্যদের অধীনে সৌরাষ্ট্র শাসন করতেন।৮ এটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

হিউয়েন সাঙের মতে য়ুহ-শান-তা পাহাড়ের নীচে (প্রাকৃত—উজ্জন্ত, সং—উরজয়ত—রুদ্রদমন ও স্কন্দ গুপ্তের শিলালিপি অনুসারে—বর্তমান জুনাগড় বা প্রাচীন গিরিনগর—গির্নার)। মহাভারতের কালে সৌরাষ্ট্র দেশ শাসন করত যাদবেরা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে মনে হয়, সৌরাষ্ট্রে সঙ্ঘ ধরনের শাসন ছিল।

টলেমি সাইরাসট্রেন বলে একটি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন সেটি নিশ্চিত ভাবে সৌরাষ্ট্র (আধুনিক সুরাট)। 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী'তে সাইরাসট্রেনের উল্লেখ রয়েছে। স্কাইথিয়ানরা সৌরাষ্ট্র অধিকার করার পর তা গুপ্তদের হাতে চলে যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় শক সর্দার বা শক মুরুন্দেরা সৌরাষ্ট্র শাসন করত। তারও আগে এটি চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই মৌর্য অধিকারে আসে। অশোকের সময় তুসাস্ফ নামে এক পারসিক সামন্ত সৌরাষ্ট্র শাসন করতেন। রুদ্রদমনের লিপি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে এই তুসাস্ফ স্বাধীন রাজা হয়ে যান।

সূরপারক (পালি—সুপ্পারক) : থানে জেলার আধুনিক সোপারা। এটি সুনাপরান্তের বা অপরান্তের রাজধানী ছিল। হরিবংশ অনুযায়ী ঋষি রামজামদগ্ন্য এই নগর নির্মাণ করেন। সব পুরাণই বলে যে এটি একটি বড় বন্দর-বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

সূর্যপুর : এটি আধুনিক সুরাট। শঙ্করাচার্য এখানে তাঁর বেদান্ত ভাষ্য লিখেছিলেন।

সুসক : নাসিক লিপিতে বলা হয়েছে গৌতমীপুত্র এখানে রাজত্ব করতেন।

সুতীক্ষ্ণ-আশ্রম : এটি দণ্ডকবন হতে পারে। এখানে ঋষি সুতীক্ষ্ণ অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। রাম, লক্ষ্ণণ ও সীতা এখানে এসেছিলেন।

স্বভ্র : রুদ্রদমন (প্রথম)-এর (১৫০ খ্রিঃ) জুনাগড় শিলালিপিতে সবরমতীর তীরে একটি দেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তালেগাঁও : এটি পুণে জেলায়। রাষ্ট্রকূট রাজা কৃষ্ণ (প্রথম)-এর তাম্র দানপত্র এখানে পাওয়া গেছে।

তাউরনক : সম্ভবত আধুনিক তোরান—কর্জন নদীর তীরে।

তালধ্বজ : এটি কাথিয়াবাড়ের তালজা।

টেকাভর : বিমলশিবের জব্বলপুরের শিলালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। জব্বলপুরের ৫ মাইল দক্ষিণে ত্রিপারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিড়গুণ্ডি : এটি বিজাপুর জেলায় বিজাপুরের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে বিক্রমাদিত্য (ষষ্ঠ)-র তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

টোরামবাগে : কোলহাপুরে টুভাম্বে।

টোরানগ্রাম : দক্ষিণ গুজরাটের তোরানগাম।

তোরখেড়ে : প্রাচীন খান্দেশ জেলার একটি গ্রাম। এখানে গুজরাটের গোবিন্দরাজের (শক ৭৩৫) তাম্র দানপত্র পাওয়া গেছে।

ত্রয়ম্বকেশ্বর : গোদাবরীর উৎসের কাছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে স্থানটি অবস্থিত।

টুপ্পাদকুরহট্টি : কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলার একটি গ্রাম। এখানে আকালবর্ষকৃষ্ণ (তৃতীয়)-এর লিপি পাওয়া গেছে।

উজ্জন্তগিরি : উরজয়ত দেখুন।

উনা : কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণতম প্রান্তে একটি শহর। এখানে সংস্কৃতে লেখা দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

উরনা : আধুনিক উরান।

উরজয়ত : উরজয়ত (উজ্জন্ত) রুদ্রদমন ও স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপি থেকে বলা

যায়, এটি গির্নার পাহাড়—জুনাগড়ের কাছে। কেলাদি সদাশিব নায়কের ক্যাপ তাম্রপত্রে উজ্জন্তগিরির উল্লেখ রয়েছে আর এটিই গির্নাব। উরজয়তগিরি বলেও এটি পরিচিত। শ্রীনেমী কর্তৃক পুণ্যকৃত পাহাড়টি রৈবতক, উরজয়ন্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত। পাহাড়টি সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত। বস্তুপাল ঋষব, পুণ্ডরিক, অষ্টাপদর মূর্তি সমেত শত্রুঞ্জয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ভডাল : ভড়াল হচ্ছে গুজরাটের তদানিন্তন পচ্ছত্রি জেলার আধুনিক ভেটলিকা। জুনাগড়ের ৭ মাইল উত্তরে এটি একটি রেল স্টেশন।

বেদনগর : উত্তর গুজরাটের আনন্দপুরা। সিধপুর থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে। জৈন পিণ্ডনীরটিকা অনুযায়ী এটি বিন্ধ্যের কাছে অবস্থিত।

বৈদুর্যপর্বত : এটি গুজরাটের সাতপুরা পর্বত। ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম এই পাহাড়ে ছিল। দামি ল্যাপিস-লুজুলী পাথর পাওয়া যায় বলে এর নাম বৈদুর্যপর্বত। এই ছোট্ট গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়টি সহ্য পর্বতের সঙ্গে যুক্ত এবং এটিকেই টলেমির ওরাউডিয়ান পর্বত বলে চিহ্নিত করা হয়। পশ্চিমঘাটের উত্তরতম অংশ নিয়ে এটি গঠিত। কিন্তু মহাভারত বলে, দক্ষিণ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের অংশ নিয়ে গঠিত।

বৈজয়ন্ত : দণ্ডকারণ্যের মধ্যে একটি নগর। রামায়ণে বলা হয়েছে, দশরথ কৈকেয়ীব সঙ্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করতে এই নগরে গিয়েছিলেন এবং শম্বর রাজ্য জয় করেন।

বজ্রেশ্বরী : এখানে হিন্দুদের এক পবিত্র মন্দির রয়েছে।

বল্লভী : গুর্জরদের এক সমৃদ্ধিশালী নগর। রাজা ছিলেন শিলাদিত্য। গুজরাটের পূর্বাংশে ভাবনগরেব কাছে বল্লভীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ৫ম শতকের একটি লিপিতে বলা হয়েছে, বলভদ্রদের এই দেশটি সুন্দর ছিল। হিউয়েন সাঙ এটিকে ফা-লা-পি বলে জানতেন। হিউয়েন সাঙের মতে বল্লভী রাজ্য সমগ্র গুজরাট-উপদ্বীপ এবং ভারোচ এবং সুরাট নিয়ে গঠিত ছিল।

বল্লবাড : বর্তমান কোল্হাপুরের দক্ষিণপশ্চিমে রাধানগরীর জায়গায় ছিল বলয়বাড।

বড়বাড় : কোলহাপুর থেকে ২৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে।

বনকিকা : নাউসেরীর ৩০ মাইল দক্ষিণে বনকি স্রোতস্বনী।

বরদাখেট : অমরাবতী জেলার মোরসি তালুকের ওয়ারুদ।

বটপরদক (বটপত্রপুরা) : এটি বটপট্রনের প্রাচীন নাম। এর উল্লেখ রয়েছে ৭৩৪ শকের কারকরাজ (দ্বিতীয়)-এর বরোদা তাম্রপত্রে। এটিই আধুনিক বরোদা।

বট্টার : এটি বাতার গ্রাম—মহারাষ্ট্রের বাসিম তালুকের ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আগাসীতে অবস্থিত।

বাঘলি : তদানিন্তন খান্দেশ জেলার চল্লিশগাঁও এর ৬ মাইল উত্তর পূর্বে এই গ্রামটি অবস্থিত। এখানে শক ৯৯১ এর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

বাহাউলা : এটি বরোদার ভিলোদিয়ার ৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বের একটি গ্রাম—বাহোরা।

বালুরক : নহপানের (১১০—২৪ খ্রিঃ) সময়কার কার্লে গুহালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। মনে হয় কার্লে অঞ্চলের প্রাচীন নাম। কার্লে পুণা জেলায় অবস্থিত।

বেলুগ্রাম : এটি বেলগাঁও—কিরাতের ৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে বা পালঘরের ১৪ মাইল

পূর্বোত্তরে অবস্থিত।

বেগবতী : সৌরাষ্ট্রের উরুজয়ন্ত পর্বতে উৎপন্ন নদী।

বেনাকটক : গৌতমী সাতকর্ণীর নাসিক তাম্রপত্র অনুযায়ী বেনাকটক নাসিক জেলার বেন্বনদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

বেরাওয়াল : কাথিয়াবাড়ের প্রাচীন সোমনাথদের পট্টা। এখানে একটি মূর্তিলিপি পাওয়া গেছে।

বিন্ধ্যপাদপর্বত : মহাভারতে একে বিন্ধ্যপর্বত বলা হয়েছে। পদ্মপুরাণ ও কালিদাসের মেঘদূতে এর উল্লেখ রয়েছে। দশকুমারচরিতে বিন্ধ্য পর্বত সংলগ্ন বনাঞ্চলকে ভয়ঙ্কর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। টলেমি একে বলতেন কুইনডোন। এটি উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের সীমারেখা রচনা করেছে। ঋক্ষ, পারিপাত্র এবং বিন্ধ্য—অধুনা বিন্ধ্য পর্বত বলে পরিচিত পর্বতমালার অংশ।

বিঝহ নামে পরিচিত পর্বতটিকে সাতপুরা পর্বতমালা বলে চিহ্নিত করা যায়। এই পাহাড়ে খোদিত বিশালাকারের এক জৈন মূর্তি রয়েছে। সেটির নাম বাওয়ানগজ। আধুনিক ভূগোলবিদদের কথা, বিন্ধ্য পর্বত গুজরাট থেকে পূর্বে ৭০০ মাইল—বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও এদের অনেক স্থানীয় নাম রয়েছে, যেমন ভানের, কাইমুর ইত্যাদি। এই পর্বতশ্রেণীর গড় উচ্চতা ১৫০০—২০০০ ফুট। কোনও কোন শৃঙ্গ ৫০০০ ফুট উঁচু। এটি ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির নয়। মালব মালভূমি কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভাঁজ খেয়ে বিন্ধ্য পর্বতের সৃষ্টি করেছিল। মনে করা হয়, আরাবল্লীর পলি থেকেই বিন্ধ্যপর্বতের সৃষ্টি।

বিনঝাটবি : এই অরণ্য খান্দেশ ও আওরঙ্গাবাদের অংশ নিয়ে গঠিত এবং বিন্ধ্য পর্বতমালার নাসিক সহ পশ্চিম প্রান্তের দক্ষিণে অবস্থিত।

অরিট্ঠ নামে দেবানামপ্রিয়তিস্সর এক মন্ত্রীকে অশোকের কাছে বোধিবৃক্ষের একটি চারার জন্যে পাঠান হয়েছিল—তিনি এই বনভূমির ভেতর দিয়ে পাটলিপুত্রে গিয়েছিলেন।

ওয়ালা : মহারাজ ধরসেন (দ্বিতীয়—১৫২ খ্রিঃ)-এর মালিয় তাম্রপত্রে উল্লেখ আছে যে এটি কাথিয়াবাড় বিভাগের ওয়ালার মুখ্য শহর ছিল।

ইয়েক্কেরি : কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলার পরশগড় তালুকের মুখ্যশহর সাউনদত্তির কাছে একটি গ্রাম। এখানে দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়কার একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

মধ্যভারত

অচলপুর : অমরাবতী জেলার ইলিচপুর। কাম্বা ও বেন্না নামে দুটি নদী এর কাছ গিয়ে বয়ে যেত। কেউ আবার বলেন এটি অভীরাতে অবস্থিত ছিল।

অচাবড (অচ্চাবট) : এটি ঋক্ষবত পর্বত। টলেমির ভাষায় আউয়েনর্টন। লুডারের তালিকায় এর নং ৩১৯৩৪৮, ৫৮১ এবং ১২২৩। এটি বিন্ধ্যপর্বতমালারই একটি অংশ। টলেমি বলেছেন, ঋক্ষবত টাউনডিস, দোসারোণ, আডামাস, আউনডোন, নম্মাদোস, এবং ননগাউনার উৎস। ঋক্ষবত বলতে টলেমি নর্মদার উত্তরে আধুনিক বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যভাগকে বুঝিয়েছেন।

অচেন্ন : এটি সেওনার দক্ষিণতীরে মান্দাসোরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

অগর (শাজাপুর) : এটি উজ্জয়িনীর ৪১ মাইল উত্তরে।

আইরিকিন : সমুদ্রগুপ্তের ইরাণ শিলালিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। বীণা নদীর বাস তীরে ইরাম নামে গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে। এই মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার খুরাই সাব-ডিভিশনের খুরাইয়ের ১১ মাইল দূরে।

অজয়মেরু : চাহমান সোমেশ্বরের বিজহোলী শিলালিপিতে (বিঃ শকাব্দ ১২২৬) -এর উল্লেখ রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে চাহমান যুবরাজ অজয়দেব বা অজয়বাদ (১১০০—১১২৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত আজমীর।

অজয়গড় : কালাঞ্জরের ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি গিরিদুর্গ। এখানে দুটি চান্দেলা লিপি পাওয়া গেছে। এটিই এখন জয়পুরদুর্গের আধুনিক নাম অজয়গড়।

অমরকণ্টক : এই পাহাড়টি নাগপুরের গণ্ডোয়ানা অঞ্চলের মেখলা পাহাড়ের অংশ। এখানেই নর্মদা ও শোণ উৎপন্ন হয়েছে। তাই নর্মদাকে বলা হয় মেখলসুতা। অমরকণ্টক কালিদাসের মেঘদূতের অমরকূট। এটি সোমপর্বত এবং সুরথাদ্রি নামেও পরিচিত। মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী এটি কুরুক্ষেত্রে চেয়েও পবিত্রতর। পদ্মপুরাণ অমরকণ্টকে চণ্ডিকাতীর্থ বলে একটি পবিত্র স্থানের নাম উল্লেখ করেছে।

অম্বর : এটি রাজস্থানের জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী। জয়পুর রাজ্যের ক্রম অনুযায়ী তৃতীয় রাজধানী অম্বর ১০ বা ১১ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিকে অম্বাবতীও বলা হত। যা ধুন্দ বা ধুন্দাহদ রাজ্যের রাজধানী ছিল। কানিংহাম বলেছেন, অম্বরের অম্বিকেশ্বর মন্দিরের নাম থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি।

অমের : উদয়পুরের ১½ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

অমোদা : বিলাসপুর জেলার একটি গ্রাম। দুটি বিশাল তাম্রপত্রে লেখা একটি লিপি পাওয়া গেছে।

আমরোল (গোয়ালিওর) : এটি অন্ত্রি রেলস্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে।

অনর্ঘবল্লি : বিলাসপুর জেলার আধুনিক জাঞ্জগির তহশিল।

অংঘোরা : কাদওয়াহা থেকে ২½ মাইল দক্ষিণে।

অঞ্জনবতী : বেরারের অমরাবতীর ২২ মাইল দূরে চানদুর তালুকের একটি গ্রাম।

অন্ত্রি (গোয়ালিওর) : গোয়ালিয়রের ১৬ মাইল দক্ষিণে দিল্লি থেকে দাক্ষিণাত্যে

যাবার প্রাচীন পথের ধারে অবস্থিত। এখানে আবুল ফজলকে হত্যা করা হয়েছিল।

অরঞ্জর : মঝিঝম দেশের এক পর্বতমালা।

আরাবল্লি : কেউ কেউ অপোকোপাকে এই পর্বতমালা বলে চিহ্নিত করেন। এটি সম্ভবত ভারতের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত। এটি পশ্চিম রাজস্থানের মরু অঞ্চলকে পূর্বের উর্বর ভাগ থেকে পৃথক করেছে। নীচু পাহাড় হিসেবে এটিকে জয়পুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। মারওয়াড ছাড়িয়ে এর উচ্চতা বাড়তে থাকে এবং এর উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা ৪৩১৫ ফুট। আরাবল্লী পর্বতমালা বয়সের দিক দিয়ে বিন্ধ্যের চেয়েও প্রাচীনতর। অর্বুদ পর্বত (মাউন্ট আবু) যা আরাবল্লী থেকে একটি ছোট উপত্যকার দ্বারা বিচ্ছিন্ন পাহাড়।

অর্বুদ (আবু, জৈন—অবজয়) : এটি রাজস্থানের সিরোহী প্রদেশের আরাবল্লী পর্বত। এটিকে আর-বু (জ্ঞানের পাহাড়)ও বলা হয়। এটিই প্লিনির মাউন্ট ক্যাপিটালিয়া। এখানে ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল এবং অম্বা ভবানীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। মেগাস্থিনিস ও এরিয়ানের মতে এই পবিত্র পাহাড়টি প্লিনির ক্যাপিটালিয়া এবং ৬৫০০ ফুট উঁচু। সাভ্রমতী নদীর উৎস এই পাহাড়। এখানে অনেক জৈন মন্দির রয়েছে। যেমন প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দির। বস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি নেমিনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য।

অরথুনা : রাজস্থানে বানসওয়ারার ২৮ মাইল দূরে।

অস্নী : এখানেই মহল্লা-লাট অবস্থিত ছিল। বেলোরার ১০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অশষ্ঠিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অশিরগড় : মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার একটি শক্তিশালী দুর্গ। খাণ্ডয়ার ২৯½ মাইল দূরে। শরববর্মণের আশিরগড়ের তাম্রসিলমোহরে গিরিদুর্গ আশিরগড়ের উল্লেখ রয়েছে।

অবন্তী : একে অবন্তিকাও বলা হত। প্রথম রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি উল্লেখ করে, এটি আকরাবন্তী (মালব)। আকরা পূর্ব মালব—রাজধানী বিদিশা)। অবন্তী (পশ্চিম মালব, রাজধানী উজ্জয়িনী) সঙ্গে রয়েছে অনুপ (রাজধানী মাহিষ্যতি)। আনর্ত (উত্তর কাথিয়া-বাড়), সুরাষ্ট্র (দক্ষিণ কাথিয়াবাড়), শুভ্র—সবরমতীর তীরে, কচ্ছ (পশ্চিমভারতের কচ্ছ), সিন্ধু (নিম্নসিন্ধুর পশ্চিমভাগ), সৌবীর (নিম্ন সিন্ধুর উত্তর ভাগ), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়ের অনর্তের কাছে), অগরান্ত (পশ্চিম ভারতের উত্তর কোঙ্কন)। নিষাদ, যৌধেয়—এরা বিজয়গড়ে বাস করত। বাশিষ্ঠিপুত্র পুলমায়ীর নাসিক গুহা লিপিতে—অবন্তীর রাজধানী যে উজ্জয়িনী ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার প্রথম রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপিতে দুটি আকরাবংন্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পূর্ব ও অপরটি পশ্চিম। অশোকের শিলালিপিতে ভোজ, এবং রাস্টিক-রাষ্ট্রিক ও তাদের বংশধরদের রাজ্যগুলিকে মৌর্য-অবন্তীর বাইরে বলা হয়েছে।

অবন্তীর অবস্থান সম্পর্কে মহাভারত বলেছে, এটি পশ্চিম ভারতে—পবিত্র নর্মদা নদীর তীরে। বিরাট পর্বে অর্জুন অবন্তীর উল্লেখ পশ্চিম ভারতের দেশগুলির সঙ্গে করেছে—সৌরাষ্ট্র ও কুন্তী। শ্রীমতী রিজ ডেভিস বলেছেন, ২য় শতক পর্যন্ত একে অবন্তী

বলা হোত। কিন্তু ৭ম/৮ম শতক থেকে একে মালব বলা হোত। পশ্চিম মালব বা অবন্তির রাজধানী উজ্জয়িনী সিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। সিপ্রা চর্মন্বতির (চম্বলের) একটি উপনদী। অবন্তি মোটামুটি আধুনিক মালব, নিমার এবং মধ্যভারতের আশপাশের অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এর আবার দুটি ভাগ। উত্তর ভাগের রাজধানী উজ্জয়িনী ও দক্ষিণ ভাগের মাহিষ্যতি।

অবন্তিরা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ক্ষত্রিয় কুল। বিন্ধ্যের উত্তর অঞ্চল তারা অধিকার করেছিল। বুদ্ধের সময় এখানকার রাজতন্ত্র ভারতের গুরুত্বপূর্ণ চারটি রাজ্যের একটি ছিল। পরে তারা মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মহাভারতের মতে এরা প্রাচীন জাতি। এদের যুগ্ম রাজা বিন্দ আর অনুবিন্দ মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। এরা সক্ষম যোদ্ধা ছিল। মহাভারত যুদ্ধে এরা প্রচণ্ড রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিল।

মৎস্যপুরাণ মতে অবন্তীরা হৈহেয় বংশের লোক এদের শ্রেষ্ঠরাজা, কার্তবীর্যার্জ্জুন। পাণিনী ও পতঞ্জলী উভয়েই অবন্তীর উল্লেখ করেছেন।

আর্যগোষ্ঠী সিন্ধু থেকে কচ্ছ উপসাগর পর্যন্ত নেমে এসে পূর্বদিকে এগিয়ে যায় ও অবন্তীর অনেক অংশ জয় করে নেয়। অবন্তী ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। অবন্তী বৌদ্ধ ধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। অভয়কুমার, ইসিদাসী, ইসি দত্ত, ধম্ম পাল, সোনকুটিকন্ন এবং বিশেষ করে মহাকাচ্চায়নের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রচারকেরা এখানে জন্মেছিলেন।

অবন্তীরাজ চন্ডপ্রদোতের পুরোহিত বংশে মহাকাচ্চায়ন জন্মেছিলেন। তিনিই চন্ডপ্রদ্যোতকে ধর্মান্তরীত করেন। বুদ্ধের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন মহাকাচ্চায়ন। মহাবীরও অবন্তীদেশে তাঁর কিছু তপস্যা করেছিলেন।

চণ্ডপ্রদ্যোত অবন্তীর শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাকে মগধের রাজাও ভয় পেত। কিন্তু ৪র্থ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মগধ অবন্তী জয় করে নেয়। অশোক দীর্ঘ সময় ধরে অবন্তীর প্রশাসক ছিলেন। বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য স্কাইথিয়ানদের দূর করে দিয়েছিলেন। পালবংশের ধর্মপাল অবন্তীর রাজা ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে চক্রায়ুধকে রাজা করেন। তিনি অবন্তীর উত্তর দিকের ভোজ এবং যবনদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ৯ম শতকের প্রথমদিকে মালবে (অবন্তি) এ পরমার বংশের প্রতিষ্ঠা করেন উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ। এই পারমার বংশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থানীয় শক্তি হিসাবে জেগে থাকে। এই শতাব্দীতে রাজশক্তি কেড়ে নেয় তোমর গোষ্ঠীর সর্দারেরা। তারপরে কাউয়ান রাজারা। এরও পরে ১৪০১এ আসে মুসলমান রাজারা।

অবন্তী ব্যবসাবাণিজ্যের বিশাল কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। তিনটি রাস্তা এখানে এসে মিশেছে। পশ্চিম ভারতের বন্দর সুরপারকা (সোপারা), ও ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ), দাক্ষিণাত্য এবং কোশলের শ্রাবস্তী থেকে।

জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নতি ঘটে। ৪০০ খৃঃ কালিদাসের নাটকগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ন'জন প্রখ্যাত মানুষ বিক্রমাদিতের রাজসভা অলংকৃত করেন।

অচ্যুতগামী অবন্তী প্রতিষ্ঠা করেন, স্কন্দপুরাণ বলে, দৈত্যরাজ ত্রিপুরকে নিহত করে মহাদেব অবন্তীপুরায় আসেন। তাঁর বিজয়ের সম্মানে অবন্তীপুরার নাম হয় উজ্জয়িনী।

হিউয়েন সাঙ এই নগরী পরিদর্শন করেন। তখন সেখানে ব্রাহ্মণ রাজা। খ্রিঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে এখানকার মুদ্রায় সূর্যের প্রতীক সহ একটি মানুষ। আরও নানান প্রতীক সম্বলিত মুদ্রাও এখানে পাওয়া গেছে।

আবুগ্রাম : আবু।

আমতরী : চাহমান সোমেশ্বরের (বিঃ ১২২৬) বিজহোলী লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। উপরমবাল-অন্তরীকে চিহ্নিত করা হয়। এটি বেগান, সিঙ্গলি, কাদবাস, রত্নগড়, খেড়ি নিয়ে গঠিত এক অঞ্চল।

আনন্দপুর : হারসোল দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। বরোদার আধুনিক বড়নগরকে চিহ্নিত করা হয়।

আর্থুনা : রাজস্থানের বানসওয়ারার ২৮ মাইল পশ্চিমে একটি গ্রাম। এখানে পরমার চামুণ্ডরাজের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

আবরকভোগ : উজ্জয়িনীর উত্তরপূর্বে আগর শহরের চতুর্দিকের অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি দেশ।

বধের : ভিলসার ৩১ মাইল উত্তর পূর্ব শ্যামসাহবাদের উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

বধো : কুলহার রেলস্টেশন থেকে ১২ মাইল দূরে।

বড়বা : অন্তের ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে একটি বড় গ্রাম। এটি রাজস্থানের কোটা জেলায় অবস্থিত। এখানে যূপের (২৯৫ কৃত বছর) এর তিনটি মৌখারী লিপি পাওয়া গেছে।

বলেভ : জোধপুরের সাংচোর জেলায় অবস্থিত। দুটি তাম্রপত্র এখানে পাওয়া গেছে।

বমহনী : মধ্যভারতের বাখেলখণ্ডের রেওয়ার সোহাগপুর তহসিলে অবস্থিত। এখানে একটি মূল্যবান তাম্রসনদপত্র পাওয়া গেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা : নারওয়ার কেল্লার ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। (গোওলিয়র-শিবপুরী লাইন।)

বরাই : পানিহার রেলস্টেশন থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

বরগাঁও : জব্বলপুর জেলার মুরওয়ারার ২৭' মাইল দূরে একটি গ্রাম।

বর্নালা : এইটি জয়পুরে। ঠাকুরসাহিব বার্নালার একটি ছোট গ্রাম। এখানে দুটি যূপ লিপি পাওয়া গেছে।

বরনাসা (বানাসা) : এটি পরনাশা নদী।

বরো : পাথার পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এখানে। ধ্বংসাবশেষ মূলত হিন্দু ও জৈন মন্দিরের।

বাঘ : মালবের দক্ষিণে, ধারের ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি গ্রাম। এটি ওয়াঘ বা বাঘ ও গিরনা স্রোতস্বিনীর সঙ্গমে অবস্থিত। এটি কুকসির ১২ মাইল উত্তরে—উদয়পুর ঘাটের কাছাকাছি। এই গ্রামের দক্ষিণে একটি ধ্বংসপ্রায় বিহার রয়েছে। এটিতে ন'টি গুহা রয়েছে। বাঘের চিত্রকলা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর। এর স্থাপত্য নাসিক গুহার মতো নয়। ২নং গুহাটি পাণ্ডবোগকি গুহা নামে পরিচিত এবং ভাল অবস্থায় আছে। সমস্ত গুহাগুলিই বৌদ্ধ-বিহার, কিন্তু কোন চৈত্য কক্ষ নেই।

বাঘেলখণ্ড : ১৩ শতকের ত্রিলোক্য বর্মণের রেওয়া দানপত্রে দেখা যায়, বাখেলখণ্ডের

উত্তরাংশ চান্দেলাদের অধীনে ছিল।

বালাঘাট : নাগপুরের কাছে। এখানে দ্বিতীয় পৃথ্বীবাজসেনের পাঁচটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

বালি : ফলনা রেলস্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে এই শহর অবস্থিত। এখানে এক জৈন মন্দিরে ১২ শতকের এক লিপি পাওয়া গেছে।

বাংলা : নারওয়ার দুর্গের ৫ মাইল পূর্বে একটি গ্রাম।

বারদূলা : এটি মধ্যভারতের সারানগড়ের একটি ছোট গ্রাম। এখানে (৯ খ্রিঃ) মহাশিবগুপ্তর তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

বারলা : আজমীর থেকে ৭ মাইল পূর্বে একটি গ্রাম।

বাসিম : এটি মহারাষ্ট্রের অকোলা জেলার বাসিন তালুকের সদর দপ্তর। এখানে বাকটক দ্বিতীয় বিন্ধ্যশক্তির তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

বেন্নাকট : মহারাষ্ট্রের গোন্দিয়া জেলার তহসিলের কোশাম্বার ৩৫ মাইল পূর্বে আধুনিক বেনীগ্রামকে ঘিরে একটি জেলার নাম।

বেতুল : এটি মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় অবস্থিত। এখানে (গুপ্ত সংবত ১৯৯) এর সমক্ষভের একটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

ভইমসডা : উদয়পুরের জগন্নাথরায়ের মন্দিরের একটি লিপিতে চিতোরের কাছে এই গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।

ভইনস্রোরগড় : উদয়পুরের ভইনস্রোরগড়ের ৩ মাইল উত্তরপূর্বে বারোল্লিতে একগুচ্ছ হিন্দু মন্দির রয়েছে। প্রধান মন্দিরটি ঘটেশ্বরের।

ভারুণ্ড : জোধপুরের গোদওয়ার অঞ্চলের একটি গ্রাম। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

ভয়ানগজ-পাহাড় : বারওয়ানি শহরের পাঁচমাইল দূরে। জৈনদের পুণ্যভূমি। জৈন সন্ন্যাসী গোমতেশ্বরের বিশাল এক মূর্তি রয়েছে এখানে।

ভাবরু : ভাবরুর সৈন্যাবাসের ১২ মাইল দূরে বৈরাট পাহাড়গুলির কোনও একটি থেকে ভাবরু শিলালিপি বা দ্বিতীয় বৈরাট শিলালিপি পাওয়া যায়। মনে হয় মৎস্যদেশটি পরবর্তী সময়ে বিরাট বা বৈরাট বলে পরিচিত হয়।

ভাগুক : মহারাজ পৃথ্বীসেনের নাচনে-কি-তলাই শিলালিপি থেকে জানা যায়, ভাগুকের প্রাচীনতম ছিল বাকাটক।

ভেরাঘাট : জব্বলপুর জেলায় নর্মদার তীরে অবস্থিত। এখানে রানী অলহনদেবীর (চেদী সম্বত ৯০৭) একটি লিপি পাওয়া গেছে।

ভিলয় : উদয়পুর থেকে ৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

ভিল্লমাল : গুজরাটের ঘুমলি থেকে পাওয়া সৈন্ধব তাম্র দানপত্রে উল্লিখিত এই স্থানটিকে পাটনের ৮০ মাইল উত্তরে বা মাউন্ট আবুর ৪০ মাইল পূর্বে আধুনিক ভিনমল বলে চিহ্নিত করা হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এটি গুর্জরদের রাজধানী ছিল।

ভিলসা (ভৈল্ল-স্বামীপুর) : মুম্বাই থেকে ৫৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি বেতয়া নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। কানিংহামের মতে এটি গুপ্ত যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ৬০টি

বৌদ্ধস্তুপের একটি শৃঙ্খল। বেতয়া ও বেসনদীর সংগমের মুখে উত্তর পশ্চিম ভিলসা-ই ছিল মৌর্যযুগের বিখ্যাত বেন সাগর। ৪র্থ, ৫ম শতাব্দীতে এটি গুপ্ত অধিকারে ছিল। ৯ম শতকে এটি মালবের পরমারদের অধিকারে আসে এবং ১২ শতকে চালুক্যদের অধীনে।

ভীমবন : মনে হয় পাথার মালভূমি সহ যে শৈলমালা ছিল—তাকে ঘিরে ছিল বিশাল এক বনভূমি। তারই প্রাচীন নাম এটি।

ভিনমল : রাজস্থানের যশোবন্তপুর অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে উদয়সিংহদেবের একটি লিপি পাওয়া গেছে। এখানে সুন্দ পাহাড়ে খোদাই করা চামুণ্ডার গুহা মন্দির রয়েছে।

ভিতরওয়ার : দাবরা রেলস্টেশনের ১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

ভুমরা : গুপ্ত রাজত্বের ভুমরা লিপিতে এই গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে। এটি উনচেরার ৯ মাইল উত্তর পূর্বে।

ভুরবাডা : এটি মধ্যপ্রদেশের তদানিন্তন রাজনগর জেলায় অবস্থিত।

বিহার কোটরা : এটি মালবের রাজগড়ে। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

বিজাপুর : এটি মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায়। এটি সাতপুরার একটি পুরোন গিরিদুর্গ।

বিজয়গড় : যৌধেয়দের বিজয়গড় লিপিতে এই গিরিদুর্গের কথা আছে। এটি ভরতপুরের ব্যয়ানার ২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

বিজোলিয়া : উদয়পুর থেকে ১০০ মাইল দূরে মেবারের একটি গ্রাম। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। লিপিটি পার্শ্বনাথ ও অন্যান্য জৈনপুণ্যাত্মাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত। চাহমান সোমেশ্বরের বিজহোলী প্রস্তরলিপি অনুসারে উদয়পুরের ১১২ মাইল উত্তর পূর্বে এটি একটি সুন্দর দুর্গশহর ছিল। আরাবল্লী পাহাড়ের উচ্চতম মালভূমি পাথারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বিন্ধ্যাবল্লী বিজোহলীর সংস্কৃত নাম।

বিলাইগড় : এটি ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলা। কালচুরী প্রতাপমল্লের তাম্রপত্র এখানে পাওয়া গেছে।

বনথিকবাটক : দ্বিতীয় প্রবরসেনের কথুরক দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি নাগপুর জেলার আধুনিক বোথাড।

বুচক্কলা : এটি যোধপুরের বিলাদা অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে সম্বত ৮৭২এর নাগভট্টের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

চৈত : এটি কারহৈয়ের ৫ মাইল উত্তর অবস্থিত। বিটওয়ার—২ রসি রাস্তার কাছে।

চম্মক : বাকাটক বংশের দ্বিতীয় প্রবরসেনের চম্মক তাম্রপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে চম্পক ভোজকট রাজ্যে অবস্থিত। এটি প্রাচীন চর্মনক গ্রাম—মধুনদীর তীরে। ইলিচপুর থেকে ৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে।

চন্দেরী : মধ্যপ্রদেশের নরমার অঞ্চলের চান্দেরীতে একটি পুরোন দুর্গ রয়েছে।

চন্দ্রপুর : ওয়েন গঙ্গা নদীর পশ্চিমে সিওয়ানীর দক্ষিণে আধুনিক চান্দপুর।

চন্দ্রাবতী : এই প্রাচীন শহরটি টলেমির সন্দ্রাবাতিস। এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে আবু রোডের ৪ মাইল পশ্চিমে এবং বানাস নদীর পশ্চিম তীরের কাছে।

চর্মন্বতী : পদ্ম পুরাণে, যোগিনীতন্ত্রে এবং পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ীতে এই নদীর (চম্বল)

উল্লেখ রয়েছে। এটি আরাবল্লী পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ব রাজস্থানে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

চহন্দ : মধ্যপ্রদেশের শহরটিকে চান্দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চেদি দেশ : পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি যমুনার কাছে এবং কুরুরাজ্যের সংলগ্ন। মোটামুটি এটি আধুনিক বুন্দেলখণ্ড এবং সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। রাজধানী ছিল সথিবাতিনগর যা মহাভারতের শুক্তিমতী নগরী। চেদীদেশ বৌদ্ধধর্মেব কেন্দ্র ছিল। বসন্তর জাতক অনুযায়ী চেতা বা চেতিরাষ্ট্র চেতুত্তর নগর থেকে (রাজা বসন্তরের জন্মস্থান) ৩০ যোজন দূরে ছিল। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে চেদীরাজ খুবই শক্তিশালী ছিলেন। কারণ, ঋকবেদে বলা হয়েছে তিনি এক পুরোহিতকে ক্রীতদাস হিসাবে দশজন রাজাকে দান করেন। চেদী সম্রাট কাশু খুবই প্রতাপশালী ছিলেন। ঋগ্বেদেব যুগে তিনি অনেক রাজাকেই অধীনে এনেছিলেন। মহাভাবত অনুযায়ী এই দেশ পৌবব বংশীয় বসু জয় করেন। শুক্তিমতী নদীর তীরে তাঁর রাজধানী ছিল শুক্তিমতী। মহাভারতের যুগে চেদীরাজ শিশুপালও প্রচুর ক্ষমতার অধীশ্বব ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে নিহত করেন। যুধিষ্ঠির চেদীরাজের পুত্রকে রাজা করেন। র‍্যাপসন বলেন, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাংশ চেদী অধিকারে ছিল। পারজিটার বলেন, চেদী ছিল যমুনার দক্ষিণে। কেউ কেউ বলেন, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ অংশ এবং জব্বলপুরের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত ছিল চেদী, ত্রিপুরী নামেও চেদী পরিচিত ছিল। যমুনার দক্ষিণ তীরে ছিল সহজাতি নামে এক চেদী নগর।

ছত্তিশগড় : তুম্মান গোষ্ঠীর হৈহয়দের একটি স্বাধীন রাজ্য।

ছোটি দেউরি : জব্বলপুর জেলার মুরওয়ারা তহশিলের জোকাহির পশ্চিমে কেন নদীর বাম তীরে অবস্থিত। একে মাঢ়া দেউরিও বলে। এখানে গভীর জঙ্গলে অনেক ছোট ছোট মন্দির সমাহিত হয়ে আছে। কানিংহামেব মতে এগুলি শৈব মন্দির।

চিঞ্চাপল্লী : নাগপুর জেলার উন্নানদীর দক্ষিণ তীরে চিকলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিরওয়া : উদয়পুরের ১০ মাইল উত্তরে একটি গ্রাম। একটি বিষ্ণু মন্দিরের দরজায় উৎকীর্ণ একটি লিপি পাওয়া গেছে।

চিতোরগড় : রাজস্থানের চিতোরগড় জেলায়।

চিত্রকূট : উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলার কালাঞ্জরের কাছে চিত্রকূটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিই আধুনিক চিত্রকোট বা চতুরকোট পাহাড় বা বুন্দেলখণ্ডের কামপ্তার কাছের এক জেলা। রামায়ণ, মহাভারত ও বৃহৎ সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। কেউ আবার বলেন এটি বিখ্যাত চিতুরদুর্গ যা তৃতীয় কৃষ্ণ গুর্জর-প্রতিহারদের কাছ থেকে অধিকার করেছিলেন। জৈন পদ্মপুরাণের কথায়, রাম-লক্ষ্মণ মালবদেশের চিত্রকূট পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন। এখানে জঙ্গল এত নিবিড় ছিল যে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন পাওয়া যেত না। এটি অন্যতম ঋক্ষ পাহাড় জাত নদী যার সঙ্গে চিত্রকূটের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

চুরলি : গোয়ালিয়র-ঝাঁসি রোডের ওপর টেকানপুর সেচবাঁধের আধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

দবোক : উদয়পুরের আট মাইল পূর্বে এই গ্রামটি অবস্থিত।

দামো : মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার বথিয়াগড় লিপি খরপরদের কথা উল্লেখ করে। ভাণ্ডারকার বলেন, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত খরপরিকররা এরাই।

দংগুন : প্রভাবতীগুপ্তের পুণা তাম্রপত্রে এই গ্রামটির কথা উল্লেখ রয়েছে। এই পত্রে সুপ্রতিষ্ঠাহারে অবস্থিত এই গ্রামটি দান করার তথ্য রয়েছে। প্রাচীন দংগুনা গ্রামটিকে নাগপুর জেলার আধুনিক হিনগর্মঘাট হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

দশার্ন : মধ্যপ্রদেশের বিদিশা বা ভিলসা অঞ্চল হিসাবে এটিকে ধরা হয়। এই দেশটি মোটামুটি মালব বলেই মনে করা হয়। রাজধানী বিদিশা, এটি মহাভারত ও কালিদাসের মেঘদূতে উল্লিখিত। পুরাণে দশার্ন দেশের সঙ্গে, মালব, কুরুষ, মেকল, উৎকল, নিষাদ দেশকেও ধরা হয়। রামায়ণে একে মেকল ও উৎকলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলে দেখান হয়েছে। সীতার খোঁজে সুগ্রীব এখানে বাঁদর সেনা পাঠিয়েছিল। দশার্ন দশার্ননদীর তীরে অবস্থিত ছিল—যার চিহ্ন সাগরের কাছে আধুনিক ধসান নদীর তীরে এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে। মনে হয় রামায়ণ আর পুরাণে বর্ণিত দশার্নদেশ মেঘদূতের দশার্ন থেকে আলাদা ছিল। উইলসনের মতে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব দশার্ন মধ্যপ্রদেশের ছত্তিসগড়ের একটি অংশ ছিল। দশার্নরাজা ক্ষত্রদেব হাতির পিঠে চড়ে মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এটি লক্ষ্য করার মতো যে দশার্ন যোদ্ধারা সবাই বীর এবং হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল। পার্জিটার মনে করেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দশার্ন একটি যাদব দেশ ছিল। দশার্ন তলোয়ার নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। মহাবস্তু ও ললিতবিস্তারে একে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বলা হয়েছে। দশার্ন দেশের লোকেরা বুদ্ধের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করেছিল।

দবানিগ্রাম : মাউন্ট আবুর দেলবাদোর সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে দবানিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেওগড় : ঝাঁসি জেলার ললিতপুর সাবডিভিশনের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের কাছে এটি অবস্থিত। কাছেই বেতয়া (বেত্রবতী) নদী। এখানে গুপ্তযুগের একটি মন্দির আছে।

দেওলি : নাগপুরের কাছে ওয়ার্ধার দক্ষিণ পশ্চিম অবস্থিত।

দেওলিয়া : গুনালির ১৩ মাইল উত্তর পূর্বে একটি গ্রাম।

দেউলবাডা : মাউন্ট আবুর আধুনিক দিলওয়ারা গ্রাম।

দেউলাপমচলা : এটি দেবগ্রামপট্টলের একটি গ্রাম। রেওয়ার খায়িরহর কাছে দেওগোবানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গ্রামটি যুশ কর্ণদেব গঙ্গাধরশর্মণ নামে এক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন।

দেবকুহ : গ্রামটি চিতোরের কাছে।

দেবগিরি : কালিদাস এর অবস্থান চম্বলের কাছে উজ্জয়িনী ও মান্দাসোরের কাছে দেখিয়েছেন।

দেবপালপুর : সম্ভবত উত্তর প্রদেশের মাউ জেলার ২৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে দিপালপুর।

দোসারোঁ : দশার্ন অধ্যুসিত অঞ্চলের একটি নদী।

ধলিক : ৭২৫ খৃঃ দবোক (মেবার) লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। ভাণ্ডারকার এই

অঞ্চলের প্রভু ধবালপ্পদেবকে কামসওয়া (রাজস্থানের কোটা) লিপি (৭৩৮ খৃঃ) অনুসারে মৌর্য রাজত্বের রাজা ধবলকে চিহ্নিত করেন।

ধনকাতীর্থ : গুমলির ২৫ মাইল পূর্বে গণ্ডালের ধানককে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধোবহট্ট : ত্রৈলক্যমল্লদেবের রেওয়া তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ধুরেতিকে চিহ্নিত করা হয়।

দিনার : ঝাঁসি থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে।

ধুরেতি : রেওয়া শহর থেকে ৭ মাইল দূরের একটি গ্রাম।

দীর্ঘদ্রহ : এটি সম্ভবত ওয়ার্ধার বাম তীরে অবস্থিত একটি দীঘি।

দিওয়ারা : দক্ষিণ রাজস্থানের দুংগারপুরে অবস্থিত। এখানে এক মূর্তিলিপিতে বলা হয়েছে। বৈজ নামে এক ব্যক্তি দেবকর্ণে (দিওয়ারা) একটি মূর্তি স্থাপন করে।

দোংগরগ্রাম : বেরারের ইয়োটমাল জেলার পুসাদ থেকে ১০ মাইল দূরে দোংগরগাঁওকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে দুটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। শক ১০৩৪ এর জগদ্দেবের সময়কার এক শিলালিপিতে গ্রামটি দান করার কথা আছে।

দুদিয়া : মধ্যপ্রদেশের এটি ছিন্দওয়ারা জেলায়। এখানে দ্বিতীয় প্রবরসেনের চারটি তাম্রপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

দুগাউডা : ওরছা-টিকমগড়ের রাস্তায় টিকমগড় থেকে ১৫ মাইল দূরে আধুনিক দিগাউরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানকার শাসক পরিবার গ্রাম দিগাউরা বা প্রাচীন দুগাউড়া থেকে এসেছিল।

দুরদ্দ : চাহমান-সোমেশ্বরের বিজহোলি শিলালিপিতে দুরদ্দ-এর উল্লেখ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের আধুনিক দুদদাই বা দুধাইকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরক্কা : চান্দেল পরমার্দির (সম্বত ১২০০—১৬৭৩ খ্রি:) এর মাহোব তাম্রদানপত্রে এরাক্কাকে একটি জেলার সদরদপ্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফতেহাবাদ : এটি উজ্জয়িনীতে। এটি একটি রেল স্টেশন। একদা এটি রণক্ষেত্র যেখানে শাজাহানের সঙ্গে পুত্র আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ হয়েছিল।

গঙ্গাভেদ : চাহমান-সোমেশ্বরের (বি: ১২২৬) বিজহোলি লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। টড বর্ণিত রাজস্থানের উল্লিখিত বারোল্লিতে গঙ্গাভেদকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গঙ্গধার : পশ্চিম মালবের ঝালরাপটনের ৫২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিশ্ববর্মণের গঙ্গধরপ্রস্তরমূর্তিলিপিতে এই গ্রামটির কথা রয়েছে।

গায়োনরি : নরওয়ালের তিন মাইল উত্তরপূর্বে একটি গ্রাম। এটি উজ্জয়িনীর ১১ মাইল দক্ষিণপূর্বে।

গালবআশ্রম : জয়পুরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বৃহৎ শিবপুরাণ অনুযায়ী এটি চিত্রকূট পর্বতে অবস্থিত।

ঘাটিয়ালা : যোধপুর থেকে ২২ মাইল দূরে। এখানে কাক্কুক-র লিপি পাওয়া গেছে।

ঘোসুন্ডি : রাজস্থানের চিতোরগড় জেলার নগরীর কাছে একটি গ্রাম। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

গোদুরপুর : মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলায় নর্মদার দক্ষিণ তীরে গ্রামটি অবস্থিত।

গোহাসোদ্ব : অজ্ঞানবতীর ১১/২ মাইল দূরে আধুনিক গহ্বা।

গোশৃঙ্গপর্বত : মধ্য ভারতের নিষাদভূমির কাছে অবস্থিত।

গুঞ্জি : ছত্তিসগড়ের শক্তি স্টেশন থেকে ১৪ মাইল দূরে ছোট একটি গ্রাম। এই গ্রামের কাছে একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি কুন্ড রয়েছে। এই কুন্ডের একপাশে একটি পাহাড়ের গায়ে একটি লিপি রয়েছে। স্থানটি কিরারি থেকে ৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে যেখানে ২য় শতাব্দীর একটি কাঠের স্তম্ভের গায়ে ব্রাহ্মণী অক্ষরে লেখা একটি লিপি পাওয়া গেছে। এটি এমন একটি দেশে অবস্থিত যে দেশটি খ্রিঃ পূর্ব ও খ্রিষ্ট পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।

গুর্জরত্র : রাজস্থানের দিদওয়ানা থেকে সিওয়া এবং ম্যাগলোনা পর্যন্ত প্রসারিত অংশের নাম ছিল গুজরত্র বা গুর্জরভূমি।

হর্ষ : এটি একটি পাহাড় যার শীর্ষে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। এটিকে উঁচা পাহাড়ও বলে। এটি জয়পুরের সাইখাবতী অঞ্চলে হর্ষনাথ বলে একটি গ্রামের কাছে অবস্থিত। এখানে চাহমান বিগ্রহরাজের (বিঃ ১৯৩০) একটি লিপি পাওয়া গেছে।

হরসাউদ : মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলার কারওয়া শহরের কয়েক মাইলে দূরে গ্রামটি অবস্থিত। হর্ষপুরাকে হরসাউদা বলে চিহ্নিত করা যায়। এখানে একটি ভগ্নমন্দিরে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

হোলি : গিরবা জেলার একটি গ্রাম।

জজাভুক্তি : জাজভুক্তি, জেজাভুক্তি, জেজাকভুক্তি বা জেজাভুক্তক বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম।

জাবালিপুর : এটি যোধপুর অঞ্চলে, জাবালিপুরে (আধুনিক জালোর) কাঞ্চনগিরি দুর্গে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে পার্শ্বনাথের মূর্তিসহ একটি জৈন বিহার নির্মাণের কথা লেখা রয়েছে। এই শহরের দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু রয়েছে। (১) তোপ খানা—শহরের কেন্দ্রে, (২) ১০০০ ফুট উঁচু এক ছোট পাহাড়ের মাথায় দুর্গ।

জেতুত্তর : চিতোরের ১১ মাইল দূরে নাগরী বলে এক বসতি।

কাগপুর (কাকপুরা) : সাধারণত একে গধলা-কাগপুর বলা হয়। ভিলসার ১৭ মাইল উত্তরে। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির কাকদের রাজধানী বলে জয়সোয়াল চিহ্নিত করেছেন।

ককন্দকূটু : দেত্তরির ৬ মাইল পূর্বে খুতুগুাকে চিহ্নিত করা হয়েছেন।

কানসওয়া : রাজস্থানের কোটা অঞ্চলে।

কনখল : মাউন্ট আবুতে অবস্থিত।

কপিলধারা : বিজহোলির মহাকাল মন্দিরের কাছে মন্দাকিনী বলেও পরিচিত একটি জলাশয়।

করমোদা : ঋক্ষ পর্বতের একটি নদী।

কারিকাতিন : কারিতলাইয়ের সঙ্গে এর মিল আছে। দেওড়ি মাঢ়ার চার মাইল দক্ষিণে খুরাইকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কসরাওয়াদ : মধ্যপ্রদেশে নিসাদ জেলায় একটি শহর। নর্মদার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে।

কবিলাসপুর : কর্নাটকের বেলগাঁও জেলার হুক্কেরী তালুকের নুলেগ্রামের কাছে একই নামে এক আধুনিক গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কালিসিন্ধ : নির্বিন্ধ্যা দেখুন।

কমান : রাজস্থানের ভরতপুর অঞ্চলে। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে। কাম্যককে চিহ্নিত করা হয়েছে

কামবা : আধুনিক কামা—বিজহোলি থেকে ২ মাইল পূর্বে।

কান্তিপুর : কানিংহাম গোয়ালিয়রের ২০ মাইল উত্তরে কোটওরালকে চিহ্নিত করেছেন।

কারিতলাই : জব্বলপুরের মুদওয়ারা সাবডিভিশনের একটি গ্রাম। এখানে চেদী লক্ষ্মণরাজার একটি লিপি পাওয়া গেছে। এই গ্রামটি খুবই প্রাচীন। অনেক পুরোন মন্দির রয়েছে এখানে।

কায়ঠা : প্রাচীন অনর্ঘমণ্ডলে গ্রামটি অবস্থিত। আধুনিক কৈতার সঙ্গে এর মিল রয়েছে (বিলাসপুর জেলা)।

কেসলা : এটি প্রাচীন কৈলাসপুরা। এটি মল্লারের কাছে।

খড়ুমবরা : বিজহোলির ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে আধুনিক খাড়িপুরা।

খাজুরাহো : এটি বুন্দেলখণ্ডের ছত্রপুর অঞ্চলে, ঝাঁসি থেকে প্রায় ১০০ মাইল দুরে। এখানে কয়েকটি লিপি পাওয়া গেছে। ইবনবতুতা ১৩৩৫ সালে এখানে এসেছিলেন। তিনি নাম বলেছেন কজুরা। চান্দেলা রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলি (১০ম শতাব্দী) এখানে বুন্দেলখন্ডের গভীর জঙ্গলে পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এই গ্রামে অনেকগুলি বিহার এবং প্রায় দশটি মন্দির রয়েছে।

এর গুরুত্ব অনুপম মন্দির শ্রেণির জন্য।। মন্দিরগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব। পশ্চিমভাগে শৈব ও বৈষ্ণব মন্দির। উত্তরভাগে একটি বড় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির—সব বৈষ্ণব। দক্ষিণপূর্বে মূলত জৈন মন্দির। সবমন্দিরগুলিই বেলে পাথরের এবং একই শ্রেণির। কন্দর্প মহাদেবের মন্দিরটিই সুন্দরতম।

খলারী : রায়পুরের ৪৫ মাইল পূর্বে একটি গ্রাম। এখানে বিক্রমাব্দ ১৪৭০ এর হরিবর্মদেবের রাজত্বকালের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

খান্দেশ : জৈন শ্বেতাম্বর অম্মদেবের বিশাল প্রচারক্ষেত্র।

খরপরিক : দামো জেলার বৈঠাগড় লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

খেজদিয়ভোপ : এটি মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোর জেলায় অবস্থিত। এখানে অনেক বৌদ্ধগুহা আবিষ্কার হয়েছে।

খোহ : মহারাজা হুস্তিনের খোহ তাম্রপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে।

-**কিরারি** : এটি ছত্তিশগড়ে অবস্থিত। এখানে কাঠের এক স্তম্ভে ব্রাহ্মী অক্ষরেরর এক লিপি পাওয়া গেছে।

কিরাড়ু : বাদমেরের ১৬ মাইল দুরে হাথমার কাছে এক ধ্বংসস্তুপ। বাদমার যোধপুর জেলার মাল্লানি অঞ্চলের প্রধান শহর। এখানে আলহনদেবের লিপি পাওয়া গেছে।

কিরিকাইকা : ভোজের দেপালপুর তাম্রপত্রে উজ্জয়িনীর পশ্চিমে এই গ্রামটির উল্লেখ

রয়েছে। মান্যখেটা থেকে আগত জনৈক ব্রাহ্মণকে ভোজ কর্তৃক কিছু জমি দান করা হয়।

কোনি : বিলাসপুরের ১২ মাইল দূরে আরপার বাম তীরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম। এখানে কালচুরী বংশীয় দ্বিতীয় পৃথ্বিদেবের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

কোথুরক : দ্বিতীয় প্রবরসেনের কোথুরক দানপত্রে গ্রামটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিভাগে অবস্থিত ছিল। এটি উমা নদীর পশ্চিমে, চিঞ্চাপল্লীর উত্তরে অবস্থিত ছিল।

কুডোপলি : সম্বলপুর জেলার বরগড় তহশিলে গ্রামটি অবস্থিত। এখান দ্বিতীয় মহাভাবগুপ্তের দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

কুম্ভি : জব্বলপুরের ৩৫ মাইল দূরে হেরুণ নদীর ডানতীরে অবস্থিত। এখানে দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

কুন্ডিয়ন : উদয়পুর শহরের ৫০ মাইল উত্তর পূর্বে বানস নদীর ডান তীরে অবস্থিত। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির ও পুকুর আছে। কথিত আছে পুকুরের জলে স্নান করে পরশুরাম তার পাপ ধুয়েছিলেন।

কুরারঘরপর্বত : এটি অবন্তীতে ছিল। মহাকচ্চায়ন একবার এখানে বাস করেছিলেন।

কুরে : অজ্ঞানবতীর তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে আধুনিক কুরহা।

কুরুদ : অধুনা ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলায় অবস্থিত।

কুরুসপাল : নারায়ণপাল থেকে এক মাইল দূরে একটি গ্রাম। বস্তার জেলার জগদলপুরের ২২ মাইল দূরে এটি অবস্থিত। এখানে সোমেশ্বরদেবের আমলের ধারণামহাদেবীর দুটি লিপি পাওয়া গেছে।

লঘু-বিজহোলি : বিজহোলির ৩ মাইল পশ্চিমে বর্তমানে ছোটি বিজহোলি বলে পরিচিত।

লমবেব : নরসিংপুরা অঞ্চলে লিম্বুকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লোধিয়া : মধ্যপ্রদেশের সারনগড় অঞ্চলে সারিয়া পরগণার একটি ছোট গ্রাম।

লোহানগর : এটি ওয়ারুড়র ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি প্রাচীন বিভাগের সদরদপ্তর ছিল। বর্তমান নাম লোনী।

লোহারি : উদয়পুর অঞ্চলে জাহাজপুর-এর একটি গ্রাম। এখানে ভুতেশ্বর মন্দিরের থামে একটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

মদনপুর : এটি সাগর জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাচীন এক মন্ডপের থামে একটি লিপি পাওয়া গেছে। স্থানটি দুবদহি থেকে ২৪ মাইল ও সাগর থেকে ৩০ মাইল দূরে।

মদ্দ্যকভুক্তি : এটি সম্ভবত ইন্দোরের কাছে অবস্থিত মাউ সেনানিবাস।

মহল্লা-লাট : মনে হয় এটি বৃহত্তর লাট। অমরাবতী জেলার মোরসি তালুকের লড়কি বা ঘাট লড়কিকে চিহ্নিত করা হয়।

মহাউদা : শতজুনার ২৫ মাইল দক্ষিণে মাহোদ গ্রামটি চিহ্নিত হয়েছে।

মহাদ্বাদশকমণ্ডল : এটি উদয়পুর রাজ্য, গোয়ালিয়র রাজ্যের ভিলসা, ভূপাল রাজ্যের রাজসায়ন নিয়ে গঠিত ছিল।

মহানালা : চাহমান সোমেশ্বরের বিজহোলি লিপি (বি: ১২২৬)-তে এর উল্লেখ

রয়েছে। রাজস্থানের মেনালকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মক্করকট : এটি অবন্তীর একটি বনভূমি। এখানে মহাকচ্চায়ন পর্ণকুটীরে বাস করতেন।

মাস্কি (উজ্জয়িনী) : মুম্বাই-আগ্রা রোডে দেওয়াসের উত্তরে অবস্থিত।

মলহার : এটি মধ্যপ্রদেশে। এখানে জাজল্যদেবের (চেদী ৯১৯)-র একটি লিপি পাওয়া গেছে।

মল্লাল : বিলাসপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে আধুনিক মল্লার।

মল্লার : বিলাসপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে একটি বড় গ্রাম। এখানে মহাশিবগুপ্তের তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

মমডলকর : এটি উদয়পুরের আধুনিক মানডলগড়।

মন্ডল : এই নগরটিকে মহেম্মতিপুরা ও বলা হোত। নর্মদার ওপর দিকে যে রাজ্য ছিল তার আদি রাজধানী। পরে জব্বলপুর থেকে ৬ মাইল দূরে ত্রিপুরী বা তেওয়ারে চলে যায়। কানিংহামের মতে ওপর নর্মদার মাহেম্মতিপুরই হিউয়েন সাঙের মহেশ্বরপুরা।

মন্ডপ : এটি মধ্যপ্রদেশের ধরের আধুনিক মান্ডু।

মন্দাকিনী : কানিংহাম ঋক্ষপর্বত জাত এই নদীটিকে আধুনিক মন্দাকিন বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি চিত্রকূট পাহাড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুন্দেলখন্ডের পৈসুন্দি বা পৈসুনির একটি উপনদী। ভাগবত ও বায়ুপুরাণ অনুযায়ী এটি গঙ্গা নদী।

মন্দার : এই পবিত্র স্থানটি বিন্ধ্যপর্বতে—জাহ্নবী নদীর দক্ষিণে। এখানে সামন্তপঞ্চক বলে একটি আশ্রম আছে।

মনসিয়াগড় : বিচোরের $1^1/_2$ মাইল দূরে—যেটি সিংহোলির ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

মৎস্যদেশ : এটি অন্যতম মহাজনপদ। এই দেশের লোকেরা বৈদিক যুগে কিছু গুরুত্ব লাভ করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত আছে যে এক বৎসরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। উশীনর, কুরু-পাঞ্চাল এবং কাশী-বিদেহদেশের সঙ্গে মৎস্যদেরও উল্লেখ করা হয়। মৎস্য কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, মৎস্য ব্রহ্মর্ষি দেশের একটি অঙ্গ ছিল যা পাতিয়ালা রাজ্যের পূর্বের অর্ধাংশ এবং পাঞ্জাবের দিল্লি বিভাগ, অলয়ার রাজ্য এবং রাজস্থানের আশপাশের অঞ্চল। গঙ্গা ও যমুনার ও উত্তর প্রদেশের মুতত্র জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাচীন কালে অলওয়ারের আরাবল্লী থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত দেশটি ভাগ করা হয়েছিল : পশ্চিমে মৎস্য, পূর্বে শূরসেন, দশার্ন দক্ষিণে এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে। মৎস্যদেশের মধ্যে ছিল, বর্তমান সমগ্র অলওয়ার অঞ্চল, এর সঙ্গে জয়পুর ও ভরতপুরের একটু অংশ। বিরাট মৎস্যদেশের রাজা ছিলেন। মৎস্যদেশ পরবর্তী কালে বিরাট বা বৈরাট বলে পরিচিত হয়। হিউয়েন সাঙ বিরাট পরিদর্শন করেন। দেশটি ভেড়া-ষাঁড়ের জন্যও বিখ্যাত ছিল। বিরাটনগরকে মৎস্য নগরও বলা হয়। বিরাটরাজ পান্ডব পক্ষে ছিলেন। বর্তমান বৈরাট একটি গোলাকার উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। তামার খনির জন্য বিখ্যাত। স্থানটি দিল্লি থেকে ১০৫ মাইল এবং জয়পুরের ১০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বিরাট বহু শতাব্দী ধরে জনশূন্য ছিল। সম্ভবত আকবরের আমলে এখানে নতুন বসতি

হয়। মৎস্য এক সময়ে চেদী রাজ্যের এবং পরে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মাউ : এটি উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলায় অবস্থিত। এখানে মদনবর্মদেবের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

ময়ূরগিরি : ভারহুতের 'ভোটিভ লেবেল' ২৮এ এর উল্লেখ রয়েছে। এটি চরণব্যুহকাব্যের ময়ূর পর্বত। লুডারের তালিকায় মোরাগিরি (ময়ুর গিরি) বলে একটি নাম আছে। কেউ কেউ বলেন, এটি মধ্যপ্রদেশে।

ময়ূরখণ্ডী : মধ্যপ্রদেশের চান্দা থেকে ৫৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে ওয়েন গঙ্গার তীরে মার্কণ্ডী গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মার্কণ্ডী রাষ্ট্রকূটদের সময়ে খুব সমৃদ্ধশালী ছিল। তৃতীয় গোবিন্দের একাধিক দানপত্রে রাজনিবাস হিসাবে যে ময়ুরখণ্ডী নামটি দেখা যায়—সেটি সম্ভবত মার্কণ্ডী।

মাহিস্‌স্‌তি (মাহিষ্মতি) : এটি দক্ষিণ অবন্তীর রাজধানী। মহাভারত কথিত মাহিস্মক আর মাহিশকরা একই। মাহিষ্যতি মান্ধাতা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পুরাণ অনুযায়ী মাহিষ্যতির প্রতিষ্ঠাতা একজন যদুবংশীয়। বলরাম এখানে এসেছিলেন। পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসে নগরে প্রবেশ করে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের নিধন করেন। এখানে কার্তবীর্যার্জুন রাবণকে বন্দী করে রাখেন।

মালব দেশ : গুর্জর-প্রতিহারদের সাগরতল লিপি, রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দের পৈঠান তাম্রপত্রে বলা হয়েছে, উজ্জয়িনী ও ভিলসা (আধুনিক মালওয়া)কে ঘিরে থাকা অঞ্চলটি ছিল মালব। ক্ষত্রপ নহাপানের জামাতা শক উসবদাতের (ঋভদত্ত) লিপি অনুসারে, জয়পুরের কাছে নগর অঞ্চল মালবদের অধিকারে ছিল। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে লিখিত মালবদেশ ছিল জয়পুর রাজ্যের দক্ষিণপূর্বের অংশ বগরচাল অঞ্চলকে নিয়ে। মনে হয় মেবার ও কোটাও তাদের অধিকারে ছিল। মালবের সঠিক স্থান নির্দ্ধারণ করা মুশকিল। আলেকজান্ডারের সময় মালবেরা পাঞ্জাবে বাস করত। স্মিথ মনে করেন, এরা ঝিলম ও চেনাব সঙ্গমের নীচের দিকের অঞ্চলটিতে বাস করত। অর্থাৎ ঝংজলা ও মন্টেগোমারী জেলার একটি অংশ। ম্যাকক্রিনল বলেন, তাদের রাজ্য আরও বড় ছিল। আধুনিক চেনাব ও রাভি নদীর দোয়াব থেকে সিন্ধু ও চেনাবের (অ্যাকেসাইন) সঙ্গম পর্যন্ত যা আধুনিক মুলতান জেলা ও মন্টেগোমারীর কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। হিউয়েন সাঙ পরিদর্শিত মো-ল-পো-কে একাধিক বল্লভী দানপত্রে উল্লিখিত মালবক বা মালবক-আহারের সঙ্গে এক করে দেখা যায়। হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন ও বাশাখেরা লিপিতে দেখা যায়, মহাসেনগুপ্ত ও দেবগুপ্তের মালব রাজ্য ছিল পূর্ব মালব অর্থাৎ প্রয়াগ ও ভিলশার মধ্যবর্তী অঞ্চল।

মান্ধাতা (মানধাত্রী বা মান্ধাত্রীদুর্গা) : এটি নর্মদার বাম তীরের কাছে একটি দ্বীপ। মধ্যপ্রদেশের নিরমার জেলার সঙ্গে যুক্ত। এখানে দুটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এই দ্বীপের কাছে নর্মদার দক্ষিণ তীরে রয়েছে বিখ্যাত অমরেশ্বর মন্দির। মান্ধতার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কাছে তিনটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

মান্ডুকি গ্রাম : দ্বিতীয় প্রবরসেনের কোথুরক দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। নাগপুর জেলার মান্দাগাঁওয়ের দু-মাইল উত্তরে আধুনিক মান্ডাগাঁও চিহ্নিত করা হয়েছে। মান্ড

নামে এক ঋষির থেকে এই নাম।

মোরাঝরি : বিন্ধ্যবল্লী (বিজহোলি) আর একটি নাম। চাহমান সোমেশ্বরের (বি: ১২২৬) বিজহোলি লিপিতে দেখা যায় যে জনৈক চাহমান রাজকুমার এই গ্রামটি পার্শ্বনাথকে দান করেছিলেন।

মাউন্ট আবু (অর্বুদাত্রী বা অর্বুদ পাহাড়) : এখানে নেমিনাথের মন্দিরে সোঁমসিংহের দুটি লিপি উৎকীর্ণ বয়েছে। মাউন্ট আবু আরাবল্লী পর্বতমালায় অবস্থিত। এটি ৫৬৫০ ফুট উঁচু। এখানে পাঁচটি জৈন মন্দির আছে।

মুরুমুরা : রায়পুরের ধমতরি তহশিল। এখানে দুটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।

নদ্দুল : যোধপুরের নাদোল।

নন্দীপুর : নর্মদার তীরে আধুনিক নানদোজ।

নন্দীবর্ধন : দ্বিতীয প্রবরসেনের কোথুরক দানপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। নাগপুরেব রামটেকের কাছে নগরধন বা নন্দরধন কে চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয় কৃষ্ণের দেওলি তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এটি একটি তীর্থক্ষেত্র।

নরবর : আজমীর থেকে ১৫ মাইল দূবে কিশেনগড় অঞ্চলে প্রাচীন নরপুরা অবস্থিত।

নর্মদা : টলেমি একে বলেছেন নরমাদোস। এটির বিষ্ণুস্মৃতি, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণে এবং যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। মৎস্য পুরাণ বলেছে এই নদী যেখানে সাগবে পড়েছে সেটি পুণ্য জামদগ্নী তীর্থ। ভৃগুতীর্থ এই নদীর তীরে রয়েছে। এই নদী মৈকাল পর্বতে উৎপন্ন। কেউ বলেন, এটি অমরকন্টকে উৎপন্ন হয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে।

নর্মদা মহান নদী। এর উত্তর তীবে ছিল ভৃগুকচ্ছ বন্দর। কাবেরী আর আর নর্মদার সঙ্গমে কুবের তপস্যা করেছিলেন। এই নদীটি রেবা, সমোদভবা এবং মেখলসুতা নামেও পরিচিত। মান্ডালার একটু ওপরে রেবা আর নর্মদা মিলিত হয়ে দুটির যে কোনও একটি নামে নিয়ে প্রবাহিত হয়। মহাভারত অনুযায়ী নর্মদা অবন্তীর দক্ষিণ সীমা নির্দ্ধারিণ করত।

নারোদ : গোয়ালিয়র অঞ্চলে একটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর রনোদ। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

নরওয়ার : কানিংহাম পদ্মাবতী নগরকে চিহ্নিত করেছেন। পুরাণ অনুযায়ী নগরটি নাগ অধিকৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপিতে বর্ণিত নাগরাজ গণপতির মুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে। এটিই রাজা নলের বাসভূমি ছিল বলে কথিত আছে। মহাভারতের নল-দময়ন্তীর প্রণয় কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা।

নবপত্তলা : তিখারীর ৮ মাইল পশ্চিমে ময়াখেরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নাডোল : যোধপুর অঞ্চলে ওসিয়া আর ফালোদিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নাগহ্রদ : একলিঙ্গির কাছে নাগদাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নান্দসা : উদয়পুর অঞ্চলের সহারা-এর একটি গ্রাম। ভিলওয়ারা রেল স্টেশন থেকে ৩৬ মাইল দূরে এবং গোয়ালিয়রের গঙ্গপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে। এখানে যূপের ওপর কোন এক মালব রাজের দুটি উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে।

নারানক : জয়পুর অঞ্চলের সম্ভর নিজামতের নরেইনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নাথদ্বার : উদয়পুর শহরের ৩০ মাইল উত্তরে বনাস নদীর ডান তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণের মূর্তি সম্বলিত এক বৈষ্ণব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। মূর্তিটি পরে বল্লভাচার্য মথুরার এক মন্দিরে নিয়ে যান এবং তারপরে গোবর্দ্ধনে চলে যায় এটি।

নিচতগিরি : ভিলসার দক্ষিণে ভূপাল অঞ্চলে অল্প উচ্চতার ভোজপুরা পাহাড় শ্রেণি।

নির্বিন্ধ্যা : কালিদাসের মেঘদূতে বলা হয়েছে, নদীটি উজ্জয়িনী ও বেত্রাবতীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। বায়ু পুরাণ একে নির্বন্ধ্যা বলেছে। প্রকৃত পক্ষে নদীটি বিদিশা ও উজ্জয়িনীর মধ্যবর্তী অর্থাৎ দশার্ন ও সিপ্রার মধ্যবর্তী। চর্মন্বতীর উপনদী আধুনিক কালিসিন্ধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু কালিসিন্ধ প্রকৃতপক্ষে মেঘদূতের সিন্ধু—তাই চম্বলের আর একটি উপনদী নেওয়াজকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত।

নিষাধ : পাণিনীর অষ্টাধ্যয়ীতে এটি নৈষ্যাধ। খুব সম্ভবত বিদর্ভের কাছেই অবস্থিত ছিল। বিদর্ভ দময়ন্তীর দেশ ছিল। কালিদাস বেরারের উত্তর পশ্চিমে নিষাধকে স্থাপন করেছেন। উইলসন মনে করেন, এটি বিন্ধ্যপর্বতমালা ও পয়োশনী নদীর মধ্যবর্তী ছিল। ল্যাসেন এটিকে বেরারের উত্তরপশ্চিমমে সাতপুরা পর্বত বরাবর বলে মনে করেন। বার্জেস এটিকে মালবের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল বলে মনে করেন। মহাভারত বলে, গিরিপ্রস্থ নিশাধের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুরাণ নিষাধের ন'জন রাজার কথা বলে, তাঁরা রাজা নলের বংশধর।

ওসিয়া ও ওসিয়াম : যোধপুরের উত্তরে মরু অঞ্চলে ছোট একটি গ্রাম।

পদ্মাবতী : এটি গোয়ালিয়র অঞ্চলে আধুনিক নরওয়ার। অনেকের মতে এটি পদং-পাওয়া যেখানে দুর্মুল্য কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে। এখানে প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি জন্মেছিলেন। কারো কারোর মতে এই নগরী সিন্ধু ও পারা (পার্বতী)র সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। কেউ আবার বিজয়নগরকে—যা কিনা বিদ্যানগরের অপভ্রংশ—নরওয়ার বা নলপুরার ২৫ মাইল নীচে বলে চিহ্নিত করেন। ভি. এ. স্মিথের মতে পদ্মাবতী গণপতি নাগের রাজধানী ছিল। অন্যদিকে স্কন্দপুরাণ বলে পদ্মাবতী উজ্জয়িনীর অপর নাম। পদ্মাবতী পদ্মপুরা বলেও পরিচিত।

পল্লী : যোধপুর অঞ্চলের আধুনিক পালিশহর।

পরনাশা : পারিয়াত্র পাহাড়ে উৎপন্ন নদী পরনাশা বা বর্ণশার আধুনিক নাম—বানস যা চর্মন্বতি বা চম্বলের একটি উপনদী।

পরসদা বা পরসদি : রায়পুরের বালোদা বাজার তহশিলের একটি গ্রাম।

পাথাড়ী : ভূপাল অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানে রাষ্ট্রকূট বংশের পরবলের (বিঃ ৯১৭) স্তম্ভলিপি পাওয়া গেছে।

পত্তন : মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার মুলতাই তহশিলের একটি গ্রাম।

পাউনি : ওয়েনগঙ্গার দক্ষিণ তীরে এক প্রাচীন নগর। মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা থেকে ৩২ মাইল দূরে। এখানে ভাররাজ ভগদত্তের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

পাউয়া : গোয়ালিয়রের ৪০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সিন্ধ ও পার্বতী নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত। এটিকে নাগদের তিনটি রাজধানীর অন্যতম পদ্মাবতী বা ভবভূতি বলে মনে করা হয়।

পয়োশনী : মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে। বৈদুর্য পর্বত নর্মদা থেকে একে পৃথক করেছে। মহাভারত অনুযায়ী এটি বিদর্ভের নদী। মৎস্যপুরাণ বলে, তমরস ও হংসমার্গ নামে দুটি উপজাতির দেশের মধ্যে দিয়ে এই নদীটি প্রবাহিত হোত। কানিংহাম সিন্দ ও বেতয়ার মধ্যবর্তী যমুনার উপনদী পাহোজকে চিহ্নিত করেছেন।

পারা : মার্কণ্ডেয় পুরাণে মধ্যভারতের নদী বলে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ুপুরাণ বলে পরা নদী। পরাবতী ভূপালে উৎপন্ন হয়ে চম্বলে পড়েছে।

পারিপাত্র পর্বত : বৌধায়নের ধর্মসূত্র অনুযায়ী এটি আর্যাবতের দক্ষিণ সীমারেখা। পার্জিটার বিন্ধ্যপর্বতের সেই অংশটিকে পরিপাত্র পর্বত বলে চিহ্নিত করেছেন যে অংশটি ভূপালের পশ্চিমে আরাবল্লীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বুলহার বলেন, মালবে বিন্ধ্য পর্বতের শাখাই পারিপাত্র পর্বত।

পেন্ড্রাবন্ধ : রায়পুরের বালোদা বাদার তহশিলের একটি গ্রাম। এখানে প্রতাপমল্লের (কলচুরি ৯৬৫) তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

পীপারডুলা : ছত্তিসগড়েরর সারানগড়ের পশ্চিম সীমান্তের কয়েক মাইল দূরে ঠাকুরদিয়ার ২০ মাইল দূরে একটি গ্রাম। এখানে প্রবররাজার একটি দানপত্র পাওয়া গেছে। সরভপুরের রাজা নরেন্দ্রর পীপারভুলের তাম্রপত্রে গ্রামটির নামোল্লেখ রয়েছে।

পিপলিয়া নগর : গোয়ালিয়র রাজ্যের সুজলপুর পরগণার একটি গ্রাম। এখানে একটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে। এটি রাজা অর্জুনবর্মণ রাজ্যাভিষেকের সময় মণ্ডপদুর্গ থেকে প্রচার করেছিলেন।

পোকসর : আজমীরের সাত মাইল দূরে পুষ্কর। এটিকে পোখরাও বলা হয়।

পোতোদা : হিন্দোল অঞ্চলের পোতাল।

প্রার্জুন : এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। মধ্যভারতের নরসিংহগড়ের কাছে কোথাও ছিল এই প্রার্জুনেরা। সম্ভবত নরসিংহগড়ই। প্রার্জুনদের সঙ্গে আরও তিনটি উপজাতিদের যুক্ত করা হয়—কাক, খরপরিক এবং সনাকানিক। বৃহৎসংহিতা এদের উত্তর ভারতের বলে বলেছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে একদল উপজাতিদের কথা বলা হয়েয়েছ—এদের মধ্যে প্রার্জুনেরাও রয়েছে। তারা সমুদ্রগুপ্তকে সব রকম কর দিত।

পুরাননগর : অলওয়াতে এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ছিল। এখানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির রয়েছে।

পূর্ণ : পদ্মপুরাণে বর্ণিত নদীটি আজও তার পূর্বপরিচয় বহন করছে। এটি সাতপুরা পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে বুরহানপুরের কাছে তাপ্তির সঙ্গে মিশেছে।

পুষ্কর : এটি আজমীরের বর্তমান পোখর। পবিত্রস্থান। এখানে একটি পবিত্র জলাশয় রয়েছে। এখানে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদ্রী নারায়ণ, বরাহ ও শিবের মন্দির আছে। পুরাণে, বৃহৎসংহিতা যোগিনীতন্ত্র ইত্যাদিতে এর উল্লেখ রয়েছে।

পুষ্করদ্বীপ : সমুদ্রবেষ্টিত একটি দ্বীপ। দ্বীপের মধ্যিখানে একটি পাহাড় রয়েছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপ শাসন করত। কাশ্যপ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। বালি রাবণকে এখানে পরাজিত করে। পরশুরাম এই দ্বীপে এসেছিলেন।

পুষ্করণ (পোখরান) : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মারওয়াড়ে যে পোখরান খুঁজে বার করেছিলেন এটি সেটিই! এটি জয়সলমীরের সীমান্তে। দিল্লীর মেরহৌলির লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্রকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির চন্দ্রবর্মণ বলে চিহ্নিত করেছেন। পোখরানের রাজা চন্দ্র একই ব্যক্তি। কেউ কেউ আবার প: বঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় দামোদরের তীরে—শুশুনিয়া পাহাড় থেকে ২৫ মাইল পূর্বে একই নামের একটি গ্রামকে চিহ্নিত করেন। এখানে চন্দ্রবর্মণ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। রাজস্থানের পুষ্করণের রাজা চন্দবর্মণ (৪র্থ শতক) সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। তিনি নরবর্মণের ভাই ছিলেন। মান্দাসোর লিপিতে (৪০৪-৪০৫ খ্রি:) একথা উল্লেখ রয়েছে। দুজনেই মালবের রাজা ছিলেন। পুষ্করণ মারবাড়ের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

রহতগড় : গোয়ালিয়র অঞ্চলের সাগরের ২৫ মাইল পশ্চিমে একটি দূর্গ রয়েছে। দ্বিতীয় জয়বর্মণের প্রথম দিককার লিপি এখানে পাওয়া গেছে।

রক্ষদেব : উদয়পুরের মাগরা জেলার একটি গ্রাম। উদয়পুর শহর থেকে ৪০ মাইল দূরে। এখানে আদিনাথের বা রক্ষবনাথের বিখ্যাত জৈনমন্দির আছে।

রনপুর : যোধপুর জেলার দেশুরি জেলার বিখ্যাত এক জৈন মন্দিরের স্থান। যোধপুর শহর থেকে ৮৮ মাইল দূরে। মেবারের রনকুম্ভের সময় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

রত্নপুর : বিলাসপুর জেলার বিলাসপুরের ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রত্নপুর দুর্গের ভেতরে দ্বিতীয় পৃথ্বীদেবের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

রাজিম : রাজা থিবরদেবের রাজিম তাম্রলিপিতে মহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত রাজিমের উল্লেখ রয়েছে। স্থানটি রায়পুর জেলার রায়পুরের ২৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। পদ্মপুরাণে একে দেবপুরাও বলা হয়েছে। নল রাজা বিলাসতুঙ্গার রাজিম লিপিতে মহানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত স্থানটিকে পবিত্র বলা হয়েছে।

রাজোরগড় : রাজস্থানের অলওয়ার জেলার একটি গ্রাম।

রামনগর : মধ্যপ্রদেশের এটি মান্ডলা জেলায় অবস্থিত।

রামটেক : রামটেক কালিদাসের মেঘদূতের রামগিরি বলে চিহ্নিত হয়েছে। এটি নাগপুরের ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে রামায়ণ বর্ণিত শম্বুক তপস্যা করেছিল।

রানীপদ্র : গোয়ালিয়র জেলার এক ক্ষয়িষ্ণু শহর রানোদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি ঝাঁসি ও গুনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

রায়পুর : সাতনা রেল স্টেশন থেকে ৩০ মাইল দূরে কোথি অঞ্চলের একটি বড় গ্রাম।

রায়তা : বিজহোলির ১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বেগুন অঞ্চলের একটি গ্রাম।

রবণা : বিজহোলির ৪ মাইল উত্তর পূর্বে রানধোলাপুরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুবরাজ সোমেশ্বর গ্রামটি পার্শ্বনাথকে দান করেছিলেন।

রেবতী : বিজহোলির পার্শ্বনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি ছোট নদী। রেবতী কুন্ডের নাম অনুসরণে এই নাম।

রেবা : যশোধর্মণ ও বিষ্ণুবর্মণের মান্দাসোর লিপিতে এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরাণেও এর উল্লেখ আছে। লিপিতে বলা হয়েছে বিন্ধ্যের শিখর থেকে এই

নদী নির্গত হয়েছে। মেঘদূতেও এই নদীটির উল্লেখ রয়েছে।

ঋক্ষবত : আধুনিক বিন্ধ্যপর্বতের প্রাচীন নাম। এটি টলেমির আউসেনটোন। টলেমি বলেছেন, তাউন্দিস, দোসারন, এবং অদামস নদীর উৎস এই পাহাড়। তাঁর মতে নর্মদার উত্তরে আধুনিক বিন্ধ্যই হচ্ছে ঋক্ষপর্বত।

শৈলপুর : ভারহুতের 'ভোটিভ লেবেল নং ৪১'-এ এর উল্লেখ আছে।

সকরাই : জয়পুর অঞ্চলের শেখাবতীর একটি গ্রাম—ফাণ্ডেলার ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে। স্থানটি দেবী শাকম্ভরীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। স্রোতস্বিনী সারকরার তীরে অবস্থিত। এখানে একটি লিপি পাওয়া গেছে।

সল্লাইমাল : অজ্ঞানবতীর ৫ মাইল দূরে আমলা এবং সালোরা গ্রাম।

সলোনি : কোনির দক্ষিণপশ্চিমে আধুনিক সারাউনি। পুরুষোত্তম গ্রামটি দান করেছিলেন।

শম্বুক আশ্রম : নাগপুরের উত্তরে রামটেকে অবস্থিত ছিল। সম্বুক শুদ্র হয়ে তপস্যা করছিল। রাম একে নিহত করেন।

সমুদ্রপাত : জব্বলপুরের ৪ মাইল উত্তরে সমন্দ পিপারিয়া।

সতাজুনা : মান্ধাতার ১৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গ্রাম সতজুনা।

সত্যবান : এই পাহাড়টি ঋক্ষ ও মঞ্জুমান পাহাড়ের মধ্যবর্তী।

সাভ্রমতী : নদীতীর্থ এবং কপালমোচন তীর্থ এই নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটি ব্রহ্মাবল্লী নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

শাকম্ভরী : এটি জয়পুরের একটি স্থান। সাম্ভরের ধ্বংসাবশেষ-এ ১৯৩৬-৩৮ এ খনন করা হয়।

সামোলি : এটি উদয়পুরে।

সাঁচি : সাঁচির পূর্বতন নাম কাকনাদ। বৌদ্ধস্তুপের জন্য বিখ্যাত। ভূপালের ২০ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঁচি লিপিতে ভূপালের দেওয়ানগঞ্জ সাব ডিভিশনের ১২ মাইল উত্তর পূর্বে সাঁচি গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সানচোর : যোধপুর অঞ্চলের একই নামের জেলার সদর শহর।

সারনগড় : ছত্তিসগড়ের রায়গড়ের ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

সেবাড়ি : যোধপুর জেলার গডওয়ার অঞ্চলের একটি গ্রাম।

সেরগড় : রাজস্থানের কোটার এক পরিত্যক্ত শহর। আত্রু রেল স্টেশন থেকে ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে দুটি লিপি পাওয়া গেছে।

শিপ্রা : নদীটির আর একটি নাম বিশালা (মেঘদূত)। কালিদাস নদীটিকে অমর করে গেছেন। উজ্জয়িনী এরই তীরে অবস্থিত। এটি গোয়ালিয়র অঞ্চলের একটি স্থানীয় নদী—চম্বলে মিশেছে। হরিবংশে এই নদীটির নাম রয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী এটি পারিপাত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন। স্কন্দ পুরাণের অবন্ত্যাখণ্ডে দেখা যায় শিপ্রাকে উত্তরবাহিনী বলা হয়েছে। রেবা, চর্মন্বতী, কৃষ্টা নদী অমরকন্টক থেকে নির্গত হয়েছে। কৃষ্টা বিন্ধ্যকে ভেদ করে মহাকাল বনের দিকে (উজ্জয়িনী) রুদ্রসরোবরের কাছে শিপ্রার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে এগিয়ে গেছে। শিপ্রা এবং কৃষ্টার সংগম—কৃষ্টসঙ্গম বলে পরিচিত ছিল।

সিরোহা : নারওয়ারে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

শিরপুর : রায়পুর জেলার মহাসমুন্দের মহানদীর তীরে একটি গ্রাম। রায়পুর থেকে ৩৭ মাইল উত্তর পূর্বে। এটি একদা মহাকোশলের রাজধানী ছিল। তখনকার নাম শ্রীপুরা।

শ্রীমালপত্তন : মাউন্ট আবু থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন গুর্জরত্রের রাজধানী বিখ্যাত ভিনমল। স্কন্দ পুরাণে এক শ্রীমাল বলা হয়েছে।

শ্রীমার্গ : চাহমান সোমেশ্বরের (বি: ১২২৬) বিজহোলি লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে একে শ্রীপথ বা শ্রীপথার পরিবর্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্লিট ভরতপুরের বায়ানকে চিহ্নিত করেছেন।

শ্রীপুর : রায়পুর জেলার সিরপুর।

সুনারপাল : বস্তার প্রদেশের নারায়ণপালের ১০ মাইল দূরের একটি গ্রাম। এখানে জয়সিংহদেবের একটি লিপি পাওয়া গেছে।

সুনিক : সরভপুরার মহাসুদেবরাজার নতুন সনদে এই গ্রামটিকে ধাকারিভোগতে অবস্থিত বলেছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত : নাগপুর জেলার আহার অঞ্চলের সদর। মনে হয় অঞ্চলটি বর্তমান হিঙ্গলঘাট তহসিলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রভাবতীগুপ্তের পুণা তাম্রলিপিতে আহাদেরর উল্লেখ রয়েছে।

শ্বেত : শাভ্রবতী থেকে নদীটি উদ্ভুত।

তলহারী : মনে হয় বিলাসপুর তহসিলের মল্লারকে ঘিরে দেশটি ছিল। প্রাচীন নাম ছিল তরদমশাকভুক্তি—যা মল্লারেব কাছে পাওয়া মহাশিবগুপ্ত বালার্জুনের একটি তাম্রদানপত্রে জানা যায়।

তলেবাটক : অজ্ঞানবতীর ১০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আধুনিক তেলেগাঁও।

তাপ্তি (তাপি) : কোনও সন্দেহ নেই যে তাপি অর্থে তাপ্তীনদী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মহাকাব্যের কোথাও এর উল্লেখ নেই। এমন কি ভীষ্মপর্বের তালিকাতও এর উল্লেখ নেই। তবে ভাগবতপুরাণ ও পদ্মপুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে। মহাদেব পাহাড়ের পশ্চিমে মুলতাই মালভূমি এর উৎস এবং পশ্চিম বাহিনী হয়ে সুরাটের কাছে সমুদ্রে পড়ছে। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী এর উৎস ঋক্ষ পর্বত। বলরাম এখানে এসেছিলেন। টলেমির ভাষায় এটি ননগাউনাস নদী। তবে টলেমির তথ্যে ভুল আছে।

টেকভরা : জব্বলপুরের ৫ মাইল দক্ষিণে টিখারীত।

টেমরা : বস্তার অঞ্চলে কুরুষপালের লাগোয়া একটি ছোট গ্রাম।

টেওয়ার : জব্বলপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে একটি গ্রাম। এখানে চেদীরাজ জয়সিং দেবের (৯২৮ খ্রি:) একটি লিপি পাওয়া গেছে।

থাকুর দিয়া : ছত্তিসগড়ের সারংগড়ের ৬ মাইল দূরের একটি গ্রাম।

টিহারী : জামিনী নদীর ৫ মাইল পূর্বে আধুনিক তিহরী। এটি বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে অবস্থিত।

ত্রিপুরী : জব্বলপুর থেকে ৬ মাইল দূরে আধুনিক তেওয়ার। বৃহৎসংহিতায় এটিকে নগর বলেছে।

তিমিশা : অজ্ঞানবতীর পশ্চিমের পাহাড়ের প্রাচীন নাম।

তোশদদ : আরং এর ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে ডুমুরপল্লীর কাছে তুসদা।

তুমেইন : গোয়ালিয়র অঞ্চলের গুনা জেলার একটি বড় গ্রাম। পছার রেলস্টেশন থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত।

তেরমরি : রাণোদের ৫ মাইল দক্ষিণ পূবের তেরহিযে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুমব্বন : সাঁচি স্তুপের ছটি 'ভোটিভে' খোদিত এবং কুমারগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্তের তুমেইন লিপিতে উল্লিখিত। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। টুকনেরী রেল স্টেশনের ৬ মাইল দূরে তুমেইনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি জৈন বজ্রস্বামীর জন্মস্থান। অনেকে মনে করেন, এটি অবন্তীতে অবস্থিত ছিল।

তুম্মান : বিলাসপুর জেলার রত্নপুরের ৪৫ মাইল উত্তরে তুমানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তুন্দরক : মহানদীর সেওড়ি নারায়ণের ৬ মাইল দক্ষিণে আধুনিক তুন্দ্রাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি রায়পুর জেলায় অবস্থিত।

উদয়পুর : এখানে জগন্নাথরায়-এর মন্দির রয়েছে। এখানে লিপিও পাওয়া গেছে।

উদয়গিরি : বিচ্ছিন্ন বেলে পাথরের এক পাহাড়ে খোদাই করা গুহা মন্দির রয়েছে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি লিপিতে এই পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। একই নামে পূর্ব দিকে একটি গ্রাম রয়েছে—ভিলসার ২ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ভিলসা অঞ্চলের এই প্রাচীন স্থানটি বেতয়া ও বেশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে কুড়িটি গুহা রয়েছে, পূর্বে অঞ্চলটির নাম ছিল দশার্ন বা দশন্ন, যেখানকার এক বিহারে আধুনিক ভিলসার চারদিকের অঞ্চল ছিল দশার্ন। বেদিসাগিরি অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহল যাত্রার পূর্বে মায়ের সঙ্গে বাস করেছিল—সেটিই সম্ভবত উদয়গিরি পাহাড়। উদয়গিরি গুহায় ১২টি লিপি পাওয়া গেছে যার মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ। ৬নং গুহালিপি থেকে জানা যায় যে সনকানিকসেরা এখানে আধিপত্য করত।

উদয়পুর : গোয়ালিয়র অঞ্চলে উদয়াদিত্য নির্মিত শিবমন্দিরে একটি লিপি পাওয়া গেছে। বিশাল নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির উদয়পুণে উদয়াদিত্যই নির্মাণ করেছিলেন।

উজ্জয়েইন : পতঞ্জলীর মহাভাষ্যে, যোগিনীতন্ত্রে এবং অশোকের ছোট শিলালিপি নং ২তে এর উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিম মালব বা অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। এটিই মধ্যপ্রদেশের আধুনিক উজ্জইন। দীপবংশ অনুসারে অচ্যুতগামী এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিখ্যাত দ্বাদশ মন্দিরের অন্যতম একটি মহাকালের মন্দির। উজ্জয়িনী একটি পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। অশোক এখানে দীর্ঘদিন অবন্তীর প্রশাসক হিসাবে ছিলেন।

উমা : দ্বিতীয় প্রবরসেনের কোথুরক দানপত্রে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। নাগপুর জেলায় উম্মা নদীটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উম্মরনীগ্রাম : দক্ষিণ রাজস্থানে দেলভাদার সাত মাইল দূরে উমারনীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উন : এটি ইন্দোর অঞ্চলে নিমার জেলায় নর্মদার দক্ষিণে অবস্থিত।

উপপ্লব্য : রাজা বিরাটের রাজ্যের একটি নগর। এখান থেকেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ যাত্রা করে। বিরাটনগরের কাছে হলেও এর সঠিক অবস্থান জানা যায় না।

উত্তমাদ্রিশিখর : এটি সম্ভবত উচ্চ মালভূমি উপরমালের প্রাচীন নাম। এটি বারোলি থেকে দক্ষিণে ভেইনসারোর এবং উত্তরে জাহাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বড়পুরা : এটি বড়নগর বলেও পরিচিত ছিল। বল্লভীর ১১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে আনন্দপুরা শহরকে সেন্ট মার্টিন চিহ্নিত করেছেন বড়নগর বলে।

বডাউবা : এটি আধুনিক বড়াউবা—বিজহোলির তিন মাইল দক্ষিণে।

বৈরাট : বিরাট বা বৈরাটনগর মৎস্য দেশের রাজধানী ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণ পশ্চিমে এবং শূরসেনেরও দক্ষিণে মৎস্যদেশ অবস্থিত ছিল। এখানেই পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের বছরটি অতিবাহিত করেন। বৈরাট অশোকের ভাবরু শিলালিপির জন্যও বিখ্যাত। এটিই একমাত্র বড় পাথর খণ্ডের ওপর লেখা অশোকের শিলালিপি।

বিরাটের প্রাচীন স্থানটি খনন করে মৌর্য ও তার পরবর্তী যুগের অনেক প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুটি অশোক স্তম্ভের অসংখ্য টুকরো পাওয়া গেছে। নতুন ধরনের এক মন্দির। স্বয়ং অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক বিহার।

বনিকা : অলওয়ারের ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে গ্রাম বেনকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বরদাখেটা : অমরাবতী জেলার মোরসি তালুকের ওয়ারুডকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বরলাইক : এটি বিজহোলির কাছের একটি পুকুরর নাম—যার পাড়ে সব প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

বরটূ : দেত্তলিয়া গ্রামের উত্তরে বরত্রোয়ী নদীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বসন্তগড় : এটি রাজস্থানের সিরোহী অঞ্চলে। এখানে পূর্ণগালের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এটি খুবই প্রাচীন স্থান। ১৬ শতকের শেষ ভাগ পর্যত এটি বট, বটকর এবং বটপুরা নামে পরিচিত ছিল। এখানে পাহাড়ের মাথায় একটি দুর্গও পাওয়া গেছে।

বশিষ্ঠ-আশ্রম : আরাবল্লীর মাউন্ট আবুতে অবস্থিত ছিল। কেউ আবার বারিপাদার ৩২ মাইল দূরে খুটিংকে চিহ্নিত করেন। কালিদাস রঘুবংশে আশ্রমটি হিমালয়ে অবস্থিত বলেছেন। বিশ্বামিত্র এখানে এসেছিলেন এবং কামধেনু হরণ করেন। বশিষ্ঠ যজ্ঞকুণ্ড থেকে পারমার বলে এক বীরকে উৎপন্ন করেন। এর থেকেই রাজস্থানের পরমার গোষ্ঠির উৎপত্তি।

বটপদ্রক : এটি কোশির-নন্দপুরবিষয়ে অবস্থিত। বারডুলার ১৪ মাইল দূরে আধুনিক বটপদক গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিলাসপুর জেলার দুটি লাগোয়া গ্রামকে নন্দপুরবিষয়ের সদরদপ্তর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বটপুর : মধ্যপ্রদেশের কুরহার এক মাইল পূর্বে আধুনিক বড়ুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বটাটবি : অরণ্যরাজ্যগুলির মধ্যে বটাটবি ও সহলাটবী উল্লেখযোগ্য।

বটুবারি : মোটামুটি ভাবে এটি চিরখরি নামে দেশীয়রাজ্যকে চিহ্নিত করা যায়।

বাটোদক : কুমারগুপ্ত ও ঘটোৎকচগুপ্তের তুমেইন লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। গোয়ালিয়র অঞ্চলের ভিলসা জেলার ছোট্ট গ্রাম বাদোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বেদিসা (বিদিশা) : কালিদাসের মেঘদূতে এই নগরটির নাম অমর হয়ে আছে।

রামায়ণ অনুযায়ী রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে নগরটি দেন। গরুড়পুরাণ বলে, নগরটি ধনশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। বেনসাগরের পূর্ব্বতন নাম বিদিশা বা বেদিশা। ভিলসার ২ মাইলের মধ্যে বেন বা বিদিশা নদী ও বেতয়া (বেত্রবতী) নদীর মধ্যস্থানে নগরটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পুরাণের মতে বিদিশা—বিদিশা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বিদিশা নদী পারিপাত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আধুনিক ভিলসাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাটলিপুত্র থেকে এর দূরত্ব ছিল ৫০ যোজন। পালি সাহিত্যের মতে পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনী যাবার পথ বিদিশার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। বিদিশা অবন্তীর অন্তর্ভূক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলে বিদিশা অবন্তীর এক অপরান্ত প্রতিবেশী। তবে নিশ্চিতভাবে বিদিশা শুঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং উজ্জয়িনী ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তার সদর দপ্তর।

বিদিশা পূর্ব মালবের রাজধানী ছিল। বাণের কাদম্বরী নাটকে দেখা যায়। শুদ্রক নামে এক বীররাজা বিদিশা শাসন করতেন। পুষ্যমিত্র ও অগ্নিমিত্রের সময় এটি তাঁদের পশ্চিমী রাজধানী ছিল। মেঘদূত অনুযায়ী এটি দর্শান দেশের রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে পাণ্ডবমিত্র দর্শানরা দশার্ন নদীর তীরে বাস করত এবং আধুনিক ধসানই সেই নদী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দশার্ন নদী যার থেকে দর্শান দেশের নামকরণ—সাগরের কাছে আধুনিক ধসান বা দুষান নদীকে দশার্ন নদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই পুরাণে এও বলা হয়েছে যে বিদিশা বা বেত্রবতী নদী পারিপাত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

অশোকের সময় থেকে এটি বৌদ্ধধর্মের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অশোক অবন্তীর প্রাদেশিক থাকার সময় থেকেই এটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বিদিশা ছিল দক্ষিণাপথে বিশ্রাম নেবার একটি জায়গা।

হাতির দাঁতের কাজের জন্য বিদিশা বিখ্যাত ছিল। সাঁচির স্তূপে বিদিশার হস্তিদন্ত শিল্পীদের শিল্পকর্ম রয়েছে। 'পেরিপ্লাসে' দেখা যায় দশার্ন হাতির দাঁতের জন্য বিখ্যাত। নগরটি তলোয়ার নির্মাণের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল।

ভিলসার উদয়পুরের নীলকন্ঠেশ্বরের মন্দিরের কথা উদয়পুর প্রশস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদিশগিরি মহাবিহার অশোকের স্ত্রী দেবী তৈরি করেছিলেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র এখান থেকেই সিংহল যাত্রা করেন।

বিদিশা স্তূপের জন্য বিখ্যাত। (১) ভিলসার সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে সাঁচি স্তূপ। (২) সাঁচি থেকে ৬ মাইল দূরে সোনারি স্তূপ। (৩) সোনারি থেকে তিন মাইল দূরে শতধারা স্তূপ। (৪) ভিলসা থেকে ৬ মাইল দূরে ভোজপুর স্তূপ। (৫) ভিলসা থেকে ৯ মাইল দূরে অন্ধের স্তূপ। ভারহুত স্তূপের 'ভোটিবে' বিদিশার একজন দাতার নাম দেখা যায়।

জে. এইচ. মার্শাল বেনসাগরে একটি প্রস্তর স্তম্ভের ওপর খোদিত একটি লিপি আবিষ্কার করেন। তাতে লেখা আছে, ডিওনের পুত্র গ্রিক রাজদূত হেলিওডোরস কৃষ্ণ-বাসুদেবের সম্মানে একটি গরুড় স্তম্ভ স্থাপন করেন। তক্ষশিলার অধিবাসী ডিওনের পুত্র রাজদূত হেলিডোরসকে গ্রিক রাজা অ্যান্টিয়ালসিডাস বিদিশার কাউটসি পুত্র ভাগভদ্রের সভায় প্রেরণ করেন। গ্রিক হলেও তাকে ভাগবত বলা হোত। এই স্তম্ভে

তিনি তাঁর নতুন ধর্মের কিছু বাণী খোদিত করান। সম্ভবত তিনি বিদিশায় ধর্মান্তরিত হন। এই স্তম্ভটি পুরুষানুক্রমিক ক্রমে পূজিত হয়ে এসেছে।

শাক্যরা প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢ়কের ভয়ে বিদিশায় আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে শ্রেষ্ঠী দেবের কন্যা দেবীকে অশোক বিবাহ করেন। তাঁরই পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। তক্ষশিলার গ্রিকরাজাদের সঙ্গে বিদিশার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

রঘুবংশে বলা হয়েছে, শত্রুঘ্নর দুই পুত্র শত্রুঘাতিন ও সুবাহুকে যথাক্রমে মথুরা ও বিদিশার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শুঙ্গরা সাহিত্য ও লিপিতে বিদিশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পুষ্যমিত্রের পুত্র বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র এবং বিদর্ভের রাজকুমারী মালবিকাকে নিয়ে কালিদাস তাঁর অমর নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র রচনা করেন।

বেদিশগিরি : অশোকের স্ত্রী দেবী পুত্র মহেন্দ্রর জন্য এই পাহাড়ে বেদিশগিরি-মহাবিহার নির্মাণ করান। এখান থেকে মহেন্দ্র তাম্বপর্ণী বা সিংহল যাত্রা করেন।

বেত্রবতী : মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মিলন্দপঞ্হোতে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। মেঘদূতের এই-ই বেত্রবতী নদী। এটি আধুনিক বেতয়া নদী। ভূপালের কাছে উৎপন্ন হয়ে যমুনায় পড়েছে। পুরাণের মতে এটি পরিপাত্র পর্বতে উৎপন্ন।

বেন্নঘন : অজ্ঞানবতীর ও মাইল দক্ষিণে ওয়াইগাঁওকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিদর্ভ : এটি আধুনিক বেরার। দণ্ডিণের কাবাদর্শতে বিদর্ভের লোকজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণের মতে এই বিদর্ভবাসীরা পুলিন্দ, দণ্ডক, বিন্ধ্য প্রভৃতি জাতির মতোই দক্ষিণাপথবাসী। মহাকাব্যে, রঘুবংশ, পুরাণে এদের উল্লেখ রয়েছে। এক ভোজ রাজবংশ এখানে রাজত্ব করত। মহাভারত অনুযায়ী বিদর্ভ নলের স্ত্রী দময়ন্তীর রাজ্য। এটি শুঙ্গ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। নাসিক গুহালিপি অনুসারে রানী গৌতমী বালশ্রীর পুত্র বিদর্ভ জয় করেন।

বিলাপদ্রক : শেরগড়ের ১১ মাইল দূরে বিলানডি গ্রামটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ আবার শেরগড় থেকে ২৫ মাইল দূরে বিলওয়ারো গ্রামটিকে চিহ্নিত করেন।

বিন্ধ্যবল্লী : এটি বিজহোলির প্রাচীন নাম। এটি বিজলিয়া বলেও পরিচিত।

বোধগ্রাম : এটি দক্ষিণ রাজস্থানের সত্যপুরমণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং বোদানকে চিহ্নিত করা হয়।

ব্যাঘ্রেরক : আজমীরের ৪৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে আধুনিক বাঘেরা।

ওয়াডগাঁও : এটি চান্দা জেলার ওয়ারোরা তহশিলে অবস্থিত। এখানে বাকাটক রাজা দ্বিতীয় প্রবরসনের দুটি তাম্রপত্র পাওয়া গেছে।

যৌধেয় : যৌধেয় গণতন্ত্রী উপজাতিরা পাণিনীর মতোই প্রাচীন। ৪র্থ শতক পর্যন্ত এরা তাদের গণতন্ত্রী চরিত্র বজায় রেখেছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে মালব, অর্জুনায়ন, মদ্রক, আভীর ইত্যাদি গণতন্ত্রীদের সঙ্গে এদের নাম করা হয়েছে। ষষ্ঠ শতকেও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় এদের উল্লেখ রয়েছে। এরা এক প্রাচীন যোদ্ধাজাত। পুরাণ এবং হরিবংশ বলে, এরা উশীনরের বংশধর। পার্জিটার মনে করেন রাজা উশীনর পাঞ্জাবের পূর্ব সীমান্তে এক আলাদা আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যেমন, যৌধেয়,

অম্বষ্ঠ, নবরাষ্ট্র এবং কৃমিল। তাঁর বিখ্যাত পুত্র শিবি আউসিনর শিবপুরায় শিবিরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যৌধেয়রা যে পাঞ্জাবে বসতি করে তা ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ এবং শিবিদের সঙ্গে মেলামেশাই প্রমাণ করে। মহাভারতে বলা হয়েছে অর্জুন মালব ত্রিগর্তদের সঙ্গে যৌধেয়দেরও পরাজিত করেন। যজ্ঞসভায় তারা অম্বষ্ঠ, শিবি ও ত্রিগর্তদের সঙ্গে এসে যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন দান করে। অন্য জায়গায় আবার এই মহাকাব্যে এদের অগ্রিজ, মদ্রক ও মালবদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃহৎসংহিতায় যৌধেয়দের অর্জুনায়নদের সঙ্গে আরও উত্তরে দেখান হয়েছে। তারা নিশ্চয় টলেমি বর্ণিত পাঞ্জাবে বসতি করা পান্ডোয়িয় বা পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যুধিষ্ঠিরের এক পুত্রের নাম ছিল যৌধেয়।

কানিংহাম যৌধেয়দের জোহিয়া রাজপুত এবং যৌধেয়দের দেশকে জোহিবার (যৌধেয় বর)—মূলতানের চারদিকেব এক জেলা বলে চিহ্নিত করেছেন। যৌধেয় মুদ্রাই এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। এই মুদ্রাই প্রমাণ করছে যে যৌধেয়রা তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল।

রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপিতে যৌধেয়দের উল্লেখ আছে। শক রাজা গর্ব করে বলছেন যে যৌধেয়দের তিনি উৎখাত করেছেন। বিজয়গড়লিপি থেকে জানা যায় যে তারা ভরতপুরের বিজয়গড় অঞ্চল অধিকার করেছিল। এই শক্তিশালী গোষ্ঠী দক্ষিণ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল নচেৎ শক সামন্তদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে যাবার কথা নয়। স্কাইথিয়ান আক্রমণ এই গণতন্ত্রী দেশগুলিকে পর্যদুস্ত করতে পারেনি, অন্তত সমুদ্রগুপ্তের সময় পর্যন্ত।

ইয়েক্কেরী : কর্নাটকের বেলগাঁও জেলার সাউনমদত্তির ৪ মাইল উত্তর পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত।

অশোকের শিলালিপিতে কিছু ভৌগোলিক উপাদান

অশোকের ছোট শিলালিপি—১এ (রূপনাথ) জম্বুদ্বীপ বলতে ভারতবর্ষকেই বোঝান হয়েছে। রুম্মিনদেই স্তম্ভলিপিতে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে লুম্বিনীর বনে বুদ্ধের জন্মস্থান নির্দেশ করেছেন। রাজত্বের ২০তম বছরে তিনি বুদ্ধপূজা করতে এখানে এসেছিলেন। স্তম্ভলিপি অনুযায়ী কপিলাবস্তু থেকে লুম্বিনীবনের দূরত্ব ১০ মাইল। কোলীয়দের শক্ত ঘাঁটি ও কপিলাবস্তুর মধ্যে রোহিণী নদীর তীরে ছিল লুম্বিনীবন।

শিলালিপি নং ৫-এ তিনি কাম্বোজদের উল্লেখ করেছেন।

পালি সাহিত্য বর্ণিত যোনেরা ছিল গ্রিক বংশজাত। এদের কথা খ্রিঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে ২ খ্রিঃ পর্যন্ত পাওয়া যায়। যোনেরা মহাভারতের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে ছিল। সঙ্গে ছিল, কাম্বোজ, শক এবং মদ্রেরা। এদের রাজ্য ছিল ভারতের প্রত্যন্ত উত্তর পশ্চিমে। দ্বারকা ছিল এদের রাজধানী। কাম্বোজরা ক্ষত্রিয় ছিল, এদের বর্ণচ্যুত করা হয়েছিল, ৫নং শিলালিপিতে জানা যায়, কাম্বোজ, গান্ধার এবং অন্যদের রাজ্যে বসবাসকারী অন্য জাতির লোকজনদের সুখ, সমৃদ্ধির জন্যে ধর্মের অনুশাসন চাপিয়েছিলেন। অশোকের শিলালিপি নং ১৩-এ দেখা যায়, কাম্বোজদের সঙ্গেই যোন্-এর নাম করেছেন। এরা আলেকজাণ্ডার পূর্ব গ্রিক বা আইওনিয়ান।

অশোকের সময় সিন্ধুর পূর্বে গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা এবং সিন্ধুর পশ্চিমের রাজধানী ছিল পুষ্কলবতী। দুটিই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শিলালিপিতে নভক এবং নভপংক্তিদের উল্লেখ করা হয়েছে।

শিলালিপি ৫ এবং ১৩-য় অন্ধ্র পারদ, ভোজ, এবং রাষ্ট্রিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা তাঁর অধীনস্থ ছিল। রাষ্ট্রিকরা মনে হয় খুব নগণ্য ছিল। সম্ভবত এরা ভোজ অঞ্চলের পাশেই থাকত। শিলালিপির পিটিনকরা হায়দ্রাবাদের উত্তর পশ্চিমে পৈঠান বা প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী।

শিলালিপি নং ২-এর সতিয়পুত্রকে সত্যব্রতক্ষেত্র বা কাঞ্চিপুর বলে চিহ্নিত করা যায়।

অশোক ২ এবং ১৩ নং শিলালিপিতে কেরলপুত্রের কথা বলেছেন। কেরলপুত্র নিশ্চিতভাবে কেরালা বা চেরদেশ। তাম্রপর্ণী সম্ভবত সিংহল দ্বীপ—অধুনা শ্রীলংকা।

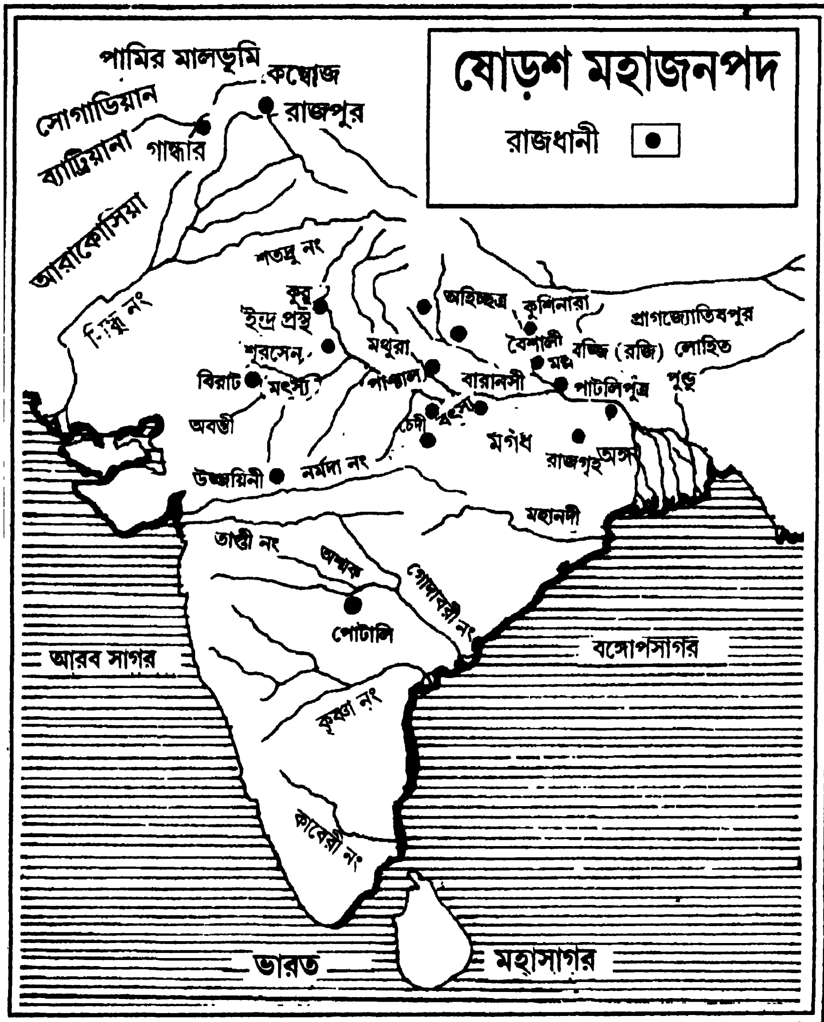
তোসালি (শিলালিপি নং ১) পুরীজেলার ধাউলি।

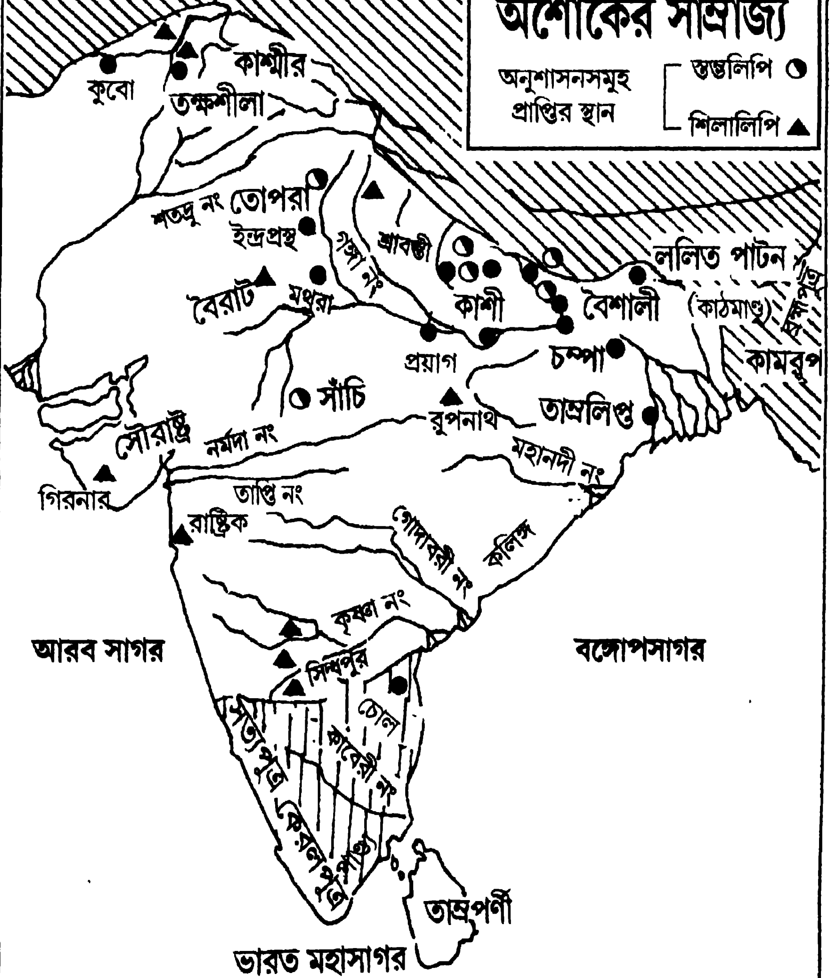
ঈশিলা সম্ভবত মহীশূরের চিতলদুর্গের সিদ্দাপুর গ্রাম।

সুবর্ণগিরি (ছোটশিলালিপি নং ১) হায়দ্রাবাদের কণকগিরি।

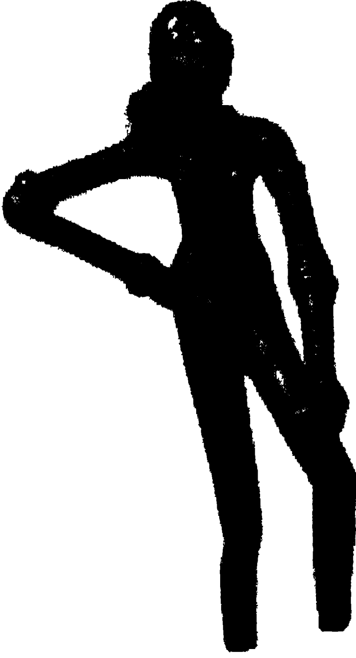
কলিঙ্গ বা কলিঙ্গ নগর বংশধারা নদীর মুখে কলিঙ্গপতনম, শ্রীকাকুলের কাছে।

পাণ্ড্যদেশ মাদুরা ও তিনেভেল্লী জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। অশোক শিলালিপি নং ২ এবং ১৩-তে পাণ্ড্য, কেরলপুত্র, সতিয়পুত্রদের সঙ্গে চোড়দের উল্লেখ করেছেন। এগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। চোড়দেশ পূর্বে পেন্নার নদী থেকে বেল্লার নদী এবং পশ্চিমে কুর্গের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চোড়রা সম্ভবত সমুদ্রপথে এদেশে এসেছিল—তাদের সমুদ্রের লোক বলা হোত।

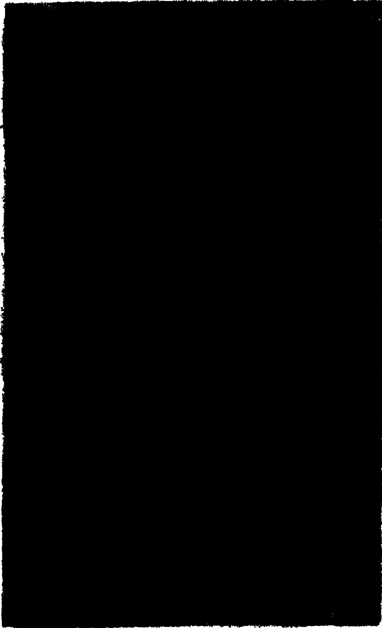

ষোড়শ মহাজনপদ
রাজধানী
পামির মালভূমি
কম্বোজ
সোগাডিয়ান
রাজপুর
ব্যাক্ট্রিয়ানা
গান্ধার
আরাকোসিয়া
শতদ্রু নং
সিন্ধু নং
কুরু
ইন্দ্রপ্রস্থ
শূরসেন
মথুরা
অহিচ্ছত্র
কুশিনারা
প্রাগজ্যোতিষপুর
বৈশালী
মল্ল
বজ্জি (বৃজি)
লোহিত
বিরাট
মৎস্য
পাঞ্চাল
বারানসী
পাটলিপুত্র
পুণ্ড্র
অবন্তী
চেদী
মগধ
রাজগৃহ
অঙ্গ
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
মহানদী
তাপ্তী নং
অশ্মক
গোদাবরী নং
পোটালি
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা নং
কাবেরী নং
ভারত
মহাসাগর


অশোকের সাম্রাজ্য
অনুশাসনসমূহ প্রাপ্তির স্থান
স্তম্ভলিপি
শিলালিপি
কুবো
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
শতদ্রু নং
তোপরা
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
বৈরাট
মথুরা
কাশী
ললিত পাটন
বৈশালী
(কাঠমাণ্ডু)
প্রয়াগ
চম্পা
কামরূপ
সাঁচি
রূপনাথ
তাম্রলিপ্ত
সৌরাষ্ট্র
নর্মদা নং
মহানদী নং
গিরনার
তাপ্তি নং
রাষ্ট্রিক
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
সিদ্ধপুর
চোল
কাবেরী নং
তাম্রপর্ণী
ভারত মহাসাগর


ভারতবর্ষ
(প্রাকৃতিক)
(স্কেল অনুযায়ী নয়)
উদ্যান
শিবি
কপোতী
বিতস্তা নং
ইরাবতী নং
শতদ্রু নং
ইন্দ্রপ্রস্থ
যমুনা নং
গাঙ্গেয় সমভূমি
নেপাল
সোম পর্বত
সিন্ধু সমভূমি
মধ্য ভারতের মালভূমি
বঙ্গদেশ
বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণি
কলিঙ্গ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
দাক্ষিণাত্য
দাক্ষিণাত্য মালভূমি
পূর্বঘাট
মালাবার উপকূল
করমণ্ডল উপকূল
সিংহল
ভারত মহাসাগর



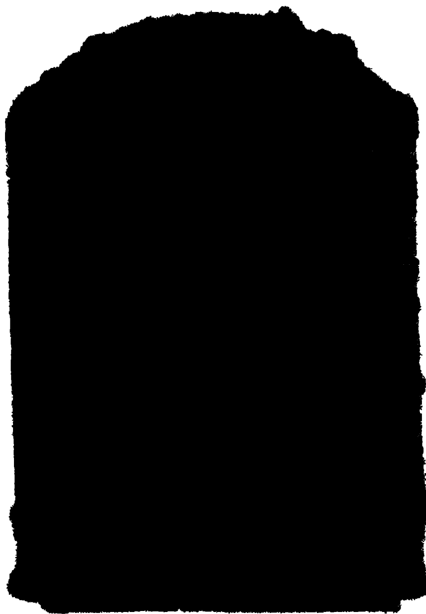
নর্তকী (মহেন-জো-দড়ো)



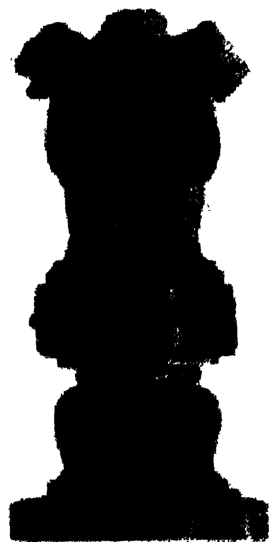
আম্রবৃক্ষ ধরে থাকা নারী (সাঁচি স্তুপ)



পার্বতী (চোল ব্রোঞ্জ)



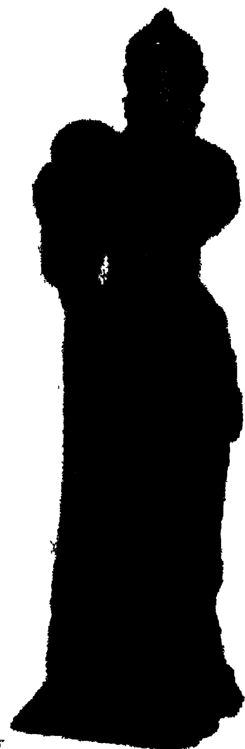
উপবিষ্ট বুদ্ধ (মথুরা)



অশোক স্তম্ভের শীর্ষ (সারনাথ)



বাঁদর পরিবার (মামল্লপুরম)



অমরধারিণী (দিদার গঞ্জ)